রাজমালা

৺ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ

প্রথম মুদ্রণ --- ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ

মূল্য—তিন টাকা চারি আনা [illegible]

প্রকাশক
টিচার্স এণ্ড কোং
আগরতলা, ত্রিপুরা

Ignorance is abandoned, knowledge arises, the conceit of 'I' is abandoned.

They partake not of the Deathless who partake not of the mindfulness centred on body.

The Deathless wanes in those who partake not of mindfulness.. ...

The Deathless waxes in those who par[illegible]

Buddha—Angu[illegible]

মুদ্রাকর—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং লিঃ
২১৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



বঞ্জযিষ্যতি যল্লোকময়মাত্মবিচেষ্টিতৈঃ।

অথমমুমাহু রাজানং মনোরঞ্জনকৈঃ প্রজাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৪।১৬।১৫

শ্রেয়ঃ প্রজাপালনমেব রাজ্ঞোযৎ সাম্পরায়ে সুকৃতাৎ ষষ্ঠমংশম্।

হর্ত্তান্যথা হৃতপুণ্যঃ প্রজানামরক্ষিতা করহারোঽঘমত্তি ॥

উৎসর্গ পত্র

বিষমসমরবিজয়ী পঞ্চশ্রীক

বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর

করকমলেষু—

সুদূর অতীতের ত্রিপুরা রাজ্য কালের আচড়ে ছিন্ন ভিন্ন হইলেও অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া কেমন করিয়া বর্ত্তমানেও বাঁচিয়া আছে, রাজমালা সেই কাহিনী বহন করিয়া আসিতেছে।

ঐ ইতিহাস আলে[illegible]
রাজমালার পা[illegible]
নিবদ্ধ রহিয়া[illegible]
কিন্তু মহারাজে[illegible]
জীবন্তরূপ গ্রহণ [illegible]রিয়াছে
পুণ্যশ্লোক পূর্ব্বপুরুষের চরিত-
চিত্রণ ত্রিপুরেশ্বরের করে অর্পণ
পূর্ব্বক কৃতার্থম্মন্য হইতেছি।

নিত্য শুভানুধ্যায়ী

চিরাশ্রিত

শ্রীভুপেন্দ্র চন্দ্র দেবশর্ম্মা

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিপুরার গৌরবময় অতীত ইতিহাস স্কুলপাঠ্যরূপে প্রথম প্রণয়ণ করেন স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম, এ, মহাশয়। তাঁহার বিরচিত এই রাজমালা তিনি নিজেই ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণ প্রকাশ কালে তাঁহাকে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সংস্করণের মুদ্রিত যাবতীয় সংখ্যা ১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দে নিঃশেষ হইয়া যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা ঐ সনে উপলব্ধি হইলেও কাগজের অভাবে উহা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

[illegible] সংস্করণে বহির পরিবর্দ্ধণ অপরিহার্য্য বিবেচিত হইলেও ভূপেন্দ্রবাবুর [illegible] শারীরিক অস্সুস্থতার দরুণ তিনি উহা সম্পাদন ক[illegible]ন [illegible]ই। এদিকে তাহার দৈহিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগি[illegible] ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের ২৮শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার রাত্রি [illegible]য় তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ত্রিপুরা একজন বিদ্যোৎসাহী সন্তানকে হারাইল।

রাজমালার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার বিষয়ে ভূপেন্দ্রবাবু প্রায়ই আমার সঙ্গে আলাপ করিতেন। কথাপ্রসঙ্গে পুস্তকখানার ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিবার ইচ্ছা ভূপেন্দ্রবাবু প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমিও এ বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে তদবধি তিনি আমাকে প্রায়ই ডাকিয়া নিতেন এবং এ বিষয়ে আলাপাদি করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দে বহিখানা করার কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কারণ পুস্তক প্রকা[illegible]

ক্ষমতা ভূপেন্দ্রবাবু লিখিতভাবে দিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার ওয়ারীশ ভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযুত জিতেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিদেশে থাকায় তাঁহাদের অভিমত জানিতেও অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়।

ভূপেন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে পুস্তকের পরিবর্দ্ধন অংশ প্রণয়ন করিয়াছেন ত্রিপুরার প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বসু, বি, এ, মহাশয়। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

এই সংস্করণে আমরা তিনটি নূতন ব্লক পরিবেশ করিয়াছি। প্রথম সংস্করণ মুদ্রণ কালে যে শ্রেণীর কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছিল—এই সংস্করণেও সেইরূপ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ দুর্ম্মূল্যে সংগ্রহ করিতেও কিছুমাত্র কার্পণ্য করি নাই। পুস্তক প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত কালক্ষেপের দরুণ আমরা পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

১লা বৈশাখ,
১৩৫৮ ত্রিপুরাব্দ
আগরতলা।

পূর্ব্বকথা

ত্রিপুরা রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রাজমালা নামক গ্রন্থে কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হইয়া কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য অবধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং রাজমালাই ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসের মূল উপাদান। রাধাকিশোরমাণিক্যের দরবার হইতে পণ্ডিত শ্রীযুত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক রাজমালা ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। তৎপর বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের রাজত্বের শেষভাগে ঐতিহাসিক তথ্য সংযোজিত হইয়া রাজমালা গ্রন্থ সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায়, ঐ ভার ত্রিপুরারাজ্য সম্বন্ধে বহুদর্শী সুলেখক কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বর্ত্তমান মহারাজের আমলে মহারাজকুমার শ্রীল শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোরের পরিচালনায় উক্ত গ্রন্থ রাজোচিত ভাবে সম্পাদিত করিতে আরম্ভ করেন ক্রমে ক্রমে তৃতীয় লহর পর্য্যন্ত উক্ত পুস্তক প্রশংসার সহিত

সম্পাদন করেন। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে চতুর্থ লহর (ভাগ) পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদীয় গ্রন্থের প্রথম লহরে রাজমালা রচনার একটি ক্রম দিয়াছেন। এই ক্রম দৃষ্টে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় তাঁহার আরও তিন লহর ছাপা বাকি রহিয়া গিয়াছে। উক্ত তিন লহর অচিরে মুদ্রিত হওয়া একান্ত আবশ্যক, অসমাপ্ত কার্য্য দ্বারা সুধীগণ মধ্যে এইরূপ একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থের মর্য্যাদা যথোচিতরূপে প্রকাশ পায় না বলাই বাহুল্য।

প্রথম লহর

বিষয়—দৈত্য হইতে মহামাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ।

বক্তা—বাণেশ্বর, শুক্রেশ্বর ও দুর্ল্লভেন্দ্র নারায়ণ।

শ্রোতা—মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য।

রচনাকাল—খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ।

দ্বিতীয় লহর

বিষয়—ধর্ম্মমাণিক্য হইতে জয়মাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ।

বক্তা—রণচতুর নারায়ণ।

শ্রোতা—মহারাজ অমরমাণিক্য।

রচনাকাল—খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ।

তৃতীয় লহর

বিষয়—অমরমাণিক্য হইতে কল্যাণমাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ।

বক্তা—রাজমন্ত্রী।

শ্রোতা—মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।

রচনাকাল—খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

চতুর্থ লহর

বিষয়—গোবিন্দমাণিক্য হইতে কৃষ্ণমাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ।

বক্তা—জয়দেব উজীর।

শ্রোতা—মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য।

রচনাকাল—খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

পঞ্চম লহর

বিষয়—রাজধরমাণিক্য হইতে রামগঙ্গামাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ।

বক্তা—দুর্গামণি উজীর।

শ্রোতা—মহারাজ কাশীচন্দ্রমাণিক্য।

রচনাকাল—খৃঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ।

ষষ্ঠ লহর

বিষয়—রামগঙ্গামাণিক্য হইতে কাশীচন্দ্রমাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ।

বক্তা—দুর্গামণি উজীর।

শ্রোতা—মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য

রচনাকাল—খৃঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ।

ত্রিপুররাজ্যে বর্ত্তমানে সাতটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে অথচ ত্রিপুরার গৌরবময় অতীত ইতিহাসের সহিত বালকগণ পরিচিত নহে বলিয়া দেশের তাৎপর্য্য ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না। দীর্ঘকালের এই অভাব দূর করিবার জন্য একখানি স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের প্রয়োজন হওয়ায় শিক্ষামন্ত্রী রাজা রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুরের আদেশে এবং সেক্রেটারী শ্রীযুত জনেশকুমার ভট্টাচার্য্য, এম,এস,সির উদ্যোগে এই রচনা কার্য্যে আমাকে ব্রতী হইতে হইয়াছে। পুস্তকখানি যাহাতে ছেলেদের সুখপাঠ্য হয় তজ্জন্য অধ্যায়ের মধ্যেও সংখ্যাপাত দ্বারা বর্ণিত বিষয়ের বিভাগ করা হইয়াছে, ভাষা যতদূর সম্ভব তদুপযোগী করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

বহুবৎসর পূর্ব্বে আমি যখন উমাকান্ত একাডেমীতে ছাত্র ছিলাম তখন সুকবি শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বাগচী পরিচালিত "মানসী" পত্রিকায় [illegible]ইতিহাসে রূপকথা' নামে ধন্যমাণিক্যের শৈশব জীবনের একটি চিত্র আঁকিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ লেখা ইহার পর আর অধিক অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু তখন জানিতাম না যে ঐ লেখা এইভাবে আমাকে সমাপ্ত করিতে হইবে। এই দিক দিয়া ভাবিলে কবির উক্তি—

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা

—যথার্থ ই মনে হয়।

জার্ম্মাণ মনীষী Mommsen-এর বিশ্ববিখ্যাত History of Rome-এর Every man's Library-র ইংরেজীসংস্করণ-এর পুরোভাগে Carlyle-এর একটী অমর বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে।

Consider History with the beginnings of it stretching dimly into the remote time, emerging darkly out of the mysterious eternity, the true Epic Poem.

রাজমালায় ত্রিপুরার পুরা কাহিনী বৈদিক যুগের প্রান্ত হইতে নির্গত হইয়াছে এবং তাহা কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। স্বীয় জয় পরাজয় ও দোষগুণের প্রবেশ দ্বারা ইহা যথার্থ ভাবেই বলা হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে রাজমালার সেই কবিত্ব রূপকথার ভাষায় ইতিহাসের আকারে ফুটাইতে চাহিয়াছি, এক্ষণে ইহা কোমলমতি বালকগণের উপযোগী হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত রাজমালার পাঠ অনুযায়ী মহারাজ কল্যাণমাণিক্য অবধি রচিত হইয়াছে, তৎপরের অংশ গোবিন্দমাণিক্য হইতে কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য পর্য্যন্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত রাজমালা অবলম্বনে রচিত। স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার অমর আত্মার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এতৎ প্রসঙ্গে সাহিত্য জগতে সুপরিচিত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নামোল্লেখ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বহুবর্ষ পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমানের ন্যায় ঐতিহাসিক গবেষণার পথ সুগম ছিলনা তখনকার দিনে সুমার্জ্জিত ভাষায় তিনি তাঁহার "রাজমালা" প্রণয়নে বঙ্গ সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট দান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা মূলক গ্রন্থ হইতে আমি অনেক সহায়তা লাভ করিয়াছি। দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য হইতে কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য পর্য্যন্ত মূল রাজমালার রচনা পরিপাট্যহীন ও অনেক স্থলেই একরূপ দুর্ব্বোধ্য। সিংহ মহাশয়ের রচনা পাঠ দ্বারা ঐ ঐ অংশের ভাব গ্রহণ অনেক সময়ই সম্ভবপর হইয়াছে। কৃষ্ণকিশোর-মাণিক্যের পরবর্ত্তী রাজগণের বিবরণ লইয়া আর রাজমালার নূতন ভাগ রচিত হয় নাই। সিংহ মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে ঈশান চন্দ্রের

রাজত্বের সম্পূর্ণ ও বীরচন্দ্রের আংশিক ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

বীরচন্দ্রের অর্দ্ধ ও রাধাকিশোরের সম্পূর্ণ আলেখ্য কর্ণেল মহিম-চন্দ্রের 'দেশীয় রাজা' হইতে লওয়া হইয়াছে। বীরেন্দ্রকিশোরের রাজত্বে ব্যবসায় উন্নয়ন বিষয়টি চৃণ্টা প্রকাশের সুযোগ্য সম্প্রাদক শ্রীযুক্ত অপুর্ব্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ইংরাজী পুস্তক Progressive Tripura হইতে গৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পরিশেষে পিতৃদেব স্বর্গত শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, এম. এ. বিদ্যানিধি প্রণীত গবেষণামূলক ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ হইতে সাহায্য লাভের কথা উল্লেখ করিতেছি। তদীয় মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন— শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় বিরচিত "রাজমালা" বঙ্গ সাহিত্যে প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা চৈতন্য চরিতামৃত ও কীর্ত্তিবাসের রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের সময় প্রথম সঙ্কলিত হয়। ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ইহার প্রথম পাশ্চাত্য সার সঙ্কলন কর্ত্তা রেভাঃ লং সাহেব এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

We may consider this then as the most ancient work in Bengali that has come down to us as the Chaitanya Charitamrita was not written before 1557 and Kirttibas subsequently translated the Ramayan......The Rajmala of the Tipperah Family which bears all the marks of antiquity is kept with the greatest care. I have every reason to believe it to be a genuine record of the Tipperah Family. —Analysis of Rajmala.

ডাঃ ওয়াইজ তদীয় ভ্রাতার উল্লিখিত রূপ মত উদ্ধৃত করিয়া 'রাজমালা'র কথিত প্রতিলিপি এসিয়াটিক সোসাইটি দ্বারা মুদ্রিত হইবার জন্য প্রেরণ করিলে, তদুপলক্ষে লংসাহেব কর্ত্তৃক রাজমালার

সার সঙ্কলিত হইয়া তদীয় মন্তব্যসহ সোসাইটি পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তদীয় মন্তব্যে রাজমালাই ত্রিপুরা ইতিহাসের মূল ভিত্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

রাজমালার সংশ্লিষ্ট উপকরণ মধ্যে হস্ত লিখিত নিম্নোক্ত পুঁথিগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :—

১। চম্পক বিজয়

২। কৃষ্ণ মালা

৩। গাজিনামা (সমসের গাজি)

এই পুঁথিগুলি রাজমালা আফিসে অন্যান্য প্রাচীন উপাদান মধ্যে সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত রাজমালার অধুনা লুপ্তপ্রায় শেষ খণ্ডটির সহিত এইগুলি ব্যবহার করিবার জন্য রাজমালা আফিসের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সুহৃদ্বর শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বসু বি. এ. মহাশয় ও তদীয় সহকারী স্নেহভাজন শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ দাসের বিশেষ সহায়তা লাভ করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই, ত্রিপুরার প্রাচীন কীর্ত্তি বাঙ্গলা দেশের এবং বাঙ্গালী জাতির যে এক অভিনব গর্ব্বের বিষয় তাহা রাজমালা প্রচারের স্বল্পতা হেতু অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আজিও নিবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী যদি নিজ অতীত ইতিহাসের প্রতি সময়ে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠে তবে যে রাজমালা আজ ত্রিপুরার তাহা কালক্রমে সমগ্র বাঙ্গালার হইতে বাধা দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্

বেদান্তদর্শন—২।১।৩৩

যথাচ উচ্ছ্বাস প্রশ্বাসাদয়ঃ······স্বভাবাদেব ভবন্তি এবম্—ঈশ্বরস্য অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরঃ স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তি ভবিষ্যতি। — শঙ্কর।

"এই জগৎ-রচনা ঈশ্বরের লীলা-স্বরূপ, যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস কেবল মাত্র স্বভাবের বশে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রবৃত্তিও বিনা উদ্দেশে বিনা প্রয়োজনে কেবল মাত্র স্বভাবের বশে নিষ্পন্ন হইতে পারে।"

স যথা আর্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথক্-ধুমা বিনিশ্চরন্তি এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদ······**ইতিহাস** পুরাণং···

বৃহদারণ্যক উঃ।

"আর্দ্রকাষ্ঠ প্রদীপ্ত হইলে যেরূপ নানা প্রকার ধূম নির্গত হয়, হে মৈত্রেয়ি, তদ্রূপ পরব্রহ্মের অযত্ন প্রসূত নিঃশ্বাস স্বরূপ চতুর্ব্বেদ, **ইতিহাস** পুরাণ প্রভৃতি।"

যথা দীপ সহস্রাণি দীপ একঃ প্রসূয়তে।
তথা রূপ সহস্রাণি স এব একঃ প্রসূয়তে॥

—ভবিষ্যপুরাণ অঃ ৬৭, ব্রাহ্মপর্ব্ব।

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চিত্র-সূচী

আলোক চিত্র ঃ—

রাজমালা

(১)

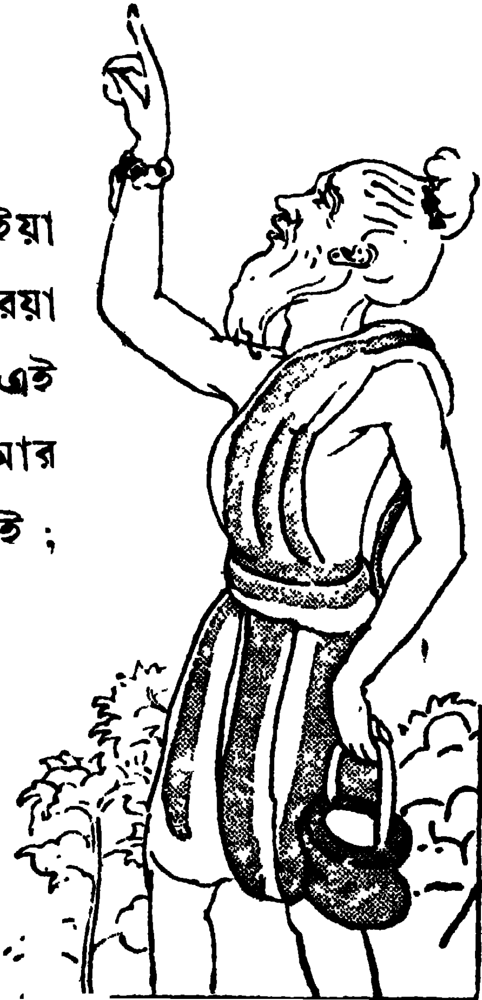
মহারাজ যযাতি

বেদে পুরূরবার নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহার আয়ু নামে পুত্র হয়। আয়ুর পুত্র নহুষ, নহুষের ছয় পুত্র জন্মে তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ যতির বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় ইনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং পিতার বিপুল রাজত্বে দ্বিতীয় পুত্র যযাতির অধিকার জন্মে। মহারাজ যযাতির দুই বিবাহ শুক্রাচার্য্য-কন্যা দেবযানীগর্ভে তাঁহার যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র আর বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। কোনও কারণে শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে এই বলিয়া শাপ দেন, 'তুমি যদিও বয়সে এখনো বৃদ্ধ হও নাই,

আমি শাপ দিতেছি তোমার শরীর অচিরে জরায় জীর্ণ হইয়া



যাউক, তুমি আশী বছরের বুড়ার ন্যায় একেবারে জড়সড় হইয়া পড়।' কি দারুণ শাপ! মুনি ঋষিদের মুখের কথা বাহির হইলে, ইহা কখনো বিফল হইবার নয়। মহারাজ যযাতি ভয়ে এতটুকু হইয়া গেলেন, অনুনয় করিয়া কহিলেন—'প্রভো, এই সংসারের সাধ আমার এখনো মিটে নাই; মনের মধ্যে ভোগের আশা তেমনি রহিয়া গিয়াছে, আপনি শাপ দিয়া শরীরকে বুড়া করিয়া ফেলিলেন কিন্তু মন ত বুড়া হইল না; এখন এর একটা উপায় করুন।' শুক্রাচার্য্যের মনে বুঝি দয়ার সঞ্চার



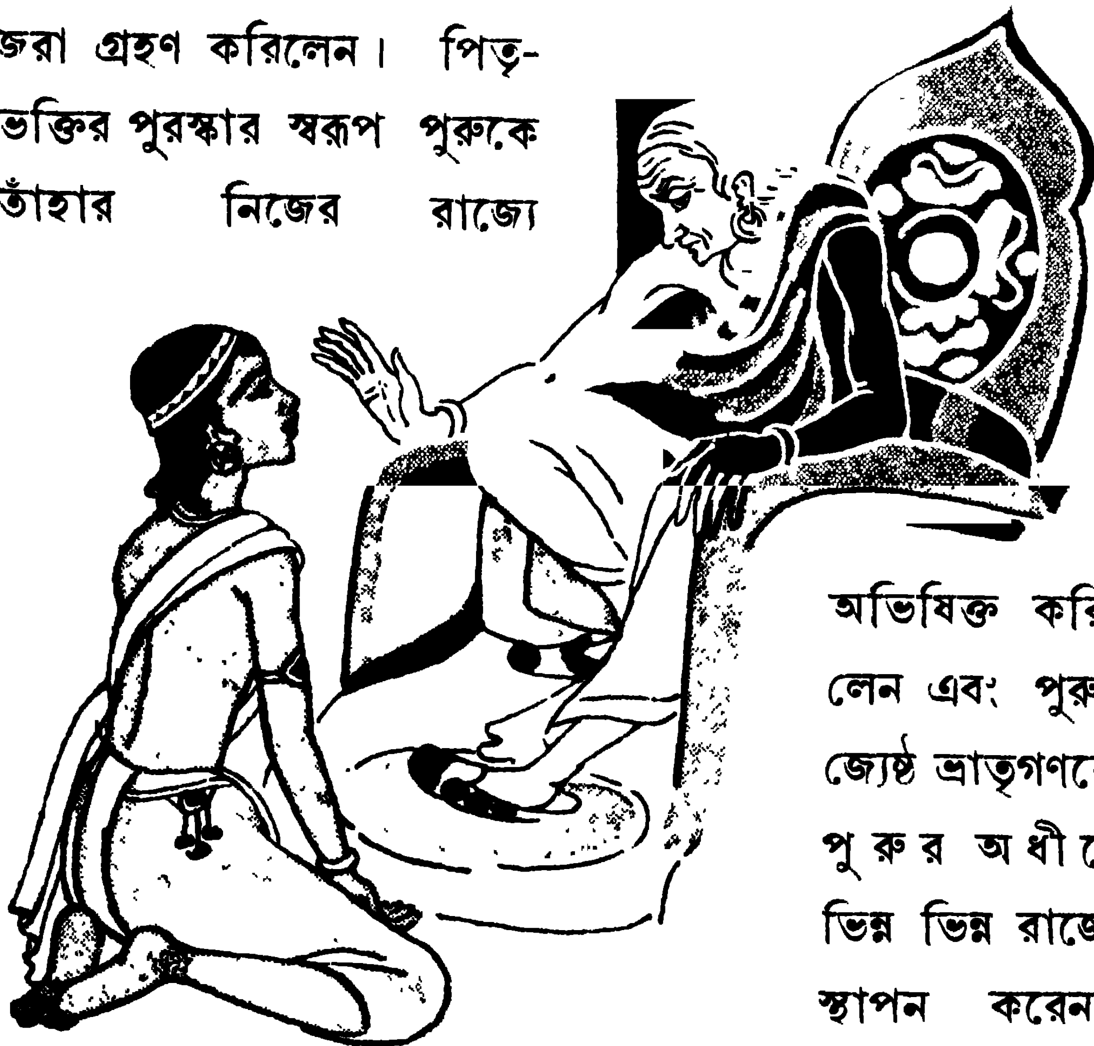
আমি শাপ দিতেছি, তোমার শরীর অচিরে জীর্ণ হইয়া যাউক।

হইল। তিনি বলিলেন—'আচ্ছা, আমি এর একটা উপায় করিতেছি। তোমাকে এই বর দিতেছি, তুমি নিজের জরা অপরকে দিতে পারিবে। যদি কোন তরুণ তোমার জরা গ্রহণ করে তবেই তুমি শাপমুক্ত হইলে।'

যযাতি এইরূপে অভয় পাইয়া নিজ পুত্রগণকে তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু পুত্রগণ একে একে অসম্মতি জানাইল। তখন সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু পিতৃআদেশ পালন করিতে সম্মতি জানাইল। পিতৃভক্ত পুরু কহিল—'পিতঃ, যে পুত্র আপনা হইতেই পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া অনুরূপ কায করে সে পুত্র উত্তম; পিতার আদেশে যে কায করে সে মধ্যম; অশ্রদ্ধায় যে তৎকার্য্য পালন করে সে অধম, আর যে পুত্র আদেশ পালন করে না সে পিতার বিষ্ঠা মাত্র।' এই প্রকার বলিয়া পুরু সানন্দে পিতার জরা গ্রহণ করিল। এদিকে মহারাজ যযাতি পুত্রের যৌবন পাইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিতে করিতে যযাতির বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। সংসার অসার বোধ হইল; যাহা পূর্ব্বে মধুর লাগিয়াছিল এখন তাহা তিক্ত ঠেকিতে লাগিল। পিতৃভক্ত পুরুকে কহিলেন—'বৎস, সংসারের সাধ মিটিয়াছে; তোমার যৌবন তোমাকে ফিরাইয়া দিতেছি এই লও, আমার জরা ফিরাইয়া দাও। আমি পরমপুরুষের ধ্যান করিতে বনে যাইতেছি।'

এই বলিয়া মহারাজ যযাতি পুত্রকে যৌবন ফিরাইয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে নিজের জরা গ্রহণ করিলেন। পিতৃ-ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ পূরুকে তাঁহার নিজের রাজ্যে



মহারাজ যযাতি পুত্রকে যৌবন ফিরাইয়া দিলেন

অভিষিক্ত করি-লেন এবং পূরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে পূরুর অধীনে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে স্থাপন করেন। দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণ দিকে যতুকে, পশ্চিমদিকে তুর্ব্বসুকে এবং উত্তরদিকে অনুকে রাজা করিয়া দিলেন। মহারাজ যযাতি এই ভাবে মায়ার বন্ধন এড়াইয়া বনে চলিয়া গেলেন। কালক্রমে নির্ম্মল পরব্রহ্ম বাসুদেবে ভাগবতী গতি লাভ করিলেন। 'পরে হমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে লেভে গতিং ভাগবতীং' (শ্রীমদ্ভাগবত, ৯।১৯।২৫)।

(২)

ত্রিপুররাজমালার আদিপুরুষ দ্রুহ্যুর কিরাত জয়

মহারাজ যযাতির রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠানপুরে। পুরাণের বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় এইস্থান প্রয়াগ-প্রদেশে গঙ্গার উত্তর তীরে বর্ত্তমান ছিল। পুরাণের যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত প্রয়াগের পবিত্রতার হ্রাস হয় নাই, পিতৃকার্য্যের জন্য প্রয়াগ প্রসিদ্ধ তীর্থ। সেই পুণ্যভূমিতে পুরু অভিষিক্ত হইলেন। প্রতিষ্ঠানপুর* রাজধানী হইলেও পুরুর রাজ্য বর্ত্তমান উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থল ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। যদুর অধিকারে মথুরা ও নর্ম্মদার কিয়দংশ রহিল। দ্রুহ্যুর অধিকার বর্ত্তমান চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ ও ব্রহ্মভূখণ্ডে ন্যস্ত হইল। এইভাবে অন্য ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের নিজ নিজ অংশ পাইলেন। ত্রিপুর রাজমালার আদি পুরুষই হইতেছেন মহারাজ দ্রুহ্যু। ইনি পিতার শাপে নির্ব্বাসিত হইয়া ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। দ্রুহ্যু কিরাত দেশে আসিয়া প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন। কপিল নদীর তীরে ত্রিবেগ স্থলে তাঁহার রাজপাট স্থাপিত হয়।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছুই সঠিক ভাবে জানিবার উপায় নাই। গৃহস্বামীর পরিবর্ত্তনে যেমন গৃহের

---

* রাজ্যং স কারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ, উত্তরে জাহ্নবীতীরে প্রতিষ্ঠানে মহাযশাঃ। [খিলহরিবংশ, ২৬।৪৯।]

আকার পরিবর্ত্তিত হয় এই ভারতবর্ষেরও তেমনি আকারের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কাজেই পূর্ব্বের পুস্তকে যেরূপ বর্ণনা আছে তদনুরূপ দেশ খুঁজিয়া বাহির করা সব সময় চলে না। এক্ষেত্রেও সেইরূপ। সেই অতি প্রাচীন কালের ত্রিবেগ বর্ত্তমানে কি নাম ও রূপ ধরিয়াছে তাহা লইয়া ঐতিহাসিকের মধ্যে অনেক মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। 'ঢাকার ইতিহাসে' এ সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে ঃ—"ব্রহ্মপুত্র ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যা এই নদ ও নদীত্রয়ের সঙ্গম স্থান ত্রিবেণী বলিয়া পরিচিত। এইস্থান নারায়ণগঞ্জের বিপরীত কূলে সোণারগাঁও পরগণায় অবস্থিত।

"কথিত আছে, যযাতির পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্য কিরাতভূপতিকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়া কোপল (ব্রহ্মপুত্র) নদের তীরে ত্রিবেগ বা ত্রিবেণী নগর সংস্থাপন পূর্ব্বক তথায় স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।"

—ঢাকার ইতিহাস, ৪৭২ পৃঃ।

ত্রিবেগ, সুবর্ণগ্রাম পরগণার অন্তর্গত। এই স্থানেই প্রথম রাজপাট স্থাপিত হয়। কোপল নাম 'কপিলে'রই অপভ্রংশ। সুবর্ণগ্রাম সম্বন্ধে ঢাকার ইতিহাসে এইরূপ লেখা আছে ঃ—

"জনশ্রুতি যে মহারাজ দ্রুহ্যর অনন্তরবংশীয় মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর সুবর্ণ বর্ষিত

হইয়াছিল বলিয়া ইহা সুবর্ণগ্রাম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে তৎপূর্ব্বে ইহা কিরাতাধিকৃত দেশ বলিয়া অভিহিত হইত।”

—ঢাকার ইতিহাস, ৯ পৃঃ।

ত্রিবেগ হইতে রাজপাট কালক্রমে স্থানান্তরিত হইলেও রাজবংশের একটি শাখা সেখানে রহিয়া গেল। দ্বিতীয় বিজয়-মাণিক্যের মৃত্যুর পর সমসের গাজী রাজদ্রোহী হইয়া যখন নিজকে ত্রিপুর-রাজ বলিয়া ঘোষণা করিল এবং প্রজা কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইল তখন সমসের কৌশল করিয়া সুবর্ণগ্রাম হইতে ত্রিপুর-রাজ বংশের একজনকে আনিয়া সাক্ষীগোপাল রাজারূপে অভিষিক্ত করিল। * ইনিই লক্ষ্মণমাণিক্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে ক্রুহ্য কিরাতদেশে আসিয়া প্রথম রাজ্যস্থাপন করেন। সুবর্ণগ্রাম পরগণার অন্তর্গত ত্রিবেগেই তাঁহার রাজত্ব স্থাপিত হয়। এতদ্দেশে কিরাত বসতি সম্পর্কে ‘ঢাকার ইতিহাস’ প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন রায় লিখিয়াছেন ঃ—

“সুবর্ণগ্রামে কিরাতব্যবসায়ী আদিমশূদ্রের আজিও অসদ্ভাব ঘটে নাই।”

* Samser obtained the government .... but the people not recognising him as the legitimate heir, he then installed, as Raja, one of the Tripura family, who resided at Sonargaon, but they still refused.

—Analysis of Rajmala

সোণারগাঁ যে কিরাত স্থান ছিল তাহার অন্য নিদর্শনও আছে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ভৌগোলিক টলেমী 'কিরাডিয়া' নামে কিরাত দেশের যে সংস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা 'বিশ্বকোষ'-কার কর্ত্তৃক লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে :—

"টলেমী কিরাডিয়া নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন উহা পুরাণোক্ত লৌহিত্য-নদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।"

—বিশ্বকোষ (আর্য্যাবর্ত্ত)।

মহাভারতেও কিরাতগণ ব্রহ্মপুত্র তীরে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। *

সোণারগাঁ যে মহাভারতের সময় বর্ত্তমান ছিল এবং পবিত্রস্থান রূপে পরিণত হইয়াছিল তাহার স্মৃতি 'লাঙ্গলবন্ধ' ও 'পঞ্চমী ঘাট' তত্রত্য এই দুইটি স্থান বহন করিয়া আসিতেছে। অষ্টমী স্নান উপলক্ষে প্রতিবৎসর এখানে বহু সহস্র লোকের সমাগম পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থল হইতে কর্ষণের পর যে স্থানে বলরাম লাঙ্গল থামাইয়াছিলেন, সে স্থান 'লাঙ্গলবন্ধ' নামে অধুনা পরিচিত

* "The Mahabharata locates them on the Brahmaputra."

--The Periplus of the Erythrean Sea, Edited by W. H. Schoff P. 253.

এবং 'পঞ্চমী ঘাট' নাম পঞ্চপাণ্ডবের বার বৎসর বনবাসের সময় এখানে স্নান হইতে হইয়াছে। *

এইভাবে সোণারগাঁর প্রাচীনত্ব সহজে অনুমান করিতে পারা যায়।

(৩)

দ্রুহ্যুর কাল নির্ণয়

ইতিহাস বলিতেই সন তারিখ বুঝা যায়। দ্রুহ্যুর কিরাত জয় এবং ত্রিবেগে রাজ্যস্থাপন কখন হইয়াছিল বলা সহজ নয়। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের গবেষণায় প্রাচীন ভারতের কালনির্ণয়

* On the bank of the old Brahmaputra river, 2 miles to the west of Painam, there are two bathing ghats held in great reverence by the Hindus, on account of their supposed connection with the history of Pandus. Nangalband or 'plough-stopped' is the place where Balaram checked his plough when he ploughed the Brahmaputra from its source. Close by is Panchami-ghat where the Pancha Pandava or five Pandava brothers used to bathe during their twelve years' wanderings.

—Archæological Survey of India Reports XV. (Behar and Bengal) by A. Cunninghum, P. 144-45

বুদ্ধদেব অবধি উঠিয়াছে, তার উর্দ্ধে যাইবার মত প্রমাণ মিলিতেছেনা। তাই বেদের যুগ ও রামায়ণ মহাভারতের কাল এখনো ঐতিহাসিকের গণায় ধরা দেয় নাই। এমন অবস্থায় দ্রুহ্যর কাল-নির্ণয় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতে হইবার সুবিধা কই? সে যাহা হউক শিলালিপি-নিদর্শন এখানে না পাইলেও পঞ্জিকা মতে কল্যব্দের আলোচনা চলিতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের তিরোধান দিন হইতেই কলিযুগের প্রারম্ভ ধরা হয়। এই তিরোধান দিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ২০ বৎসর পরে এবং সেই দিনেই মহারাজ যুধিষ্ঠির সিংহাসনে পরীক্ষিৎকে বসাইয়া বনে গমন করেন। * পঞ্জিকাতে সাধারণ ভাবে ঐ দিন লক্ষ্য করিয়া কলি-অব্দ ধরা হইয়া থাকে। কল্যব্দ খৃঃ পূঃ ৩১০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়াছে, তদনুসারে ভগবানের তিরোধান হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০৩৮ বৎসর অতীত হইয়াছে।

* The beginning of the Kali Age has been discussed by Dr. Fleet and he has pointed out that it began on the day on which Krishna died, which the chronology of the Mahabharata places, as he shows, some twenty years after the great battle and it was then that Yudhisthira abdicated and Parikshit began to reign.

—Purana Text of the Kali Age by Pargiter, Introduction. P.X.

মৎস্য পুরাণে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মহারাজ নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত এক হাজার পঞ্চাশ বৎসর ধরা হইয়াছে।

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এবং বর্ষসহস্রন্তুজ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥

—মৎস্যপুরাণ।

নন্দের সহিত চন্দ্রগুপ্তের দ্বন্দ্ব এবং চাণক্যের সহায়তা এই সব কাহিনী পাশ্চাত্য মতে খাঁটি ইতিহাস বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু মৎস্যপুরাণে এই যে কালের ধারা ঊর্দ্ধ হইতে টানিয়া আনা হইয়াছে ইহার সহিত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের অনেকটা ঐক্য আছে। যাহা হউক, কল্যব্দ অনুযায়ী দ্রুহ্যুর কাল কিরূপ হয় দেখা আবশ্যক।

শ্রীরাজমালায় উল্লেখ আছে দ্রুহ্যুর পরবর্ত্তী রাজা ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। কল্যব্দ ৩১০০ খৃষ্ট পূর্ব্ব হইলে, মহারাজ দ্রুহ্যুর ত্রিবেগ রাজ্য স্থাপনের কাল ইহা হইতে আরও পূর্ব্বে হইয়া পড়ে। এই ভাবে মোটামুটি সময়ের একটি ধারণা পাওয়া যায়।

যুরুপীয় মনীষীরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন সময় অনুমান করেন। উইলফোর্ডের মতে ১৩৭০ খৃঃ পূঃ, সার উইলিয়ম জোন্সের মতে ১৩০৫ খৃঃ পূঃ, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ১০০০—৮০০ খৃঃ পূঃ। যদি যুরুপীয়দের মতে দ্রুহ্যুর সময় নির্দ্ধারণ আবশ্যক হয় তবে ইহাদের যে কোনটির সহিত ১৫০

বৎসর যোগ করিলেই ঐ সময়ের ধারণা করিতে পারা যায় কারণ দ্রুহ্যু হইতে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ত্রিলোচন চারি পুরুষ।

কাল বিচার দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়। শেষোক্ত য়ুরুপীয় মত গ্রহণ করিলেও আদিপুরুষ দ্রুহ্যুর আবির্ভাব কালে পৃথিবীর মানচিত্রে কি দেখা যায়? যে য়ুরুপীয় জাতির প্রবল প্রতাপে পৃথিবী আজ তাহাদের করতলগত, সেই জাতির জন্ম হওয়া দূরে থাকুক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ গ্রীক রোমান জাতিরও জন্ম হয় নাই। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বিবেকানন্দ এক সময়ে ভারতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তদীয় পাশ্চাত্য শিষ্যদ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ভারত সুদূর অতীতের জাতি সমূহকে কবর দিয়াছে, য়ুরুপীয় বর্ত্তমান জাতি সমূহকেও কবর দিবে, তৎপরেও স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকিবে।' মহাপুরুষের এই বাক্যের সাক্ষী-স্বরূপ ত্রিপুরা রাজ্য স্মরণাতীত কাল হইতে স্বীয় গরিমায় আজিও বাঁচিয়া আছে, ভবিষ্যতেও বাঁচিয়া থাকিবে।

(৪)

দৈত্যের বানপ্রস্থ

মহারাজ দ্রুহ্যুর পুত্র দৈত্য কালক্রমে পিতার রাজ্যে অভিষিক্ত হন। তিনি অতি সদাশয় ছিলেন, প্রজাগণকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। কি করিলে নিজ রাজ্যের উন্নতি

হইবে সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা ছিল। অনেক দিন পরে তাঁহার ত্রিপুর নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ত্রিপুরের জন্মে রাজ্যে আর আনন্দ ধরে না। সকলের চক্ষুর মণিস্বরূপ হইয়া ত্রিপুর বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এত আদর এত ভালবাসার মধ্যেও ত্রিপুরের স্বভাব কোমল হইল না। বয়সের সঙ্গে ত্রিপুরের চরিত্র ঘোরতর তুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। ইহাতে সকলে প্রমাদ গণিল। হায়! হায়! এমন সাধু রাজার ছেলে এরূপ অসাধু হইল কেন?

ইহার কারণ অনুসন্ধানে মহারাজ দৈত্য দেখিলেন এই কিরাত দেশে বাস করিয়াই ত্রিপুরের মতি গতি বিকৃত হইয়াছে। তাঁহার বড়ই খেদ হইল—মহারাজ যযাতির রাজ্যের উত্তম গঙ্গা যমুনার মধ্যভাগ যাহা 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামে প্রসিদ্ধ তাহা হইতে পিতার শাপে বহিষ্কৃত হওয়াতেই এই তুর্গতি। যদি দ্রুহ্যু সে দেশে বাস করিবার অনুমতি পাইতেন তবে আজ এই পুত্র লইয়া দৈত্যের এত তুর্গতি ভুগিতে হইত না। সেই পুণ্যদেশের স্মৃতি দৈত্যের মনকে পীড়া দিতে লাগিল। এই গঙ্গা যমুনা আশ্রিত দেশ গুলি সত্যই ত্রৈলোক্যতুর্ল্লভ—হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, কাশী কত না তীর্থ বিরাজিত। দৈত্যের চোখে জল ঝরিতে লাগিল। এই পুণ্যভূমিতে জন্মাইবার জন্য দেবতারাও বাঞ্ছা করেন এবং স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে আসেন। এইসব তীর্থের নাম প্রভাতে জাগিয়া স্মরণেও পাপ নষ্ট হয় এবং অন্তকালে পরম পদ লাভ হয়। ত্রিপুর কিরাত দেশে জন্মিয়া এসব কিছুই

দেখিল না—অনার্য্য কিরাত-সঙ্গ করিয়া কুকর্ম্মে রত হইয়া পড়িল। বেদ বেদান্ত পাঠ শুনিতে পাইল না, দান ধর্ম্ম কিছুই বুঝিল না, ব্রাহ্মণের পূজাপার্ব্বণ জানিতে পারিল না ; কিরাত দেশে কিরাত আচারে ত্রিপুর নিজ বংশ-মর্য্যাদা ভুলিয়া গেল ! এইরূপ দুঃখে মহারাজ দৈত্যের রাজত্ব সুখ ভাল লাগিল না। কি ভাবে হরিপদ পাইবেন এই চিন্তায় বনে চলিয়া গেলেন। বনে যোগাসনে বসিয়া তিনি হরি চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, এই ভাবে তাঁহার মৃত্যু হইল। এদিকে ত্রিপুর কিরাত-পতি হইলেন।

(৫)

ত্রিশূলাঘাতে ত্রিপুরের মৃত্যু ও চতুর্দ্দশ দেবতার প্রকাশ

ত্রিপুর রাজা হইয়া গর্ব্বে দেশ জয় আরম্ভ করেন—একে ত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি তাতে আবার বীর যোদ্ধা, তাঁহার নিকট অনেক রাজাই হারিতে লাগিল। পার্ব্বত্য বহু রাজা তাঁহার বশ মানিল। এইরূপ প্রভুত্ব পাইয়া ত্রিপুরের অত্যাচার ক্রমেই দুঃসহ হইল। প্রজারা শিবের আরাধনা করিতে লাগিল—'হে মহাদেব, রাজার পীড়ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।' শিবের দয়া হইল। একদা ত্রিপুরের রাজ্যে শিব আবির্ভূত হইলেন, আসিয়া দেখেন ত্রিপুর অতি দুরাচার, ঈশ্বর মানে না। শিব তখন

সংহার রূপ ধারণ করিয়া ত্রিপুরের বুকে ত্রিশূল আঘাত করিলেন। ত্রিপুরের মৃত্যু হইল; শিবের ত্রিশূলে মৃত্যু হওয়ায় ত্রিপুর মরিয়া স্বর্গে গেলেন।



ত্রিপুর নিজ অধিকৃত দেশের সহিত নিজ নাম যোগ করিয়া দেন, সেই হইতে 'ত্রিপুরা'নামের উৎপত্তি এবং স্ব-জাতি ত্রিপুরের নামে পরিচিত। ত্রিপুর নিজকে এত বড় মনে করিতেন

শিব তখন সংহার রূপ ধারণ করিয়া ত্রিপুরের বুকে ত্রিশূল আঘাত করিলেন

যে পিতৃ-পিতামহের স্মৃতি লোপ করিয়া নিজের নামে জাতীয় পরিচয় দেন এবং দেশের নামের স্মৃতি লোপ করিয়া তাহার উপরও নিজের নামের ছাপ বসাইয়া দেন।

শিবের ত্রিশূলাঘাতে ত্রিপুরের মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু প্রজাগণের দুঃখ দূর হইল না। রাজ্য অরাজক হইল, দৈব কোপে রাজ্যে নানা অশান্তি ঘটিতে লাগিল। অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে প্রজার দুঃখের সীমা রহিল না। প্রজাগণ নিকটস্থ হেড়ম্বরাজ্যে ভিক্ষা করিয়া আহার যোগাইতে লাগিল। কখনও বা হেড়ম্ববাসীরা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত, ভিক্ষা করিতে যাইবার কালে বস্ত্রের অভাবে তাহারা কখনও বা গাছের ছাল পরিত। এইরূপ অরাজকরাজ্যে বহু দুঃখে কাল কাটাইয়া প্রজারা ঠিক করিল পশুপতির আরাধনা করিবে। কিরাত ভাবে তাহারা পূজা আরম্ভ করিল এবং সাতদিন সাতরাত শিবের নামে বাদ্যগীতে বিভোর হইয়া রহিল। শিবের দয়া হইল। বাঘছাল পরণে, গলে ফণিহার, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, হস্তে শিঙ্গা ডম্বরু, নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে দেবদেব মহাদেব আবির্ভূত হইলেন। প্রজাগণ মাটিতে লুটাইয়া কহিতে লাগিল, 'প্রভো, ত্রিপুরের পাপে আমরা কত না কষ্ট পাইতেছি ; অবোধ সন্তানদের ক্ষমা কর। ত্রিপুরকে মারিয়া রাজপাট শূন্য করিয়াছ। অরাজক রাজ্যে বাস করা যায় না। আমাদিগকে রাজা দাও।

শিব প্রসন্ন হইলেন। আদেশ হইল—ত্রিপুরের রাণী হীরাবতী শিব-প্রসাদে পুত্রবতী হইবেন, শিবের বরে

যে পুত্র জন্মিবে তাঁহার দ্বারা রাজ্যের অশেষ কল্যাণ হইবে। চন্দ্রবংশ বলিয়া ইহার যেমন চন্দ্রধ্বজা হইবে তেমনি ত্রিশূলধ্বজাও হইবে। * দেবকৃপা ভিন্ন রাজ্যের মঙ্গল অসম্ভব, সেইজন্য নিত্য পূজার্চ্চনের জন্য শিব-আজ্ঞায় নির্ম্মিত চতুর্দ্দশ দেবতার মুখ প্রজাগণের নিকট প্রকাশিত হইল। চতুর্দ্দশ দেবতার নাম :-

হর, উমা, হরি, মা (লক্ষ্মী), বাণী (সরস্বতী), কুমার (কার্ত্তিকেয়), গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমালয়।

সংস্কৃত হরোমাহরিমাবাণীকুমার-গণপা বিধিঃ।
ক্ষাব্ধী গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশ ॥

চতুর্দ্দশ কুলদেবতার যথাবিধি পূজার আদেশ করিয়া শিব অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে রাণী হীরাবতী শিব ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং কালক্রমে শিব-বরে এক পুত্র-রত্ন প্রসব করিলেন। রাজ্যে আনন্দের বন্যা বহিল।

* ত্রিপুর রাজচিহ্ন :--(১) চন্দ্রধ্বজ, (২) ত্রিশূলধ্বজ, (৩) মীন মানব, (৪) শ্বেতচ্ছত্র, (৫) আরঙ্গী (ব্যজন), (৬) তাম্বূল পত্র, (৭) হস্তচিহ্ন, (৮) রাজলাঞ্ছন (Coat of Arms) ; দরবার উপলক্ষ্যে এই চিহ্নসকল ব্যবহৃত হয়।

(৬)

ত্রিপুরা নামের হেতু ও ত্রিপুর রাজচিহ্ন

ত্রিপুরের অমিত বিক্রম হইতে ত্রিপুরা নামোৎপত্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ত্রিপুরের নামে তাঁহার বংশ ত্রৈপুর আখ্যা পাইয়াছিল। মহাভারতের সভাপর্ব্বে সহদেব দিগ্বিজয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—

মাদ্রীসুতস্ততঃ প্রায়াদ্বিজয়ী দক্ষিণাং দিশং। *
ত্রৈপুরং স্ববশে কৃত্বা রাজানমমিতৌজসম্॥ ৬০

ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি ত্রিপুরারি শিবের সহিত জড়িত। সতীর দক্ষিণপদ ত্রিপুরাতে পড়িয়াছে, তাই পীঠস্থানে ত্রিপুরা সুন্দরীর বিগ্রহ রহিয়াছে। যেখানে দেবীর আসন থাকে সেখানে ভৈরবও বাস করেন। বর্ত্তমানে উদয়পুরে ত্রিপুরা সুন্দরী বিরাজিতা, সেখানে ভৈরব ত্রিপুরেশ শিব। শিবের প্রসাদেই চতুর্দ্দশ কুলদেবতার আবির্ভাব হয়। সুতরাং শিবের ত্রিপুরারি নামের সহিত এ রাজ্যের সব কিছু জড়িত। দিগ্বিজয়ী দুর্দ্দান্ত ত্রিপুরের নামেও ত্রিপুরারি শিবের স্মৃতিই রক্ষিত।

* ত্রৈপুর নামে ত্রিপুরের রাজ্যের উল্লেখ আরও পাওয়া যায়:—

প্রাগ্‌জ্যোতিষাদনু নৃপঃ কৌশল্যোঽথ বৃহদ্বলঃ।
মেকলৈঃ কুরুবিন্দৈশ্চ ত্রৈপুরৈশ্চ সমন্বিতঃ॥
—মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৮৭ অঃ, ৯ম শ্লোক।

বরেন্দ্রতাম্রলিপ্তঞ্চ হেড়ম্বমণিপুরকম্।
লৌহিত্যাত্রৈপুরং চৈব জয়ন্তাখ্যং সুসঙ্গকম্।
—বিশ্বকোষধৃত ভবিষ্য পুরাণ—ব্রহ্মখণ্ড।

রাজচিহ্ন সম্বন্ধে শিবের নির্দ্দেশ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখানে ত্রিপুরার রাজচিহ্নের একটু বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

১। চন্দ্রধ্বজ ইহা সোণার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন, রৌপ্যদণ্ডের উপরিভাগে সংযুক্ত; ইহা সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে ধারণ করা হয়।

২। ত্রিশূলধ্বজ ইহাও স্বর্ণ নির্ম্মিত ত্রিশূলাকার চিহ্ন, রৌপ্যদণ্ডের উপর সংযুক্ত।

৩। মীন মানব -ইহার ঊর্দ্ধভাগ কটিদেশ পর্য্যন্ত নারীমূর্ত্তি, তন্নিম্ন ভাগ মীনাকৃতি। এই চিহ্ন জলদেবী গঙ্গার প্রতিমূর্ত্তিরূপে গণ্য হইয়া থাকে, ইহার দক্ষিণ হস্তে একটি পতাকা, প্রজার নিকট ইহা রাজধর্ম্মের সুরধুনীতুল্য পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে। প্রতি বৎসর এই রাজ্যে গঙ্গা পূজা হইয়া থাকে। মীন মকরস্থলীয় হইয়া গঙ্গার বাহন।

৪। শ্বেতচ্ছত্র ইহা চন্দ্রবংশীয় নৃপতি ও প্রধান ব্যক্তির একটি বিশেষ চিহ্ন, মহাভারতে ভীষ্মের উপর শ্বেতচ্ছত্র বিরাজিত এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

৫। আরঙ্গী- -ইহা শ্বেতচ্ছত্র নির্ম্মিত ব্যজন বিশেষ। মহারাজ ত্রিলোচনের বিবাহ যাত্রাকালেও শ্বেতচ্ছত্রের সহিত এ চিহ্ন সঙ্গে ছিল।

৬। তাম্বুল পত্র (পান) --এই চিহ্ন রৌপ্য নির্ম্মিত। ইহা সিংহাসনের বাম পার্শ্বে ধারণ করা হয়। হিন্দুগণ শান্তি ও মঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ তাম্বুল ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৭। **হস্তচিহ্ন (পাঞ্জা)**—এই চিহ্নটিও রৌপ্য নির্ম্মিত। ইহা সিংহাসনের বাম পার্শ্বে ধারণ করা হয়। জগন্মাতা আদ্যাশক্তির 'অভয়মুদ্রা' হইতে এই চিহ্ন গৃহীত হইয়াছে।

৮। রাজলাঞ্ছন (Coat of Arms) এই চিহ্নের সর্ব্বোপরি ত্রিশূলধ্বজ, তন্নিম্নে চন্দ্রধ্বজ, তাহার দুই পার্শ্বে চারিটি পতাকা ও দুইটি সিংহ অঙ্কিত রহিয়াছে। মধ্যস্থলে একটি ঢাল। সিংহ ক্ষাত্রবীর্য্যের বা রাজশক্তির পরিচয় জ্ঞাপক ; পতাকা চতুষ্টয় হস্তী, আরোহী, ঢালী, তীরন্দাজ এবং গোলন্দাজ এই চতুরঙ্গ বাহিনীর নির্দ্দেশ স্বরূপ। মধ্যস্থলে অঙ্কিত ঢালকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া এক একভাগে নিম্নোক্ত এক একটি চিহ্ন অঙ্কন করা হইয়াছে যথা।

১। মীন মানব ২। তাম্বুল পত্র ৩। হস্তচিহ্ন (পাঞ্জা) ৪। পাঁচটি তারা, তারা পাঁচটি পঞ্চশ্রী সমন্বিত রাজশ্রীর পরিচায়ক, পাঁচ শ্রী ব্যবহারের অর্থও আছে যথা :

আদ্যা কীর্ত্তির্দ্বিতীয়া প্রকৃতিষু করুণা দাক্ষতাসাং তৃতীয়া
তুর্য্যাস্যাৎ দানশৌণ্ডং নৃপকুলমহিতা পঞ্চমী রাজলক্ষ্মী
উদ্ভট্।

উক্তচিহ্নের নিম্নভাগে দেবনাগরী অক্ষরে একটি প্রবচন অঙ্কিত আছে। "কিল বিভুর্বীরতাং সারমেকম্"। ইহার তাৎপর্য্য —বীর্য্যই একমাত্র সার। এই সুদৃঢ় নীতি-বাক্যের উপর ত্রিপুর রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত।

৯। সিংহাসন—ইহা ষোলটি সিংহধৃত অষ্টকোণ বিশিষ্ট

আসন। মহারাজ ত্রিলোচনের রাজ্যাভিষেক কালেও সিংহাসন ছিল, শ্রীরাজমালায়ই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ষোলটি সিংহের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অষ্টকোণে সংস্থাপিত আটটি সিংহ কর্ত্তৃক উক্ত সিংহাসন ধৃত হইয়াছে—ক্ষুদ্রাকারের অপর আটটি সিংহ উপলক্ষ্য মাত্র।

এই সিংহাসন অনেকবার সংস্কৃত হইয়া থাকিলেও প্রাচীন উপকরণ যতদূর সম্ভব স্থিরতর রাখা হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বরগণ রাষ্ট্রবিপ্লবে বিধ্বস্ত হইয়া সময় সময় রাজপাট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও সিংহাসন এবং চতুর্দ্দশ দেবতা কোন কালেই পরিত্যাগ করেন নাই, সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন এবং তাহা অসম্ভব হইলে বিশ্বস্ত পার্ব্বত্য প্রজার আলয়ে গচ্ছিত রাখিতেন। কোন কোন সময় সিংহাসন, নিভৃত গিরিনির্ঝরিণীতে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবার কথাও শুনা যায়। এই কারণে সমসের গাজী উদয়পুরের রাজধানী অধিকার করিয়াও সিংহাসন না পাওয়ায় বাঁশের সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া 'লক্ষ্মণমাণিক্যকে' সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞকালে ত্রিপুরেশ্বরকে বর্ত্তমান সিংহাসন প্রদান করেন, ত্রিপুরা রাজ্যে এইরূপ প্রবাদ আছে। সিংহাসন সম্মুখে প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ এবং যথানিয়মে উক্ত আসনের অর্চ্চনা হয়। তৎসহ কতিপয় শালগ্রামচক্রও অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।*

* স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রাজচিহ্ন প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।

(৭)

ত্রিলোচন ও হেড়ম্ব-রাজ

শিবের বরে রাণী হীরাবতীর পুত্র জন্মিল, তাহার নাম হইল ত্রিলোচন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে তাঁহার ললাটে একটি চক্ষু দেখা গিয়াছিল। অরাজক রাজ্যে এতদিনে রাজা আসিলেন, রাজার অভাবে কত না দুঃখ ঘটিয়াছিল! রাজ্যবাসী সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। মাসান্তে মন্ত্রীবর ত্রিলোচনের মাথার উপর রাজচ্ছত্র ধরিলেন এবং ত্রিলোচনের নামে মুদ্রা প্রস্তুত করাইলেন। শিবের আদেশ মত চন্দ্রধ্বজা ও ত্রিশূলধ্বজা শোভিতে লাগিল। যত দিন যাইতে লাগিল ততই ত্রিলোচনের উদ্দেশে নানা দেশ হইতে ভেট আসিতে লাগিল। কিরাতেরা তাহাদের বার্ষিক ভেট লইয়া উপস্থিত হইল।

ত্রিলোচন কলায় কলায় বাড়িতে লাগিলেন, তাঁহার মধুর চরিত্রে সকলে মোহিত হইয়া গেল। শিব দুর্গা হরির প্রতি ভক্তিতে তাঁহার মন ভরা, পুণ্য কর্ম্মে সদা তাঁহার মতি। ত্রিপুরের পাপে যে রাজ বংশ ক্ষয় হইতে চলিয়াছিল, ত্রিলোচনের পুণ্যবলে সেই বংশ অক্ষয় ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে ত্রিলোচনের বার বছর বয়স হইয়া গেল। তখন তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। আশে পাশে বিস্তর ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে ত্রিলোচনের বিবাহের জন্য প্রস্তাব আসিতে লাগিল। রূপে গুণে এরূপ পাত্র একান্ত দুর্ল্লভ,

রূপে তিনি ছিলেন কন্দর্প তুল্য, যুদ্ধে অগ্নিতুল্য, ক্ষমায় পৃথিবী সদৃশ, বাক্যে বৃহস্পতিসম। নানা যন্ত্র শিক্ষায় তাঁর ছিল অসাধারণ জ্ঞান, বিদেশাগত ব্রাহ্মণের নিকট হইতেও শাস্ত্র পাঠে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার বৈষ্ণব চরিত্র ও সাধুর আচারে সকলের মন মোহিত হইয়াছিল।

ত্রিপুরের মৃত্যুর পর পার্শ্বস্থ যে হেড়ম্বরাজ্যে (কাছাড়) প্রজারা ভিক্ষা করিতে যাইত সেই দেশে ত্রিলোচনের সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। হেড়ম্বরাজ মনে মনে ভাবিলেন এমন পাত্রে যদি কন্যা দিতে পারিতাম, আমি ত বুড়া হইয়া পড়িতেছি! আশে পাশে যে সব রাজা তাহারা ম্লেচ্ছ, কোচ ইত্যাদি। আমি ত পুত্রহীন, আমার অভাবে এ রাজ্য কে দেখিবে? যদি এমন সোনার চাঁদ ছেলে পাই তবে বুড়া বয়সে শান্তি পাইতে পারি। এইরূপ ভাবিয়া এক ব্রাহ্মণকে বিবাহের দূতরূপে হেড়ম্বরাজ ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠাইয়া দেন।

বিবাহের দূত আসিয়া মন্ত্রিগণের নিকট হেড়ম্বরাজের ইচ্ছা জানাইতেই সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। এ বিবাহে সকলেরই একমত, এরূপ উত্তম প্রস্তাব ছাড়া উচিত নয়। দূত হেড়ম্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। হেড়ম্বরাজ কন্যার বিবাহের দিন স্থির করিলেন। দেখিতে দেখিতে শুভদিন ঘনাইয়া আসিল। হেড়ম্বরাজ্য বিবাহের সাজসজ্জায় মহা আড়ম্বরে শোভিত হইল। এদিকে ত্রিপুরেশ্বর ত্রিলোচন, মন্ত্রী সেনাপতি পাত্রমিত্র সভাসদ লইয়া হেড়ম্বরাজ্য উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

শত শত হাতী ঘোড়ায় শোভাযাত্রা চলিল, অগণন কিরাত সেনায় শোভাযাত্রা অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িল। দূর হইতে দেখিয়া মনে হইল যেন এক যুদ্ধের অভিযান চলিয়াছে। পথে দিন কয় কাটিয়া গেল, তারপর হেড়ম্বরাজ্য মিলিল। একদিন প্রভাতে দুই রাজার সাক্ষাৎ হইল। ত্রিলোচনকে দেখিয়া হেড়ম্বরাজ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। রূপে ভুবন আলো করিতেছে এমন বর আসিয়াছে দেখিয়া রাজ্যে আনন্দের আর সীমা ধরে না। হেড়ম্বরাজ কহিয়া উঠিলেন--আমার বড় ভাগ্য যে শিব-পুত্র ত্রিলোচন আমার রাজ্যে আসিয়াছেন।

ত্রিলোচনের থাকিবার জন্য এক বিপুল শিবির রচনা হইল। সমস্ত লোকজন লইয়া সেই কৃত্রিম ত্রিপুর নগরীতে ত্রিলোচন রাজঠাটে অভ্যর্থনা পাইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে হেড়ম্বরাজার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। সাত দিন ধরিয়া মহা উৎসব চলিল-- বাদ্যভাণ্ড নৃত্যগীতে সর্ব্বত্র মুখরিত। হেড়ম্বরাজ মঞ্চের উপর বসিয়া অগণিত লোকের ভোজন-আনন্দ দেখিলেন। তারপর বিদায়ের পালা আসিল। এখন রাজকন্যাকে বিদায় দিতে হইবে, হেড়ম্বরাজের চোখে জল আসিল। কন্যাকে বহু যৌতুক দিলেন, কত মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার, কত ঘোড়া, কত হাতী, কত দাস দাসী সঙ্গে দিয়া কন্যাকে বিদায় দিলেন। হেড়ম্বরাজ নিজ রাজ্য হইতে কতক দূর কন্যার সঙ্গে চলিয়া আসিলেন তারপর চোখের জলে মেয়ের নিকট বিদায় মাগিয়া রাজ্যে ফিরিলেন।

এইরূপে মহা ধুমধামে ত্রিলোচনের বিবাহ সমাপ্ত হইল। ত্রিপুররাজ্য এতদিনে লক্ষ্মীযুক্ত হইল, গাছে গাছে ফুল ফুটিল, ক্ষেতে ফসল হইল, প্রজার সকল কষ্ট দূর হইল—দুঃখের দিন কাটিয়া গেল। সকলের মুখেই হাসি, দুঃখের রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, সোনার সূর্য্য উঠিয়াছে। এমনিভাবে কয়েক বছর কাটিয়া গেল, শুভদিনে রাজ-রাণী এক পুত্র প্রসব করিলেন। হেড়ম্বরাজ এই সংবাদ শুনিয়া পরমানন্দ পাইলেন—আমার পুত্র নাই, এত বড় রাজত্ব কে ভোগ করিবে? এদিকে আমার আয়ু ত প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। যাক্ বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, এই দৌহিত্রই হইবে আমার উত্তরাধিকারী। একেই আমি এ রাজসিংহাসনে বসাইব।

যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। হেড়ম্বরাজ নাতি দেখিতে চাহিলেন। কুমারকে লইয়া ত্রিপুরবাহিনী হেড়ম্বরাজ্যে পৌঁছিল। কুমারের থাকার জন্য পাকাপাকি ব্যবস্থা হইল, কুমার দিনে দিনে হেড়ম্বরাজ্যে বাড়িতে লাগিলেন। সে দেশ এমনি তাঁহার গা-সহা হইল যেন জন্মভূমি আর ত্রিপুরা রাজ্য না দেখিতে দেখিতে ইহা হইয়া পড়িল দূরের দেশ। এইভাবে হেড়ম্বরাজের মনের ইচ্ছা পূরণ হইল। হেড়ম্বরাজ্যের ভাবী রাজা হইয়া কুমার ক্রমেই বড় হইতে লাগিলেন।

(৮)

বারঘর ত্রিপুর ও চতুর্দ্দশ দেবতার উদ্বোধন

রাণী বারটি পুত্র প্রসব করিলেন। প্রথম পুত্র দৃক্‌পতি হেড়ম্বরাজ্যে রহিয়া গেলেন, বাকী একাদশপুত্র ত্রিপুরা রাজ্য আলো করিতে লাগিলেন। ইহাদের নাম দাক্ষিণ, দক্ষ, দ্রুমায়ু, দ্রবিণ, দৃষ্টঘ্ন, ভূগু, তুর্দ্ধর, দ্রুহ্য, তুম্বায়ু, দৌবিরি এবং দম্প। ত্রিলোচনের এই বার পুত্রকে বারঘর ত্রিপুর কহে। ইহারাই রাজবংশ। দৈবাৎ যদি কোন রাজার পুত্র সন্তান না জন্মে তবে ইহাদের মধ্য হইতে রাজা নির্ব্বাচন করিতে হয়। ইহাদের শরীরের গঠন ও রূপ চন্দ্রবংশেরই অনুরূপ, ইহারা গৌর বর্ণ, উচ্চতা শোভন মত, উন্নত নাসিকা, কর্ণ পরিমিত, সিংহস্কন্ধ, বিশাল বক্ষ ও ক্ষীণোদর। ইঁহারা তেজোময়, শুদ্ধ শান্ত, দেব দ্বিজে ভক্তিমান, হরিহর দুর্গাভক্ত।

ত্রিলোচনের রাজত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা চতুর্দ্দশ দেবতার পূজক সমুদ্রতীর হইতে আনয়ন। শিবের আজ্ঞামত দ্বীপ হইতে পূজক আনা হয়। ইঁহারা চন্তাই দেওড়াই নামে প্রসিদ্ধ। প্রথমে ইহারা আসিতে চান নাই, পরে যখন শুনিলেন ত্রিপুর শিব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে এবং শিবপুত্র ত্রিলোচন রাজ্যেশ্বর

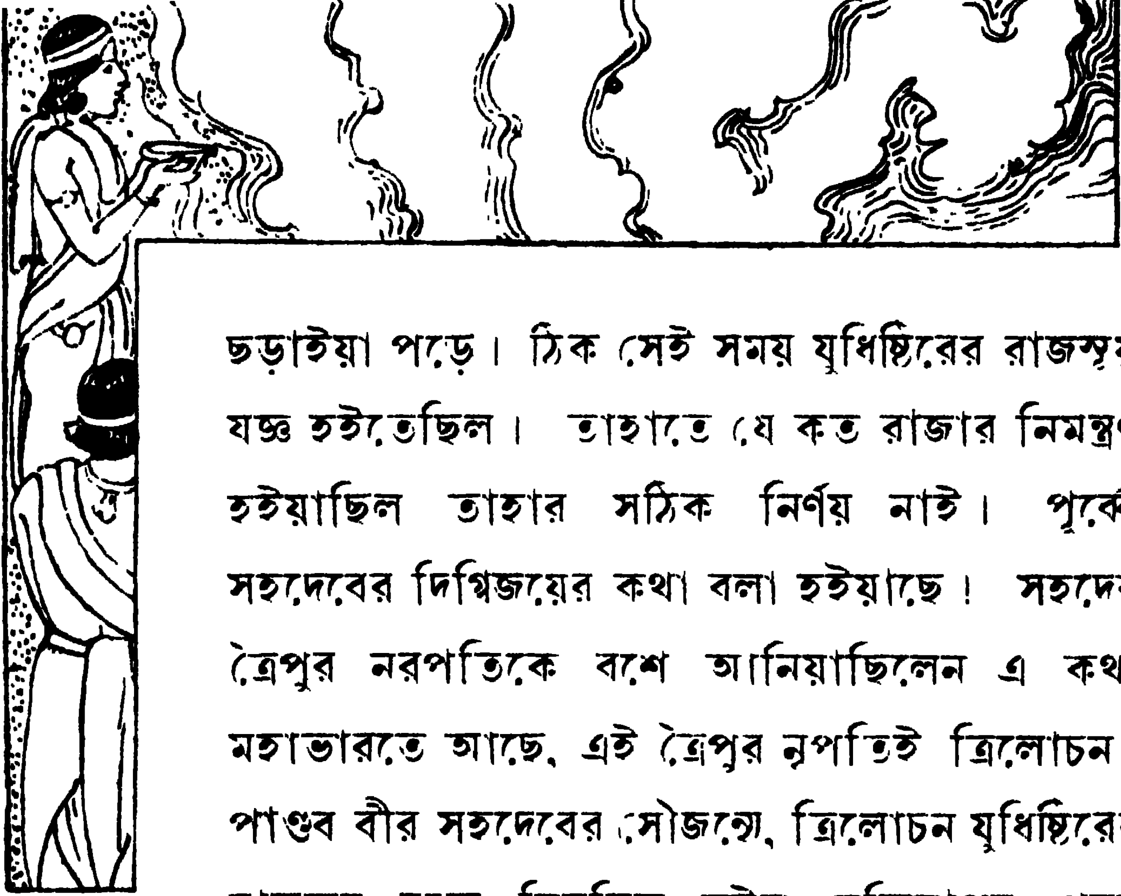
তখন ইহারা আসিলেন। শুভদিনে রাজধানীতে ইহাদের প্রধান চন্তাই আসিলেন, মহারাজ চতুর্দ্দশ দেবতার পূজার ভার ইহার হস্তে ন্যস্ত করিলেন। সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এ ভাবেই পূজা হইয়া আসিতেছে। আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে পূজার উদ্বোধন হয় পূজায় চতুর্দ্দশ দেবতা প্রকট হন।

(৯)

ত্রিলোচনের দিগ্বিজয়

ত্রিলোচন সেকালের প্রথা মতে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার বিজয় বাহিনীর নিকট কেহ তিষ্টাইতে পারে নাই। ঝড়ের বেগে তাঁহার সৈন্য কাইফেঙ্গ, চাকমা, খুলঙ্গ লঙ্গাই ও তনাউ তৈরঙ্গ দেশ ভাসাইয়াছিল। তাঁহার প্রভুত্ব সকলে মানিয়া লইল এবং ত্রিপুর সৈন্য মধ্যে বিদেশী সৈন্য ভুক্ত হইয়া গেল। এই দিগ্বিজয় অভিযানের ফলে স্বর্ণগ্রামের পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান শ্রীহট্ট ও পরে বর্ত্তমান ত্রিপুরা পর্য্যন্ত ত্রিলোচনের রাজ্যভুক্ত হয়। "লিকা" রাঙ্গামাটি যাহা ত্রিপুরার দক্ষিণে ছিল তাহাও ত্রিপুরার অন্তর্গত হয়।

এই সকল রাজাজয় দ্বারা ত্রিলোচনের যশ চারিদিকে



ছড়াইয়া পড়ে। ঠিক সেই সময় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হইতেছিল। তাহাতে যে কত রাজার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তাহার সঠিক নির্ণয় নাই। পূর্ব্বে সহদেবের দিগ্বিজয়ের কথা বলা হইয়াছে। সহদেব ত্রৈপুর নরপতিকে বশে আনিয়াছিলেন এ কথা মহাভারতে আছে, এই ত্রৈপুর নৃপতিই ত্রিলোচন। পাণ্ডব বীর সহদেবের সৌজন্যে, ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া হস্তিনাপুর গমন করেন। ত্রিলোচন মহাসমারোহে সসৈন্যে ভারতের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে মণিপুরের রাজাও আসেন। ইহা ত্রিপুরার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। বিধির বিচিত্র বিধানে আজ পর্য্যন্ত ভারতের রাজধানী প্রায় সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে।

যুধিষ্ঠীরের রাজ-সূয় যজ্ঞ

মহারাজ ত্রিলোচন হস্তিনাপুর পৌঁছিয়া দেখিলেন তাঁহার জন্য সুন্দর পর্ণাবাস রচিত হইয়াছে। বহু রাজার আবাসে সেস্থান শোভিত ছিল। পরম আদরে সেইখানে তিনি অভ্যর্থিত হইলেন। শুভদিনে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল। যথা সময়ে

ভীমসেন ত্রিলোচনকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের



যথা সময়ে ভীমসেন ত্রিলোচনকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ
যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন।

সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। এই শুভ সম্মিলন ত্রিপুরার ইতিহাসকে অমর করিয়া রাখিবে। ত্রিলোচনের প্রতি রাজ-সম্মানে ত্রিপুরার আসন ভারতের দিকে দিকে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে ত্রিলোচন গৌরব মুকুট পরিয়া দেশে ফিরিলেন।

কথিত আছে মহারাজ ত্রিলোচন মানুষের পূর্ণ আয়ু ১২০ বছর বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে পুণ্যকার্য্য যে তিনি কত করিয়াছিলেন তাহার বুঝি পরিমাণ নাই! দুর্গোৎসব, দোলোৎসব, চৈত্রে জলোৎসব, শ্রাবণে মনসা পূজা, মাঘে সূর্য্য-পূজা এই সব তাঁহার বার্ষিক কৃত্য ছিল। পিতৃলোকের

উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিতেন, ব্রাহ্মণে অন্নদান ও দান তাঁহার নিরন্তর ছিল। এতদ্ব্যতীত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় তিনি সদা তৎপর ছিলেন।

ত্রিলোচনের শেষ বয়সে তাঁহার পর সিংহাসনে কে বসিবে ইহা লইয়া বিচার বিতর্ক হয়। ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃক্‌পতি হেড়ম্বরাজ্যে বাস করিতেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি হেড়ম্বরাজের সিংহাসনে বসিবেন এরূপ কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। দৃক্‌পতি যে হেড়ম্বরাজ্যের ভাবী রাজা ইহা স্থির হইয়া গিয়াছিল। কিছুকাল পরে হেড়ম্বরাজের মৃত্যু হইলে দৃক্‌পতি মাতামহ-সিংহাসনে বসিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। ইহাতে মহারাজ ত্রিলোচন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দাক্ষিণকে যুবরাজ করিলেন। পিতার মৃত্যুতে দাক্ষিণই ত্রিপুরার সিংহাসন পাইবেন ইহা স্থির হইয়া রহিল দুই ভাই দুই রাজ্যে রাজা হইবেন এ ব্যবস্থা উত্তম। কালপূর্ণ হইলে ত্রিলোচনের মৃত্যু হইল। মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া তিনি শিবলোকে গমন করিলেন।

(১০)

হেড়ম্বরাজ ও ত্রিপুররাজের যুদ্ধ

ত্রিলোচনের সিংহাসনে দাক্ষিণ বসিলেন। ইহাতে প্রজাগণ যারপরনাই প্রীত হইল। পিতৃশ্রাদ্ধ শাস্ত্রবিধানে উত্তমরূপে সমাধা হইল। পিতার ধনরাশি এগার ভাই বাঁটিয়া লইলেন। দাক্ষিণ রাজা হইলে তাঁহার ছোট দশ ভাই হইলেন তাঁহার সেনাপতি। পাঁচ পাঁচ হাজার করিয়া এক এক ভাইয়ের অধীনে সৈন্য দেওয়া হইল। এইভাবে মহারাজ দাক্ষিণ তাঁহার অনুজ দশ ভ্রাতার সহিত পরমানন্দে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। সংসারের নিয়ম এমনি যে সুখের পাছে পাছে দুঃখ আসিয়া দেখা দেয়। মহারাজ দাক্ষিণের জন্য এক বিপদের সূচনা হইল।

দৃক্পতি হেড়ম্ব সিংহাসনে বসিয়া রাজদণ্ড চালনা করিতেছেন এমন সময় খবর শুনিলেন যে পিতার মৃত্যু হইয়াছে। আরও শুনিলেন যে তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই পিতার সিংহাসনে বসিয়াছেন। এ সংবাদ তাঁহার নিকট মোটেই ভাল লাগিল না—এ কেমন কথা আমি জ্যেষ্ঠ থাকিতেই কনিষ্ঠ রাজা হইয়া বসিল! ইহা ত ভারী অন্যায়! তখন তিনি এক পত্র রচনা করিয়া দূতহস্তে ত্রিপুর-রাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহাতে লেখা ছিল, "দাক্ষিণ, তুমি আমার ছোট ভাই, রীতি অনুযায়ী পিতার

সিংহাসন জ্যেষ্ঠে পায়। আমি বর্ত্তমান থাকিতে তুমি কেমন



আমি বর্ত্তমান থাকিতে তুমি কেমন করিয়া পিতৃসিংহাসনে বসিলে?

করিয়া পিতৃসিংহাসনে বসিলে? ইহা কি তোমার উচিত হইয়াছে?

হেড়ম্বরাজ্যে মাতামহ আমাকে রাজা করিয়া গিয়াছেন, তাই বলিয়া কি আমার পিতৃরাজ্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে ?"

দূত-হস্ত হইতে পত্র পড়িয়া দাক্ষিণ ত অবাক ! তাঁহার কনিষ্ঠ দশ ভাইকে ডাকাইলেন, সকলে মিলিয়া ইহার উত্তর রচনা করিলেন। লেখা হইল আপনি ঠিকই লিখিয়াছেন যে জ্যেষ্ঠপুত্রের সিংহাসনে অধিকার, সেইমতে এ রাজপাট আপনারই। কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে আপনাকে মাতামহ, হেড়ম্ব-রাজ্যের যৌবরাজ্য দেন, তখন পিতৃদেব আমাকে ত্রিপুরা রাজ্যের যুবরাজ করেন। যদি পিতা ত্রিপুরার সিংহাসন আপনাকে দিতে চাহিতেন তবে আপনাকে তখনই আনাইয়া অভিষেক করাইতেন। পিতা যখন তাহা করেন নাই তখন তাঁহার ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করি কি করিয়া ?

পত্র পাইয়া হেড়ম্ব-রাজ ক্রোধে জর্জ্জরিত হইলেন। কি এমন কথা ! সিংহাসন অমনি দিবে না, আচ্ছা দিবার ব্যবস্থা আমি করিব। হেড়ম্বরাজ স্থির করিলেন, যে অধিকার লেখনীর দ্বারা মিলিল না তাহা তরবারি সাহায্যে অবশ্যই মিলিবে। এই ভাবিয়া বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে হেড়ম্ব-সৈন্যের ঘনঘটায় ত্রিপুরা রাজ্যে বিষম ঝড়ের সূচনা হইল। সাতদিন অবিরত অস্ত্র বর্ষণ হইল, বিপক্ষ সৈন্যের তুর্ব্বার স্রোত রোধ করিতে না পারিয়া দাক্ষিণ রণে ভঙ্গ দিলেন। দক্‌পতির জয় হইল, লেখনীর দ্বারা যাহা পান নাই,

অসির সাহায্যে তাহা অধিকার করিলেন। পিতৃরাজ্য দৃক্‌পতির করতলগত হইল।

(১১)

বরবক্রে ত্রিপুররাজধানী স্থানান্তর

দাক্ষিণ অনুজ দশ ভাই সহ রাজপাট লইয়া স্থানান্তরে সরিয়া গেলেন। এইখানেই ত্রিপুররাজগণের প্রথম কিরাত রাজ্য শেষ হইল। মহারাজ দ্রুহ্যু হইতে একাদিক্রমে একই-স্থানে এতকাল রাজপাট ছিল, এইবার কিরাত দেশের অপরাংশে সরিয়া আসিলেন। দ্রুহ্যুর কিরাতজয় প্রসঙ্গে পাইয়াছি দ্রুহ্যু কপিল বা ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে ত্রিবেগ স্থলে তাঁহার রাজপাট স্থাপন করেন। এতদিন পরে হেড়ম্ব-রাজের সৈন্য দাক্ষিণকে কপিল তীর হইতে বরবক্রতীরে বিতাড়িত করিল। বরবক্র (বরাক) নদীই ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়া মেঘনা নাম ধারণ করিয়াছে। ত্রিপুররাজবংশ, দাক্ষিণ হইতেই কপিল বা ব্রহ্মপুত্র নদীরতীর পরিত্যাগ করিয়া মেঘনা বা বরবক্র প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। হেড়ম্বরাজ কপিল তীর অধিকার করিয়া রহিলেন আর দাক্ষিণ বরবক্রের উজানে খলংমাতে রাজ্য করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণ হেড়ম্ব রাজ্যের সীমায় কুকি স্থানের অনেকটা হেড়ম্ব রাজকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

খলংমা নদীর তীরে দাক্ষিণ রাজত্ব করিতে লাগিলেন, এস্থানে আসিয়া তাঁহারা পূর্ব্ব-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। এতকাল বসবাসে সে স্থান উন্নত হইয়াছিল, আচার নিষ্ঠা মার্জ্জিত হইয়াছিল। সেই স্থান হেড়ম্বরাজ লইয়া গেলেন। সুতরাং নূতন দেশে অসংস্কৃত আচারের মধ্যে পুনরায় আসিয়া পড়িলেন, ইহা যেন বনবাসের মত ঠেকিতে লাগিল। এখানে আসিয়া পাত্র মিত্র লইয়া দাক্ষিণ রাজহাট বসাইলেন সত্য কিন্তু তাঁহার মন মিশিল না। তাঁহার কুলে মদ্যাদি অনাচার ঢুকিতে লাগিল এবং পানাসক্ত হইয়া ইহারা আত্মকলহে রত হইল। পরস্পর বিবাদ, ক্রমে ভুমুল রণে পরিণত হইল, মহারাজ দাক্ষিণ সে কলহ থামাইতে বৃথাই চেষ্টা পাইলেন। ফলে পঞ্চাশ হাজার ত্রিপুরবীর সেই গৃহবিবাদে প্রাণ হারাইল। মহারাজ দাক্ষিণ ভাবিলেন -এ কেমন স্থানে আসিলাম, আমার স্বজন যেন যদুবংশের ন্যায় ধ্বংস হইয়া গেল! হায়, হায়, একি হইল! এইসব দুশ্চিন্তায় খলংমা দেশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু তাঁহার আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছিল। প্রায় সমস্ত জীবন ঝড়ঝঞ্ঝায় কাটাইয়া দাক্ষিণ মরিয়া শান্তি পাইলেন।

দাক্ষিণের পর তাঁহার ৫২ম পুরুষ পর্য্যন্ত খলংমাতেই রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার কথা পাওয়া যায় না। ইহা যেন য়ুরুপীয় ইতিহাসের Dark Age অন্ধকারযুগের ন্যায়। তাঁহার ত্রিপঞ্চাশত্তম পুরুষ বিমারের পুত্র কুমার পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি

শিব ভক্ত ছিলেন। মনু নদীর তীরে শ্যাম্বল নগরে যাইয়া তিনি শিবলিঙ্গ দর্শন করেন। শিবারাধনায় তন্ময় হইয়া তিনি খলংমা নদীর তীর হইতে রাজধানী উঠাইয়া মনু নদীর তীরে শ্যাম্বল নগরে স্থাপন করেন। শ্যাম্বল হয়ত শিবের শম্ভু-নামেরই অপভ্রংশ! কুমারের পর তিন জন রাজার সময়ে ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়, চতুর্থ রাজা মৈছিলির সম্বন্ধে একটি শিব উপাখ্যান আছে। মৈছিলিরাজ বড়ই ক্রোধী ছিলেন। পুত্র-লাভের জন্য তিনি মহাদেব ধ্যান করেন; চতুর্দ্দশ দেবতাগৃহে চন্তাই সহিত তিনি ছিলেন। ধ্যানে তুষ্ট হইয়া শিব দর্শন দিলেন কিন্তু রাজাকে কহিলেন তোর পুত্র হইবে না, তুই অপুত্রক থাকিবি। রাজা এত ক্রোধী ছিলেন যে মহাদেবের এই বাক্যে তাহার রাগের সীমা রহিল না, তিনি মহাদেবকে ভয় করা দূরে থাকুক, আরাধ্য দেবতাকে বধ করিতেই উদ্যত হইলেন। দেবদেব মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িলেন। তীর মহাদেবের পায়ে লাগিল। মহাদেব তাঁহাকে শাপ দিলেন তুই অন্ধ হইয়া যা। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মৈছিলিরাজ অন্ধ হইয়া গেলেন। হায়, হায়, একি হইল! রাজা করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। চন্তাই শিবের নিকট ধন্না দিয়া পড়িলেন হে আশুতোষ, সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর। রাজার চক্ষু ভাল করিয়া দাও। শিবের আদেশ হইল, যদি নররক্ত দেওয়া যায় তবে ইহার চক্ষু ভাল হইবে এবং এসময় ব্যাপিয়া ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিতে হইবে। এইরূপ

অনুষ্ঠানে রাজা দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত ঘটামাত্র রাজার মৃত্যু হইল। রাজার ব্যবহারে শিব তাক্ত হইয়া চন্তাইকে আদেশ করিয়াছিলেন কলিযুগে লোকের পাপমতি হেতু আর তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিবেনা, পূজার সময়ে শুধু তাঁহার পায়ের চিহ্ন দেখা যাইবে। সেই মতে শিব অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন। মৈছিলিরাজের পর প্রতীত পর্য্যন্ত সাত জন নৃপতি হন, ইহাদের সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাওয়া যায় না।

(১২)

মহারাজ প্রতীত ও হেড়ম্বরাজ

মহারাজ প্রতীত ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করিলে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। হেড়ম্বরাজের সহিত ত্রিপুররাজের প্রণয় ও যুদ্ধের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। হেড়ম্বরাজের সহিত বিবাহ বন্ধন দ্বারা যেমন দুই রাজ্যের প্রণয় হয়, আবার সেই সূত্রেই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হয়। যুদ্ধের ফলে ত্রিপুররাজধানীর স্থানপরিবর্ত্তন ও নানা দুর্ভোগ ঘটিয়াছে। প্রতীত যখন রাজপদে অধিষ্ঠিত তখন হেড়ম্বরাজ প্রাচীনকালের ইতিহাস স্মরণ করিয়া ভাবিলেন আমরা পাশাপাশি রাজা, বৃথা কেন শত্রুতা করি! ত্রিপুররাজ ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশধর আমি, আর প্রতীত হইতেছে কনিষ্ঠপুত্রের বংশধর : কাযেই প্রতীত ও আমি দুই ভাই। আমি বড় প্রতীত ছোট, আমাদের উভয়ের বিবাদ ঘুচিয়া যাক্। রক্তের সম্বন্ধে আমরা পুনঃ ভাই ভাই কেন হইয়া না যাই! এইরূপ আলোচনা করিয়া হেড়ম্বরাজ প্রতীতের নিকট দূত পাঠাইলেন। দীর্ঘকাল বিবাদের পর দূতমুখে সংবাদ পাইয়া প্রতীত বিস্মিত হইলেন। যে হেড়ম্বরাজের সহিত বংশপরম্পরা যুদ্ধ হইতেছে, তাঁহার

সহিত বিবাদ মিটিয়া যাইবে ইহা ত সুসংবাদ কিন্তু ইহা কি সম্ভব? অবশেষে উভয় রাজার সাক্ষাতের দিন স্থির হইল।

শুভদিনে মহারাজ প্রতীতের সহিত হেড়ম্বরাজের সাক্ষাৎ হইল একে অন্যকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। হেড়ম্বরাজ কহিলেন, ভাই প্রতীত, পূর্ব্বপুরুষের বিবাদ ভুলিয়া যাও, আজ হইতে আমরা ভাই ভাই! যেমন কথা তেমনি কায। উভয়ে একাসনে বসিলেন, একত্রে ভোজন করিলেন, হেড়ম্বরাজকে প্রতীত "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। দুই রাজাতে এমনি গলাগলি হইল যে প্রজারা দেখিয়া অবাক্! যুদ্ধের আশঙ্কা দূর হইয়া গেল, প্রজাদের আনন্দ আর ধরেনা। উভয় রাজাতে মিলিয়া উভয় রাজ্যের সীমানা চিহ্নিত করিলেন, প্রেমের ডোর ধরিয়া যেমন সীমা নির্দ্দেশ হইল, প্রেমের ডোরে তেমনি দুই রাজার হাত বাঁধা পড়িল। উভয়ে সমস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি কাকের কাল রঙ সাদাও হইয়া যায় তথাপি আমাদের প্রণয়ের পরিবর্ত্তন হইবে না, আমরা দুইজনে মৃত্যু পর্যান্ত একে অন্যকে ভাল বাসিতে থাকিব। যদি আমরা একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস হারাই তবে যেন আমরা নির্ব্বংশ হই। এইরূপ প্রীতি প্রেমে কিছুদিন কাটিল।

এদিকে হেড়ম্বরাজ্যের প্রতিবেশী কামাখ্যা জয়ন্তী প্রভৃতির রাজগণ গোপনে একত্রিত হইল। ত্রিপুরা ও হেড়ম্বের প্রণয়ে ইহাদের বড়ই দুশ্চিন্তা হইল। এখন উপায়? যদি ইহারা

দুই রাজাতে এক সঙ্গে মিলিয়া আমাদের প্রতি দৃষ্টি দেয় তবে ত আমাদের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। যতকাল ইহারা পরস্পর লড়িয়াছে ততকাল আমরা পরম সুখে কাল কাটাইয়াছি। আমাদের সে সুখের দিন বুঝি ফুরাইল। এখন আমাদের বাঁচিতে হইলে ইহাদের মধ্যে বিবাদ বাঁধাইতে হইবে। এইরূপ আলোচনাক্রমে সকলে স্থির করিল এক পরমা সুন্দরী রমণী পাঠাইয়া ইহার দ্বারা দুই রাজার মধ্যে বিবাদবাঁধানই উত্তম উপায়। কারণ নারীর প্রতি লোভ করিয়া সোণার লঙ্কা ছারখার হইয়াছে, রাবণ সবংশে ধ্বংস হইয়াছে।

এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ ত্রিপুরা ও হেড়ম্বরাজ্যে পৌঁছে নাই। একদিন হেড়ম্বরাজ ও প্রতীত একত্র বসিয়াছেন এমন সময় এক পরমা সুন্দরী নারী উভয় রাজার দৃষ্টির সম্মুখে স্বর্ণমৃগের ন্যায় ক্ষণিক দাঁড়াইয়া সহসা অদৃশ্য হইল। বিজলী চমকের ন্যায় এই নারীর রূপ উভয়কে মুগ্ধ করিল। প্রতীত নীরবে রহিলেন, হেড়ম্বরাজের মহাকৌতূহল হইল এ কে, কেনই বা এই নিভৃতস্থানে আসিয়াছে। রাজদূত পাঠাইয়া খবর লইলেন, দূত আসিয়া বলিল---এই নারী মহারাজের সাক্ষাৎ কামনা করিয়া আসিয়াছে। হেড়ম্বরাজ উঠিয়া গেলেন, একটু আড়ালে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন---তুমি কে, এখানে কেনই বা আসিয়াছ? সুন্দরী হেড়ম্বরাজকে আড়চোখে চাহিয়া ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তির সঙ্গে বলিল---তুমি হেড়ম্বরাজ,

তোমাকে ত আমি চাইনা, তুমি প্রৌঢ় হইতে চলিয়াছ,



এখনও কি তোমার রমণীতে সাধ আছে? ছিঃ, আমি কন্দর্পতুল্য প্রতীতকে কামনা করি।

এই কথাগুলি যেন তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় হেড়ম্ব-রাজের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। কি! এত বড় রাজ্যের রাজা, তাহাকে এই অপমান! হেড়ম্ব-রাজ ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন, পরিচারকগণকে তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন এর সৌন্দর্য্যে বড় অহঙ্কার হইয়াছে, শূর্পণখার ন্যায় ইহার নাক কান কাটিয়া দে। পরিচারকগণ ধারাল অস্ত্র লইয়া ইহার দিকে ছুটিতেই, নারী ভয় পাইয়া যেখানে প্রতীত ছিলেন সেদিকে এই বলিয়া ধাবিত হইল—হেড়ম্বরাজ বিনা দোষে আমাকে

স্বর্ণমৃগের ন্যায় ক্ষণিক দাঁড়াইয়া অদৃশ্য হইল

মারিতে চাহিতেছে, ত্রিপুররাজ অবলাকে রক্ষা কর। কথাগুলি ত্রিপুররাজের কর্ণগোচর হইল।

বিষয়টি লিখিতে এবং পড়িতে যত সময় লাগিল তাহার তিলার্দ্ধ সময়ের মধ্যে একটা ঘূর্ণিবায়ুর মত এই ঘটনাগুলি ঘটিয়া গেল। মহারাজ প্রতীত বাহিরে আসিয়া দেখিলেন এক প্রলয় কাণ্ড, রমণী বধের পূর্ণ আয়োজন! তখন তাঁহার লোকজন দিয়া রমণীকে ঘেরাও করিয়া তাহাদের সহিত প্রতীত সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। এই সুন্দরীকে লইয়া মহারাজ প্রতীতের সেনা বহুদূর অগ্রসর হইলে, হেড়ম্বরাজ প্রতীতের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া রণডঙ্কা বাজাইয়া দিলেন, আবার যুদ্ধের ডামাডোল বাজিয়া উঠিল। সুন্দরীর জন্য দুই রাজা যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়িল। অদৃষ্ট দেবতা অদৃশ্যে হাসিলেন, কোথায় রহিল উভয় রাজার ভ্রাতৃপ্রতিজ্ঞা! কাক কাল বর্ণই রহিল, সাদা হইল না, তথাপি উভয় পক্ষের সৈন্য কাকের ন্যায় দুই পক্ষে সারি দিয়া দাঁড়াইল।

এই সংবাদে ষড়যন্ত্রকারী কামাখ্যা জয়ন্তী প্রভৃতি রাজার আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা পরমানন্দে আত্মকলহের সংবাদ উপভোগ করিতে লাগিল।

। ১৩ ।

দ্রুহ্যবংশীয়ের স্থানান্তরগমনের সময় নির্দ্ধারণ

এইখানে ত্রিপুরা রাজ্যের সংস্থান ও সন তারিখ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইবে।

দ্রুহ্যর ত্রিবেগে কপিল নদীরতীরে রাজ্যসংস্থানের কথা বলা হইয়াছে। সেখানকার রাজত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ সুপ্রসিদ্ধ ভবিষ্যপুরাণে পাওয়া যায়।

ঋষিগণ দ্বাপরে যে সমস্ত নৃপতি ভারতবর্ষে বর্ত্তমান তাঁহাদের বিষয় জানিতে চাহিলে সূত বর্ণনা করিলেন সেই সময়ে অষ্টাদশ রাজ্যের নাম আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। পশ্চিমে সিন্ধুনদের তীরে, দক্ষিণে সেতুবন্ধে, উত্তরে বদরী স্থানে, পূর্ব্বে কপিল তীরে অষ্টাদশ রাজ্য ছিল। এই সমস্ত রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থ, পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র, কাপিল ইত্যাদি

অষ্টাদশৈব রাষ্ট্রানি তেষাং মধ্যে বভূবিরে
ইন্দ্রপ্রস্থঞ্চ পাঞ্চালং কুরুক্ষেত্রঞ্চ কাপিলম্॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বাপর শেষ ও কলিযুগ আরম্ভ হয়। সুতরাং ত্রিলোচন যখন রাজসূয়যজ্ঞে উপস্থিত হন তখন দ্বাপরযুগ, সেই দ্বাপরযুগে কপিল নদীর তীরে যে দ্রুহ্যবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন ইহার সমর্থন ভবিষ্য-পুরাণ হইতে পাওয়া যাইতেছে।

ভবিষ্যপুরাণে ভোজরাজের মৃত্যুকালে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখ আছে। ভোজরাজের কাল আধুনিক ৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৯০ খৃষ্টাব্দ। ইহার পরবর্ত্তীকালে অনঙ্গপাল জয়চন্দ্রের আবির্ভাব হয়, তাহাদের উল্লেখ ও ভবিষ্যপুরাণে পাওয়া যায়। কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের সময়েই ভারতে মুসলমানঅধিকার ঘটে। সেই সময়েও যে দ্রুহ্যবংশীয়রা রাজত্ব করিতেছিলেন ইহার উল্লেখ ভবিষ্যপুরাণে রহিয়াছে এবং দ্বাপরযুগবং গোব্রাহ্মণহিতৈষী ছিলেন ইহাও বুঝিতে পারা যায়

স্বর্গতে ভোজরাজেতু..................

.........কান্যকুব্জে জয়চন্দ্রোমহীপতিঃ।

ইন্দ্রপ্রস্থেঽনঙ্গপাল স্তোমরান্বয়সম্ভবঃ॥

পূর্ব্বে তু কপিলস্থানে.........

অগ্নিহোত্রস্য কর্ত্তারঃ গোব্রাহ্মণহিতৈষিণঃ

বভূবুর্দ্বাপরসমা ধর্ম্মকৃত্যবিশারদাঃ।

দ্বাপরের কপিলরাজ্যের অস্তিত্ব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতেও পাওয়া যাইতেছে। 'কপিলস্থানে' প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায় পূর্ব্বের ন্যায় 'কপিলান্তিকে' বা ঠিক কপিলনদীর তীরে না থাকিলেও বহুস্থানবিপর্য্যয়েও কপিলস্মৃতি তাহাদের সহিত জড়িত রহিয়াছে। এইরূপে আমরা মহারাজ পরীক্ষিতের সময় হইতে কান্যকুব্জের জয়চন্দ্রপর্য্যন্ত দ্রুহ্যবংশীয়রাজ্যের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা পাইতেছি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দ্রুহ্যবংশীয়দের রাজপাট কপিল নদীর তীরে কিরাত দেশে স্থাপিত হয়। বামন পুরাণে ভারতের পূর্ব্বসীমায় কিরাতদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ—

"পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনা স্মৃতাঃ।" কিন্তু ভবিষ্যপুরাণে ভারতের পূর্ব্বসীমায় 'কপিলরাজ্যের'ই উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে কিরাত স্থানেই যে কপিল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

কালনির্ণয়প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মত ও কল্যাব্দের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। মৎস্যপুরাণের মতে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ এক সহস্র পঞ্চাশ বৎসর। নন্দ অনুমান ৩৭১ খৃঃ পূর্ব্বে রাজ্য লাভ করেন (V. A. Smith—Early History of India, 3rd Edition)। এই ৩৭১ বৎসর ১০৫০ বৎসরের সহিত যোগ করিলে ১৪২১ বৎসর হয়। ইহা হইতে পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর বাদ দিলে কলির আরম্ভ ১৪০২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ধরিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে মৎস্যপুরাণোক্ত শ্লোকটি কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেকের সময় ১০৫০ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১০১৫ বৎসর হইবে। "বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং"। তাহাতে কলির-আরম্ভসময় আরও ৩৫ বৎসর কম হইয়া পড়ে অর্থাৎ ১৪০২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ স্থলে ১৩৬৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হয়। ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের

সমসাময়িক, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। ত্রিলোচন দৈত্য হইতে তৃতীয় পুরুষ। ত্রিলোচনের সময় যদি ভাগবতোক্ত সময় মতে ১৩৬৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দই হয় তবে ইহার সহিত তিন পুরুষে ১০০ শত বৎসর ধরিয়া, উহা যোগ করিলে ত্রিবেগে উপনিবেশের সময় ১৪৬৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দেই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

নিম্নে দ্রুহ্যবংশীয়দের রাজত্বের একটি আনুমানিক তালিকা দেওয়া গেল, ইহা দ্বারা সময়ের একটি ক্ষীণ আভাষ জাগিবার সুবিধা হইবে।

	স্থান	সময়	পুরুষ সংখ্যা	মন্তব্য
১।	ত্রিবেগে রাজত্ব	১৪৬৭ খৃঃ পূঃ ১৩০০ খৃঃ পূঃ	৪ পুরুষ	দাক্ষিণেরও কিছু সময়
২।	খলংমাতে রাজত্ব	১৩০০ খৃঃ পূঃ ১৫০ খৃঃ পূঃ	৫২ পুরুষ	নিমার পর্য্যন্ত (৪ পুরুষে শতাব্দী ধরিয়া কয়েকটি দীর্ঘরাজত্বের জন্য ১৫০ বৎসর অতিরিক্ত)
৩।	শ্যাম্বলে রাজত্ব	১৫০ খৃঃ পূঃ- ৫৯০ খৃষ্টাব্দ	১৩ পুরুষ	প্রতীত পর্য্যন্ত
৪।	ত্রিপুরায় রাজত্ব	৫৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত		

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

মঘরাজ ও রাঙ্গামাটি জয়

হেড়ম্বরাজের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে প্রতীত শ্যাম্বলে রাজপাট ত্যাগ করিলেন, তিনি আরও দক্ষিণে সরিয়া আসেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তখন মহারাজ প্রতীত প্রবঙ্গ বা ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হন।* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই সময়েই ত্রিপুরাব্দের প্রচলন হয়, মহারাজ প্রতীতের সময় হইতেই ত্রিপুররাজ কপিল প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিপুরায় আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ১৩৫০ বৎসর অতীত হইয়াছে। মহারাজ প্রতীতের অধস্তন নবম পুরুষ কিরীট বা আদিধর্ম্ম ফা যজ্ঞোপলক্ষে মিথিলা দেশীয় ব্রাহ্মণগণকে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করেন, ইহা ৫১ ত্রিপুরাব্দে অনুষ্ঠিত হয় সুতরাং ইহা ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরাব্দের সাক্ষ্য দিতেছে।

প্রতীতের পর তৎপুত্র মরীচি রাজা হন, মরীচির পর তৎপুত্র গগন, গগনের পর তৎপুত্র নবরায় রাজপদে অভিষিক্ত

* প্রবঙ্গ—। মার্ক ৫৭।৪৩, বামন ১৩।৪৪, মৎস্য ১১৩।৪৪। ত্রিপুরার কিয়দংশ—বিশ্বকোষ।

হন। নবরায়ের পর তৎপুত্র হামতরফা বা যুঝার রাজা হন। সুতরাং হামতরফা প্রতীতের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ।

এতকালের মধ্যে মহারাজ দ্রুহ্যুর বংশে এইরূপ অ-সংস্কৃত নাম পাওয়া যায় নাই। ইহার কারণ কি? প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, ত্রিপুর রাজবংশের আর্য্য ভাগ শেষ হইয়া বুঝি অনার্য্য ভাগ সুরু হইল। কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করিলে এইরূপ আশঙ্কা দূর হইবে।

যুঝার প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি রাঙ্গামাটি জয়। তিনি ত্রিপুর সৈন্যকে উচ্চশ্রেণীর সামরিক শিক্ষা দিয়া দেশ জয়ে প্রবৃত্ত হন। রাঙ্গামাটি তখন প্রবল পরাক্রান্ত মঘদের দ্বারা অধিকৃত। প্রাচীন ভূগোল আলোচনায় বুঝা যায় রাঙ্গামাটি বলিতে তখন ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের পশ্চিমাংশ বুঝাইত, এই অংশে এখনও মঘ বসতি আছে এবং চট্টগ্রামে এখনও রাঙ্গামাটি প্রসিদ্ধ স্থান। মহারাজ যুঝার কালে রাঙ্গামাটির আয়তন ত্রিপুরা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই মঘ-রাজত্বে মঘদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

মঘরাজ যখন শুনিলেন ত্রিপুরেশ্বর অভিযান প্রেরণ করিবেন তখন তিনি কৌশল করিয়া এক তুষেরতুর্গ নির্ম্মাণ করেন, উদ্দেশ্য যতুগৃহ দাহ করা কিনা সঠিক বুঝা যায় না। বাহিরে এরূপ প্রচার করা হয় তুষ মাড়ান সিপাহী সৈন্যের পক্ষে অমঙ্গলজনক। কিন্তু ত্রিপুর সৈন্যকে তুষ আটক রাখিতে

পারিল না। ত্রিপুর সৈন্যের হুঙ্কারে তুষের ন্যায় মঘ সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, মঘরাজ যুদ্ধে হারিয়া গেলেন।

তখন কিরাত জয় করিয়া যেমন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ত্রিবেণীতে রাজপাট স্থাপন করেন তেমনি যুঝা মঘদেশ জয় করিয়া রাঙ্গামাটিতে স্বীয় রাজপাঠ প্রতিষ্ঠিত করেন, এই সময় হইতেই উদয়পুর অঞ্চলে রাজধানী স্থাপিত হয়, পরে উদয় মাণিক্য ইহার নামকরণ করেন।

রাঙ্গামাটিতে ত্রিপুররাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া কালক্রমে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মঘদের সহিত রাজা প্রজা সম্বন্ধ হওয়ায় ত্রিপুরনৃপতি মঘদিগকে কৌশলে প্রীত রাখিবার জন্য নিজ নামের সহিত ফা উপাধি জুড়িয়া দিলেন এবং নিজ নামেরও মঘ সংস্করণ প্রচার করিলেন। সেই হইতে ত্রিপুর ইতিহাসে দ্রুহ্যু বংশীয়ের অসংস্কৃত নামের ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। ফা অর্থে পিতা।* বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথ তীর্থের সহিত ত্রিপুররাজগণের বংশপরম্পরা সম্বন্ধ দ্বারা

* ফা শব্দ অনার্য্য ভাষা সম্ভূত বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন—শ্যানদেশীয় ও ব্রহ্মদেশীয় নরপতিগণ "ফ্রা" উপাধি ধারণ করিতেন। ফ্রা হইতে ফার উদ্ভব। ফ্রা প্রভুবাচক, ফা অর্থে পিতা। আসামের অজহাম নৃপতিগণও ফা উপাধি ধারণ করিতেন। কিন্তু ত্রৈপুর রাজবংশীয়-গণ তৎপূর্ব্ব হইতেই এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

—শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।

চট্টগ্রাম অবধি রাজত্বের প্রসার সহজেই অনুমান করা যায়। রাঙ্গামাটি জয় দ্বারা বিজেতা ত্রিপুররাজ এই ভূভাগের ফা বা পিতা রূপে পরিণত হইলেন। যুঝা নামটি যোদ্ধার অপভ্রংশ।

যুঝার উনবিংশ পুরুষ পরে সিংহতুঙ্গ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন, এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুর রাজত্বে উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা পাওয়া যায় না। এ সময়ের মধ্যে ভারতের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, হিন্দুর হাত হইতে শাসন দণ্ড কাড়িয়া লইয়া মুসলমান শক্তি ভারতে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ত্রিপুরনৃপতিগণের স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল!

। ২ ।

ত্রিপুররাজ ও গৌড়ের নবাব

সিংহতুঙ্গ যখন ত্রিপুর সিংহাসনে উপবিষ্ট তখন মুসলমান আমল আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর ভারতে মুসলমান শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হিন্দুর স্বাধীনতা-সূর্য্য প্রায় ডুবু ডুবু। বাঙ্গালার রাজা লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ে বাঙ্গালা দেশ মুসলমানের হাতে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গৌড়ে নবাবী আমল সুরু হইল। সেই সময় হীরাবন্ত খাঁ নামে জনৈক

ধনবান্ জমিদার ত্রিপুরেশ্বরের অধিকার সান্নিধ্যে বাস করিতেন। হীরাবন্ত গৌড়ের নবাব হইতে মেহেরকুলের * সনদ পাইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতেন এবং নবাবকে সেজন্য করের পরিবর্ত্তে এক নৌকা বহু মূল্য দ্রব্য উপহার দিতেন। ত্রিপুররাজ এই কথা জানিতে পারিলেন এবং যখন বুঝিতে পারিলেন এই সব মূল্যবান্ ধনরত্ন ত্রিপুরা রাজ্য হইতেই সংগ্রহ করিয়া নবাবকে নজর পাঠান হইতেছে, তখন তাঁহার বড়ই ক্রোধ হইল। হীরাবন্ত ত্রিপুরেশ্বরকে অবজ্ঞা দ্বারা এই ক্রোধ আরও বাড়াইলেন। তখন একদিন সহসা ত্রিপুর সৈন্য মেহেরকুল আক্রমণ করিয়া ইহার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইল। হীরাবন্ত এইরূপে পরাস্ত হইয়া গৌড়ের নবাবের নিকট ধন্না দিয়া পড়িলেন। হীরাবন্ত নৌকা বোঝাই রত্ন দিয়া নবাবকে খুসী করিয়াছিলেন, এখন সে রত্ন ত্রিপুর-রাজ নিজভাণ্ডারে লইয়া আসিলেন। হীরাবন্ত বুঝাইলেন নবাবের রাজস্বের উপর ত্রিপুরেশ্বরের লোভ হেতু ত্রিপুরা রাজ্য শীঘ্রই আক্রমণ করা উচিত।

নবাব সম্মত হইলেন। ত্রিপুররাজের সহিত প্রবল প্রতাপ গৌড়ের নবাবের যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। যখন নবাবের প্রায় ২।৩ লক্ষ্য সৈন্য আসিয়া ত্রিপুর সীমান্তে হানা দিল তখন ত্রিপুররাজ ভয় পাইলেন। তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া সন্ধির পরামর্শ

---

* মেহেরকুল পরবর্ত্তী কালে একটী পরগণায় পরিগণিত হয়, কমলাঙ্ক বা কুমিল্লা ইহারই অন্তর্গত।

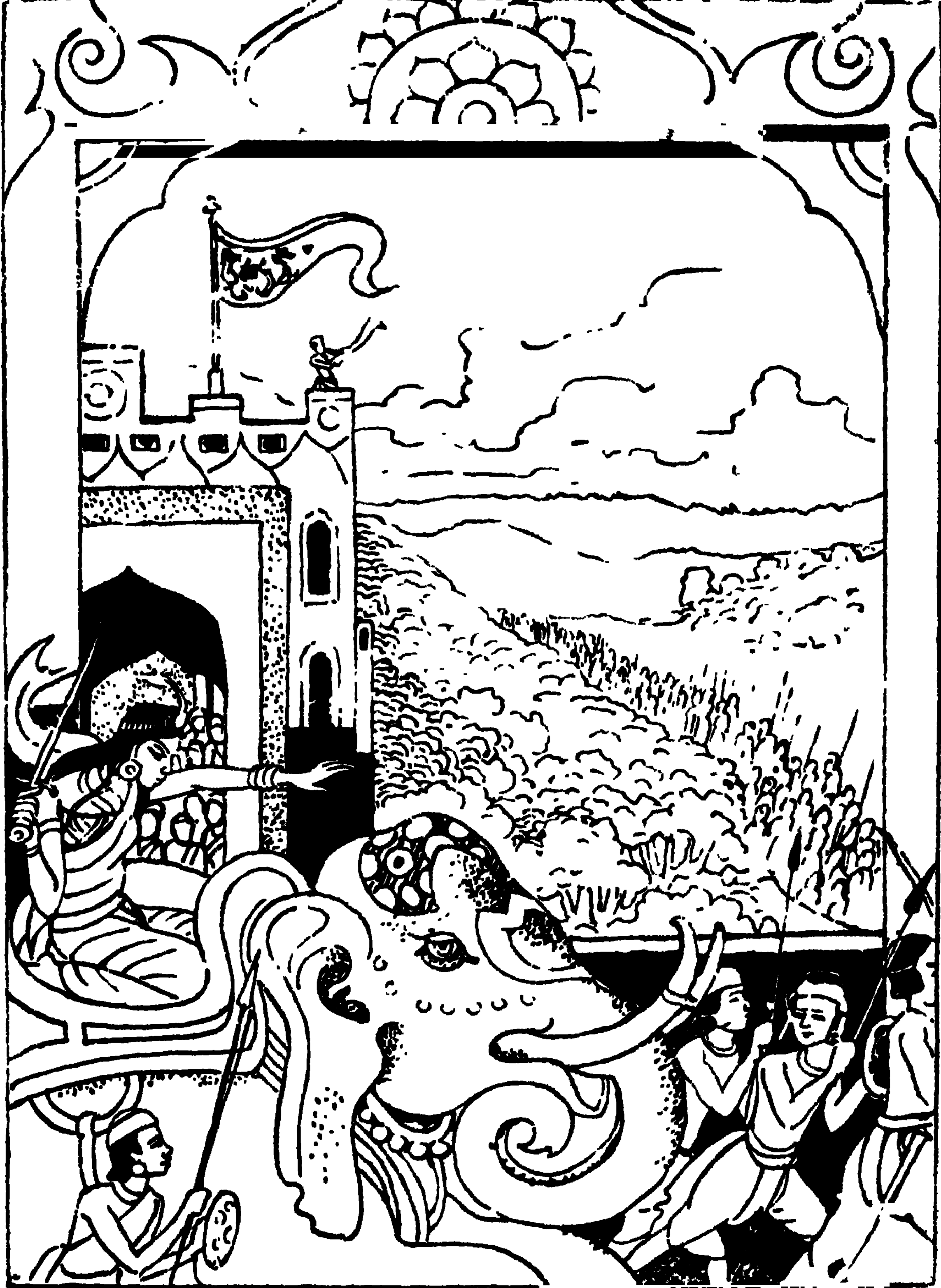
করিতে লাগিলেন। রাজার এই ভীরুতার কথা রাজরাণীর কাণে গেল। মহাদেবী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—"হে নরনাথ, তুমি একি কথা কহিতেছ? পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি লোপ করিতে চাও? ছি! ছি! যদি নবাবের সৈন্য দেখিয়া ভয় পাইয়া থাক তবে অন্তঃপুরে আরামে বাস কর, আমি রণে ঝাপাইয়া পড়ি।" এই বলিয়া রাণী দামামা বাজাইলেন, সৈন্যেরা সব সারি দিয়া দাঁড়াইল। "কি বল ত্রিপুর সৈন্যগণ, তোমরা কি যুদ্ধ চাও, না চাও না? তোমাদের রাজা সিংহের কুলে শৃগাল হইয়া জন্মিয়াছে। ভয়ে ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিতে চায়। রাজা ভয়ে ভীত হউক আমি ভয় করি না। কুলের মান রাখিতে আমি যুদ্ধে যাইব। তোমাদের প্রাণে যদি তিল মাত্র বল থাকে তবে আমার সঙ্গে চল।" রাণীর বচনে সৈন্যদের হৃদয়ে বল বাড়িল। সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমরা ভয় করি না মা,—আমরা ভয় করিনা, তুমি মা হইয়া যদি যুদ্ধে চল আমরা সন্তান হইয়া তোমার পেছনে যাইব।"

(রাণীর আনন্দের সীমা রহিল না। রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে তিনি ভয়ভৈরবী মূর্ত্তি ধরিলেন। যুদ্ধে* যাইবার পূর্ব্বদিন তিনি

---

* The women......in daring and moral prowess remind one of the females in Rajputana or of the Mahratta Country. —Rev. Long—Asiatic Society Journal.

উক্ত রাণীর তরবারি আজও আগরতলায় দেবালয়ে পূজিত হইতেছে দেশীয় রাজ্য—কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর।



রাণী রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে হস্তিপৃষ্ঠে অগণন সৈন্য সহ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

অন্নপূর্ণা হইয়া সকল সৈন্যকে তৃপ্তিমত ভোজন করাইলেন। পরদিন দেশের স্বাধীনতার জন্য হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া অগণন সৈন্যসহ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তালে তালে রণ দামামা বাজিতে লাগিল, ত্রিপুরা রাজ্যের সে এক দিন! ত্রিপুরেশ্বর এই সব দেখিয়া কি ভাবে বসিয়া থাকেন, তিনিও সৈন্যের সহিত যোগ দিলেন।

অতঃপর দুই সৈন্যের ভেট হইল, মহাযুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। ত্রিপুর কুললক্ষ্মী যুদ্ধে অবতীর্ণা হইয়াছেন, কুলদেবতা চৌদ্দ-দেবতার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ হইল। গৌড়ের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় ত্রিপুররাজ আকাশে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়, ধূসর আকাশে এক নর-মুণ্ড নাচিতেছে। মহারাজ দেখিলেন, সৈন্যেরাও দেখিল—দেখিয়া সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। মহারাজ অমঙ্গল আশঙ্কায় রামকৃষ্ণ নারায়ণ স্মরণ করিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে লক্ষ্য সৈন্য হত হইলে আকাশে নরমুণ্ড ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করে। তখন মহারাজ বুঝিলেন এই যুদ্ধে লক্ষ লোক হত হইয়াছে। রণশ্রান্ত হইয়া তিনি বসিতে চাহিলে তাঁহার জামাতা আসন না পাইয়া মৃত হস্তীর দাঁত তুলিয়া আনিয়া বসিতে দিলেন। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গেল, গৌড়ের সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া যে যার পথ দেখিল। ত্রিপুরেশ্বরের বিজয় কেতন উড়িল। রাণী জয়মাল্য পরিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্বদেশে ফিরিলেন। হীরাবন্তের অধিকৃত মেহেরকুল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত হইল, অদ্যাবধি এই স্থান ত্রিপুরার রাজ্যভুক্ত রহিয়াছে। ভারত

ইতিহাসে এই রাণীর আসন গড়মণ্ডলের রাণী দুর্গাবতী, ঝানসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ এবং চাঁদ সুলতানার সমান।

৩

হরি রায়ের পুত্রগণের বুদ্ধি পরীক্ষা

হরিরায় ওরফে ডাঙ্গর ফা সিংহতুঙ্গের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। ডাঙ্গর শব্দে ডাগর অর্থাৎ বড় বুঝায়। এই রাজার আঠারটি কুমার ছিল। রাজার মহা চিন্তা হইল, তাই ত কুমারেরা সংখ্যায় বেশী, এখন রাজা করি কাকে? যে সব চাইতে বুদ্ধিমান তাকেই রাজপদ দিব। কি উপায়ে ইহাদের বুদ্ধির পরখ হয়? অবশেষে রাজা এক উপায় ঠিক করিলেন। নিজে একাদশীর উপবাস করিলেন, পুত্রগণকেও সেই দিন উপবাসী রাখিলেন। এদিকে রাজার এক কুকুর-রক্ষক ছিল। রাজা গোপনে তাহাকে ডাকাইয়া হুকুম দিলেন—"ত্রিশটি কুকুরকে না খাওয়াইয়া আজিকার দিন বাঁধিয়া রাখ। কাল পারণা দিন, আমি যখন কুমারগণকে লইয়া ভোজনে বসিব, তখন তুমি কুকুরগুলিকে লইয়া পাকশালের বাহিরে থাকিবে। আমার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিবে, যেই মাত্র আমি চোখে ইশারা করিব অমনি কুকুরগুলিকে ছাড়িয়া দিবে। যদি এ কায ঠিকভাবে না

করিতে পার তবে প্রাণদণ্ড করিব।" এই বলিয়া সেবককে সাবধান করিয়া দিলেন।

পরদিন রাজা ভোজনে বসিলেন, পুত্রগণকে একটু দূরে পংক্তিক্রমে বসাইলেন। কুমারদের পাতে ভাত দেওয়া হইয়াছে; জ্যেষ্ঠ মুখে গ্রাস তুলিতেই সকলে গ্রাস তুলিলেন। এইভাবে মাত্র পাঁচ গ্রাস অন্ন ভোজন হইয়াছিল এমন সময় রাজা চোখে ইশারা করিলেন। অমনি বাহিরে দাঁড়ান সেবক ত্রিশটি কুকুরকে ছাড়িয়া দিল। একে কুকুরগুলি কাল কিছুই খায় নাই, ক্ষুধায় পেট চু চু করিতেছিল; তার মধ্যে সম্মুখে এতগুলি সোনার থালায় রাশি রাশি অন্ন! কুকুরগুলি এক দৌড়ে ঘরে ঢুকিয়া রাজপুত্রদের থালায় খাইতে চাহিল। কুমারেরা হা হা, হু হু করিলেন বিস্তর, কিন্তু কুকুর কি তাহা বোঝে? তাঁহাদের থালায় কুকুরের মুখ লাগিতেই সতেরটি কুমার পাত্রত্যাগ করিলেন। কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র রত্ন এক কৌশলে ইহাদের ঠেকাইলেন। দূরে মুঠো মুঠো ভাত ছড়াইয়া দিলেন। কুকুর ঘরের কোণে সেই ভাত চাটিয়া খাইতে লাগিল, এ অবসরে রত্ন বেশ কয়েক গ্রাস খাইয়া ফেলিলেন। এমনি করিয়া ভাত ছড়াইয়া কুকুরগুলিকে দূরে রাখিয়া ছোট কুমার বেশ পেট ভরিয়া খাইয়া উঠিলেন। এদিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাই সব ক্ষুধার জ্বালায় অবশ্যই রাগিয়া আগুন হইয়া গেলেন। রাজা এই সব দেখিয়া বুঝিলেন কনিষ্ঠ রত্নই বুদ্ধিমান্। একদিন ত্রিপুর-সিংহাসনে যে রত্ন বসিবেন ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

এই ঘটনার পর রাজার স্নেহ রত্নের উপর বাড়িয়া গেল দেখিয়া অন্যান্য কুমারেরা রত্নকে ঈর্ষা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুকাল গেল কিন্তু ভাইদের মধ্যে রেষারেষি কমিল না বরং বাড়িয়া চলিল। মহারাজ ভাবিত হইলেন, এখন উপায় কি? পুত্রদিগকে দূরে দূরে রাখাই এক মাত্র উপায় স্থির হইল। পরবর্ত্তীকালের সাজাহান বাদশাহ যেমন তাঁহার পুত্রত্রয়কে বিভিন্ন প্রদেশের শাসন ভার দিয়া ইহাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন মহারাজও তেমনি পুত্রগণকে রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের শাসনভার দান করিলেন। এইভাবে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রাজা ফা রাজনগরে, এক পুত্র কাচরঙ্গে, অন্য পুত্র আচরঙ্গে বসিলেন ; আগর ফা পুত্রকে আগরতলা স্থান দিলেন। তাঁহার নাম হইতেই আগরতলা নামের উৎপত্তি। কুমারগণ যে যে স্থানের শাসনভার পাইলেন, সেই সেই স্থানের নাম এইরূপ-- (১) ধর্ম্মনগর (২) তারক (৩) বিশালগড় (৪) খুটিমুড়া (৫) নাক-বাড়ী (৬) মধুগ্রাম (৭) থানাচি (৮) মোহরী নদীর তীর (৯) লাউগঙ্গা প্রদেশ (১০) বরাক প্রদেশ (১১) তেলারঙ্গ (১২) ধোপ পাথর (১৩) মণিপুর।

(৪)

গৌড়েশ্বরের দরবারে ত্রিপুরকুমার রত্ন

মহারাজ ডাগরের সময় গৌড়ের নবাবের সহিত পুনরায় যোগাযোগ ঘটে।

লক্ষ্মণ সেন যখন নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে চলিয়া আসেন তখন বিজয়ী বখ্‌তিয়ার গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গৌড়ের নবাবের সহিত মহারাজ ডাগরের প্রীতি প্রণয় ঘটে। সেই বন্ধুতাসূত্রে কনিষ্ঠ পুত্র রত্নকে গৌড়েশ্বরের দরবারে পাঠাইয়া দেন।

ত্রিপুরেরশ্বরের হয়ত ইচ্ছা ছিল কুমার রত্ন যেরূপ চতুর, দেশ ভ্রমণে তাঁহার অভিজ্ঞতা আরও বাড়িবে। তাই রত্নের সঙ্গে ২৪০ জন সৈন্য ও আরও লোক জন দিলেন, কুমার দল বল লইয়া গৌড় উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কিছুকাল মধ্যে নানা দেশ দেখিয়া কুমার গৌড়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। গৌড়েশ্বর রত্নকে সমাদরে গ্রহণ করেন। নবাবের দরবারে কুমার যাইতে লাগিলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই নবাবের হৃদয় জয় করিয়া ফেলিলেন। তখন নবাব নিঃসঙ্কোচে কুমারের সহিত রঙ্গরহস্য করিতেন। একদিন নবাব রত্নকে রসিকতা করিয়া বলেন— "ওহে, ত্রিপুরকুমার! তোমার কুকি জাতীয় প্রজারা নাকি মাটির

নীচে যে ঘুঘুরা কীট থাকে তাহা খুঁড়িয়া তুলিয়া তৃপ্তিতে আহার করে, একি সত্য ?" কুমার নবাবকে কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন—"একথা সত্য হইতে পারে কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? আপনার রাজ্যে কত জাতির লোক আছে তাদের মধ্যে কেউ যদি এমন কিছু খায় তাতে গৌড়ের নবাবের গায়ে ত সে দোষ লাগে না, নবাবের আচার ব্যবহার তাতে কি অশুদ্ধ হয় ? আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য যেমনি বড় তেমনি তাতে অনেক জাতির বাস, খাওয়া পরা রুচির বিষয়, এতে হাত দেওয়া কি রাজার উচিত ?" গৌড়েশ্বর রত্নের আলাপনে বড়ই প্রীত হইলেন।

একদিন রত্ন দরবারে আসিয়াছেন, সেদিন সোমবার বড় সকাল আসিয়াছেন তখনও দরবার বসে নাই তাই রত্ন বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছেন। গৌড়েশ্বরের প্রাসাদের সিঁড়িতে পায়চারি করিতেছেন এমন সময় দেখিলেন চৌদোলে চড়িয়া এক পরমা সুন্দরী রমণী নবাবের প্রাসাদ পথে যাইতেছেন, তাঁহার পেছনে আরও এইরূপ জন কয়েক সুন্দরী ছিল। ইহাদের পরণে সোণার কাপড়, মাথায় সোণার ঝালর ছাতি, সঙ্গে নবাবের লোক লস্কর। এই আশ্চর্য্য রূপযাত্রা দেখিতে যখনই কৌতূহলে লোকের ভিড় হইতেছে অমনি ছড়িদার ছড়ি ঘুরাইয়া লোকজন হঠাইয়া দিতেছে। এই সব সাজসজ্জা লোক লস্কর দেখিয়া রত্নের মনে হইল, চৌদোল রমণী গৌড়েশ্বরের কোন এক মহিষী হইবেন এবং সঙ্গের নারীগণ হয়ত তাহার সেবিকা হইবে। যখন চৌদোল রত্নের সম্মুখে আসিয়া পড়িল তখন রত্ন ঢিপ্ করিয়া

সেই রমণীকে এক প্রণাম করিলেন। রমণী ত অবাক্, চৌদোল থামাইয়া এই অবোধ সুন্দর যুবকের পরিচয় লইল, তারপর একটু





রত্ন, গৌড়ের নবাবের প্রাসাদের সিঁড়িতে পায়চারি করিতেছেন এমন সময় দেখিলেন চৌদোলে এক পরমা সুন্দরী রমণী প্রাসাদ পথে যাইতেছেন—

কটাক্ষে হাস্য করিয়া চৌদোল চালাইয়া চলিয়া গেল, সেখানকার

লোকজন রত্নকে প্রণাম করিতে দেখিয়া হু হু করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই হাস্যকর ঘটনা দরবারী কাহারও কাহারও চোখ এড়াইলনা এবং ক্রমে গৌড়েশ্বরের কানে পৌছিতেও বিলম্ব হইল না।

যখন দরবার সুরু হইল, রত্ন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিলেন। নবাব রসিকতা করিয়া প্রশ্ন করিলেন---"ওহে ত্রিপুর কুমার, তোমার ভক্তির কথা শুনিয়া ত আমরা অবাক হইয়াছি। তুমি নাকি নর্ত্তকীকেও প্রণাম কর, কথাটা কি ঠিক?" অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই লোকজনের হাস্য দেখিয়া রত্নের সন্দেহ হইয়াছিল, এইবার পরিষ্কার সেই রমণী কে চিনিলেন। কিন্তু রত্ন মুখের রঙ না বদলাইয়া নির্ভীক ভাবে কহিলেন--"নবাবের মহিষী ভ্রমে ইহাকে প্রণাম করিয়াছি, ইহাতে ত্রুটি হইয়া থাকিলে সে ত্রুটি ভুলের, আমার নহে।" রত্নের এই উত্তর শুনিয়া দরবারীগণের রসিকতার সুযোগ ত ঘটিলইনা পরন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ে জড় সড় হইয়া পড়িল পাছে বা নবাব রাগ করেন! কিন্তু নবাব কুমারের সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এইভাবে গৌড়েশ্বরের দরবারে কুমার রত্নের খ্যাতি ও মান দিন দিন বাড়িতে লাগিল!

(৫)

মাণিক্য উপাধি দান

গৌড়েশ্বর একদা কুমারকে জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা কুমার, তোমাকে এত রোগা দেখাইতেছে কেন, ত্রিপুরেশ্বর কি তোমার খাওয়া পরার জন্য উপযুক্ত অর্থ পাঠান না?" কুমার রত্ন তখন নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। বলিলেন, আমার পিতা তাঁর পুত্রগণকে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছোট ছোট রাজা করিয়া দিয়াছেন, আমারই ভাগ্যে কিছু জুটে নাই, আমাকে প্রবাসে গৌড়েশ্বরের নিকট পাঠাইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর ভিতরে ভিতরে কুপিত হইলেন, মনে মনে হয়ত ভাবিলেন প্রবাসে পাঠানর উদ্দেশ্য হইতেছে একে দূরে রাখা। এক মুখ হাসিয়া রত্নকে কহিলেন—"ওঃ! এইজন্য মুখশ্রী তোমার মলিন? আচ্ছা কুমার কিছু ভাবিও না, আমি এর ব্যবস্থা করিতেছি!"

নবাবের যেই কথা সেই কায, চক্ষের ইঙ্গিতে গৌড় সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে গৌড় কটক কুমার রত্নকে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসাইবার জন্য যাত্রা করিল। এদিকে ত্রিপুরা রাজ্যে সংবাদ রটিয়া গেল-যে রত্ন গৌড়সেনা লইয়া পিতার রাজ্য জয় করিতে আসিতেছেন। মহারাজ ডাগর রত্নের

তীক্ষ্ণধীর পরিচয় পাইয়া পূর্ব্বেই এরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। রত্ন জামির গড় অবধি আসিয়া পড়িলেন এবং গড় জিনিয়া ঝড়ের বেগে রাঙ্গামাটি জয় করিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার সাতের ভাই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ণ করিলেন। মহারাজ ডাগর সে সময় খানাসি শৈলাবাসে ছিলেন, সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতার পরলোক গমনে এবং ভাইদের পরাজয়ে ত্রিপুরা রাজ্য রত্নের হাতের মুঠোর মধ্যে আসিয়া পড়িল। ত্রিপুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রত্ন কিছুকাল পরে গৌড়েশ্বর ভেট করিবার জন্য হস্তী প্রভৃতি বহু মূল্য উপহার সহ যাত্রা করেন। এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে।

মহারাজ রত্ন ফা গৌড়েশ্বরকে একশত হস্তীর সহিত একটি অত্যুজ্জ্বল ভেকমণি উপহার প্রদান করিলে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "মাণিক্য" উপাধি প্রদান করেন। গৌড়েশ্বরের অভিপ্রায়ে ফা উপাধি ত্যাগ করা হয় এবং সেই দিন হইতে অদ্যাবধি 'মাণিক্য' উপাধি ত্রিপুরেশ্বরের নামের সহিত যুক্ত হইয়া আছে। এইভাবে নবাবের সম্মান ও স্নেহ লাভ করিয়া মহারাজ রত্নমাণিক্য স্ব-রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। এই ঘটনা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘটে।

গৌড়েশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে বঙ্গের প্রজাদিগের কতক ত্রিপুররাজ্যের অধিকারে নেওয়া হয়, সেই সময় হইতেই প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পরিবার ত্রিপুর রাজ্যবাসী হয়।

(৬)

ধর্ম্মমাণিক্য ও রাজমালা

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য রত্নমাণিক্যের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ। মহামাণিক্যের পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ধর্ম্মই জ্যেষ্ঠ, যৌবনের সঙ্গেই ধর্ম্মের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যান এবং তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া অবশেষে কাশীধামে উপনীত হন। একদিন পথশ্রান্ত হইয়া তিনি মণিকর্ণিকা ঘাটের বৃক্ষমূলে নিদ্রিত আছেন এমন সময় এক সর্প তাঁহার মাথার উপর ফনা ধরিয়া রৌদ্র নিবারণ করিতেছিল। এই দৃশ্য কান্যকুব্জবাসীয় এক ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া সন্ন্যাসীকে জাগাইলেন। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের পরিচয় জানিতে চাহিলে ধর্ম্ম বলিলেন, তিনি সুদূর ত্রিপুরা হইতে আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"হে কুমার, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও, তোমার জন্য রাজমুকুট অপেক্ষায় রহিয়াছে।" ধর্ম্ম বলিলেন—"আমি যাইতে পারি যদি আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণ আমার অনুগমন করেন।" ব্রাহ্মণ সম্মত হইলেন। এদিকে ত্রিপুরার লোক ধর্ম্মকে খুঁজিতে আসিয়া কাশীধামে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল—"কুমার, তুমি সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে ফিরিতেছ আর আমরা তোমাকে খুঁজিয়া মরিতেছি, দেশের জন্য তোমার

বিন্দু মাত্র টান নাই।" কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন কি হইয়াছে?" তাহারা বলিল—"তোমার পিতা মহামাণিক্য স্বর্গীয় হইয়াছেন, এ দিকে তোমার চারি ভাই সকলেই সিংহাসন চান, সেনাপতিরাও স্ব স্ব প্রধান, তারাও রাজা হইতে চায়, এইভাবে রাজ্যে ঘোর অশান্তি। পাত্র মিত্র সব মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগকে তোমাকে খুঁজিতে পাঠাইয়াছে, এখন তুমি যদি রাজ্যে ফিরিয়া আস তবেই সব দিক রক্ষা হয় নতুবা ত্রিপুরা রাজ্যে রক্তনদী বহিয়া যাইবে। ত্রিপুরাকে শ্মশান করিতে চাও, না দেশে দেশে সন্ন্যাসী হইয়া ফিরিতে চাও?"

কথাগুলি একতিলও মিথ্যা নহে, তবে ত কনোজী ব্রাহ্মণ ঠিকই বলিয়াছেন যে রাজমুকুট আমার জন্য অপেক্ষায় আছে! এ ব্রাহ্মণ মনুষ্য না দেবতা! এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম্ম স্বরাজ্যে যাইতে স্বীকার করিলেন। তখন কনোজী ব্রাহ্মণকে এ সব জানাইলেন। ধর্ম্মের আগ্রহে আট জন ব্রাহ্মণ তাঁহার সহগামী হইলেন, জ্বলন্ত পাবক তুল্য এই ব্রাহ্মণগণের সাহচর্য্য পাইয়া হয়ত ধর্ম্মের মন তপস্যা হইতে সংসারের পথে ফিরিতে সম্মত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে যখন ধর্ম্ম স্ব-রাজ্য সীমায় পদার্পণ করিলেন তখন এ শুভ-সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। প্রজারা দলে দলে সন্ন্যাসী ধর্ম্মকে দেখিতে আসিল। আজিকার দিনে ভাওয়াল সন্ন্যাসীকে দেখিতে যেরূপ জনসমুদ্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল হয়ত সেইরূপ সে সময় ঘটিয়া থাকিবে! দুর্গ খালি ফেলিয়া সকল সৈন্য সন্ন্যাসী ধর্ম্মকে

আগু বাড়াইয়া নিতে আসিল। সেনাপতিদের রাজ্যলোভের নেশা ছুটিয়া গেল, তাহারাও সৈন্যদের সহিত যোগ দিল। কুচক্রী চারি ভাইয়ের দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গেল, তাহারা ত্বরিতে ধর্ম্মকে অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া আসিল। সেনাপতিরা ধর্ম্মের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। তখন ধর্ম্ম তাঁহার অনুজ চারি ভাইকে আলিঙ্গন করিলেন। সকলেরই চক্ষুতে আনন্দের অশ্রু বহিতে লাগিল। আকাশ ভরিয়া মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের জয়ধ্বনি ঘোষিত হইল। এমনি করিয়া বিপদের মহানিশা কাটিয়া গিয়া সুখের সূর্য্যোদয় হইল।

শুভদিনে ধর্ম্মমাণিক্যের অভিষেক হইল, পুরবাসীর আর আনন্দ ধরে না। ধর্ম্ম নামের সার্থকতার মধ্যে তাঁহার জীবন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কুমিল্লার ধর্ম্মসাগর আজও তাঁহার পুণ্য-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। পুণ্য দিনে এই উত্তম জলাশয় উৎসর্গ কালে কনোজী ব্রাহ্মণগণকে উহার পারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু ভূমি দান করেন। তাম্রশাসনে এই কথা লিখিয়া দেন—"আমার বংশ যদি লোপ পায় এবং এই রাজ্য অন্য রাজার হস্তে চলিয়া যায় তবে আমি সেই রাজার দাসানুদাস হইব যদি তিনি ব্রহ্মবৃত্তি লোপ না করেন।"

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের বীরত্বের তুলনা নাই। তিনি যেমন ধার্ম্মিক তেমন বীর ছিলেন। মুসলমানদের প্রতাপ বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র বাড়িয়া চলিল, অবশেষে ধর্ম্মমাণিক্য বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। যুদ্ধে তাঁহার জয় হইল, বঙ্গের নবাব হঠিয়া গেলেন।

তিনি ত্রিপুর রাজগণের আদি বাসস্থান সোনার গাঁ লুণ্ঠন করিয়া স্ব-রাজ্যে ফিরিয়া আসেন। ঐ সময়ে ব্রহ্মরাজ আরাকান-



মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক পুরোহিতদ্বয়ের দ্বারা রাজমালা কবিতায় রচনা করান।

পতিকে যুদ্ধে হারাইয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন।

মঘরাজ ত্রিপুর রাজের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। প্রবল পরাক্রম ধর্ম্মমাণিক্যের শক্তিতে মঘরাজ পুনরায় নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। ব্রহ্মরাজের এই ন্যূনতা ত্রিপুর ইতিহাসের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যোগভ্রষ্ট কখনো কখনো উত্তম ঘরে জন্মায়। ধর্ম্মমাণিক্য যোগভ্রষ্ট পুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার রাজত্বের অক্ষয় কীর্ত্তি রাজমালা বিরচন। তিনি পিতৃপুরুষদিগের ধারাবাহিক ইতিহাস বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক পুরোহিত দ্বয়ের দ্বারা কবিতায় রচনা করান।* এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য সম্পদ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই গ্রন্থ লেখা হয়। ৩২ বৎসর রাজত্ব করার পর তিনি স্বর্গে গমন করেন। ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৪৩০ হইতে ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দ ধরা যাইতে পারে।

(৭)

ধন্যমাণিক্যের শাপমোচন

ধর্ম্মমাণিক্যের দুই পুত্র ধন্য ও প্রতাপ। ধর্ম্মমাণিক্যের মৃত্যু হইলে সেনাপতিগণ চক্রান্ত করিয়া কনিষ্ঠ প্রতাপকেই সিংহাসনে বসাইয়া দিল, জ্যেষ্ঠ ধন্য পলাইয়া কোনও রূপে জীবন রক্ষা

* বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণ পরগণার ঠাকুরবাড়ী গ্রামনিবাসী, ইহারা ব্রাহ্মণ, উপাধি চক্রবর্ত্তী।

করিলেন। সেনাপতিরা হয়ত ভাবিয়াছিল প্রতাপ আমাদের হাতের পুতুল হইয়া থাকিবে, আর আমরা তাহার নামে রাজ্য শাসন করিব। কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ হইল। প্রতাপ ক্রমেই দুরন্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহার দৌরাত্ম্যে সকলে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। প্রজারা কাঁদিয়া আকুল—হা বিধাতঃ! মহারাজ ধর্ম্মের পরে ত্রিপুরা রাজ্য অধর্ম্মের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, কতকাল এ দুর্জ্জনের শাসন চলিবে?

কিছুদিন যায়, সেনাপতিরা আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতাপকে মারিয়া ফেলিল। তখন রাজ-সিংহাসন শূন্য হইয়া পড়িল, সেনাপতিদের মধ্যে কলহ উপস্থিত, কে রাজা হইবে! শ্রেষ্ঠ সেনাপতির সুবুদ্ধি হইল, ধন্য কোথায় আছেন, তাঁহার সিংহাসন তাঁহাকে দিলেই ত সব গোলের অবসান হয়। তখন ধন্যের খোঁজ আরম্ভ হইল, রাজ্য শুদ্ধ হুলস্থূল, ধন্য কোথায় গেল? কিন্তু কেহই কোন সন্ধান দিতে পারিলনা। অবশেষে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি বুদ্ধি করিয়া ধাত্রীর নিকট সংবাদ জানিতে চাহিলে ধাত্রী ত প্রমাদ গণিল! ঐ ধাত্রীই ধন্যকে লালন পালন করে। যখন ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয় তখন পাছে বা ধন্যের প্রাণ যায় সেই ভয়ে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হয়। পুরোহিতের ঘরে তাঁহাকে ছদ্মবেশী ভৃত্যরূপে রাখিয়া দেওয়া হয়। সেইখানেই সকলের দৃষ্টির আড়ালে ধন্য বড় হইতে থাকে।

ধাত্রীর মনের ভাব বুঝিয়া সেনাপতি কহিল ধন্যকে সিংহাসনে বসাইবার জন্যই খুঁজিতেছি, কোনআশঙ্কা করিও না।

এই বলিয়া শালগ্রাম শিলা ছুঁইয়া সত্য করিলে ধাত্রী কুমারের সন্ধান বলিয়া দিল। তখন দশ সেনাপতি হাতী ঘোড়ায় মিছিল সাজাইয়া পুরোহিতের বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত। ধন্য এসব সোরগোল শুনিয়া ভয়ে মাচার নীচে যাইয়া লুকাইলেন। পুরোহিত ধাত্রীর নিকট হইতে এসংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন কাযেই তাঁহার সন্দেহ হইল না। তিনি ঘরে আসিয়া দেখেন ধন্য মাচার নীচে ভয়ে জড়সড়। পুরোহিতকে দেখিয়া বলিলেন—"দোহাই ঠাকুর, আমি সেবক হইয়া উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া একমুষ্টি অন্ন তোমার ঘরে পাইয়া থাকি, আমাকে দূর করিয়া দিও না।" পুরোহিত অনেক বুঝাইলেন—"বাবা, কোন ভয় নাই, তুমি শাপভ্রষ্ট দেবকুমার, তোমার দুঃখের দিন কাটিয়া গিয়াছে রাজমুকুট পরাইবার জন্য তোমাকে বরণ করিতে আসিয়াছে।" পুরোহিতের অভয় বাক্যে কুমারের প্রত্যয় হইল। তখন কুমার বাহিরে আসিলেন। শুক্রাচার্য্যের কৃপায় যেমন দৈত্যরাজ বলির ইন্দ্রত্ব লাভ ঘটে, পুরোহিতের কৃপায়ও তেমনি ধন্যের রাজ্য লাভ হইতে চলিল। সেনাপতিগণ কুমারকে দেখিবা মাত্র তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল এবং গলবস্ত্র হইয়া কুমারের নিকট অপরাধ স্বীকার করিল। কুমার তখন হাতীর উপর জরির হাওদায় বসিয়া রাজা হইতে চলিলেন। পুরোহিতের বাক্য যথার্থ—এতদিনে তাঁহার শাপ মোচন হইল।

ধাত্রীর কথা পড়িবার সঙ্গেই রাজপুত ইতিহাসে ধাত্রী পান্নার কথা স্মরণ হয়—শোণিত-পিপাসু বনবীরের হাত হইতে

শিশু উদয়সিংহকে বাঁচান এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। ত্রিপুর ইতিহাসেও যে এইরূপ ধাত্রী বিরল নহে ইহা দেশের পক্ষে গর্ব্বেরই বিষয়।

(৮)

সেনাপতি বধ

শুভদিনে ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে ধন্যমাণিক্যের অভিষেক হইয়া গেল। প্রধান সেনাপতির কন্যা কমলা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই কমলা দেবীর নামেই সুবিখ্যাত কমলাসাগর খনন হয়, কসবা মার মন্দিরের নিম্নে কমলাসাগর আজও স্বর্গ শোভায় ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। কমলাদেবী যেন সাক্ষাৎ কমলাই ছিলেন, তাই তাঁহার কীর্ত্তি শত শত বৎসর ব্যাপিয়া অম্লান রহিয়াছে।

ধন্যমাণিক্যের শাসন কাল ঘটনা বহুল, রাজা হইয়া অবধি সেনাপতিগণের কড়া শাসনের মধ্যে তাঁহার দিন চলিতে লাগিল। কোথায় তিনি তাহাদিগকে শাসন করিবেন, না তাহারাই তাঁহাকে শাসন করিতে লাগিলেন। জুলিয়স সিজরের মৃত্যুর পর রোমের ইতিহাসে যেরূপ সেনাতন্ত্র প্রবল হইয়াছিল এও সেইরূপ। মহারাজ ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এদিকে সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাঁহার উপরে তেমনি স্নেহ

বিস্তার করিতেছিলেন। একদিন নৃপতি বলিলেন, "প্রভো! এরা আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, মুক্তির উপায় কি? আমি একা, আর এরা পঞ্চাশ হাজার সৈন্য বাঁটিয়া লইয়াছে।" পুরোহিত উপদেশ দিলেন, "দেখ মহারাজ, কথা ঠিক বলিয়াছ, রাজার পক্ষে ডর ভাল নয়, রাজা যদি ভয়ে কাঁচু মাচু হয় তবে রাজ্যের অমঙ্গল অনিবার্য্য। এই রক্তশোষা সেনাপতির দল হইয়াছে রাজ্যের ব্যাধিস্বরূপ, হয় এদিগকে তাড়াও নতুবা শমন ভবনে পাঠাও, এরা থাকিতে রাজ্যের মঙ্গল নাই।"

তখন গুরু শিষ্যে মিলিয়া মুক্তির উপায় স্থির হইল এদের বধ করা। রাজা অন্তঃপুরে রাণীরও অদর্শন হইয়া থাকিবেন, বাহিরে ঘোষণা হইবে যে রাজা অসুস্থ, কেবল পুরোহিত রাজার সাক্ষাতে থাকিবেন। অবসর সময়ে রাজা মল্লবিদ্যা শিখিবেন। যেমন পরামর্শ তেমনি কায। বাহিরে রাজার অসুখ প্রচার হইয়া গেল, এই ভাবে তিন মাস কাটিয়া গেল। একদিন প্রধান সেনাপতি রাণীর নিকটে রাজার অবস্থা জানিতে চাহিলেন। রাণী কহিলেন, "রাজাকে ত দেখিতে পাই না, অন্ধকারে থাকেন। একদিন অন্ধকারে দেখিলাম রাজার বৃহৎ শরীর হইয়াছে।" সেনাপতি শুনিয়া বুঝিলেন তাহা হইলে ত রাজার পাণ্ডুরোগ হইয়াছে, বড় কষ্ট ভোগ কপালে আছে।

এই ভাবে কিছু কাল গেল। কিছু দিন পরে সেনাপতিগণ রাজাকে দেখিতে চাহিলেন। পুরোহিত বলিলেন, তোমরা কাল আসিও, দেখা হইবে। এদিকে যুক্তি করিয়া ত্রিশ চল্লিশ

জন সেনাকে রাজার ঘরে অন্ধকারে লুকাইয়া রাখা হইল, তাহাদের হাতে রহিল চোখা তলোয়ার। পরদিন সন্ধ্যার সময় দশ সেনাপতি রাজাকে দেখিতে আসিল, বাহিরের ঘরে ঢাল তলোয়ার রাখিয়া সেনাপতিরা নগ্নপদে অন্তঃপুরে চলিয়া আসিল, পুরোহিত পথ দেখাইয়া আনিলেন। ঘর অন্ধকার, তাহারা ঢুকিয়া দেখিলেন রাজাকে ঈষৎ দেখা যাইতেছে। জাজিমের উপর বসিয়া আছেন—বিপুল দেহ। তখন দশ



মহারাজ জাজিমের উপর বসিয়াছিলেন······ইহারা সাষ্টাঙ্গে মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিল···ঘাতক এই সুযোগে সকলের শির টুকরা করিয়া ফেলিল।

সেনাপতি গড় করিয়া মাটিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল, সেই মুহূর্ত্তে সঙ্কেত পাইয়া ৩০।৪০ জন সিপাহী সেনাপতিদের একেবারে টুকরা করিয়া ফেলিল। এই ভাবে বিপক্ষ দলন করিয়া রাজার বন্দীদশা ঘুচিল। পরদিন রাজ্যময় ঘোষণা হইল রাজার অসুখ সারিয়া গিয়াছে—রাজা হস্তিপৃষ্ঠে রাজ্যময় বেড়াইয়া আসিলেন।

(৯)

কুকিরাজ্য জয়

ধন্যমাণিক্য নিজের মনের মত করিয়া ত্রিপুর সেনা গঠন করিলেন, গৌড়ের সেনার মত সমর কৌশল শিক্ষা দিয়া ইহাদিগকে যুদ্ধে একরূপ অপরাজেয় করিয়া তুলিলেন। প্রধান সেনাপতি হইলেন 'রায় কাচাগ'। এই সময়ে ত্রিপুরার পূর্ব্বদিকে গভীর অরণ্যে এক শ্বেতহস্তী দেখা যায়। থানাসী নগরের কুকি নরপতি ইহাকে আটক করিয়াছেন এই সংবাদ হেড়ম্ব রাজের নিকট পৌছে। হেড়ম্বরাজ ঐ হাতী পাইবার জন্য অভিযান পাঠাইলেন কিন্তু দুর্ভেদ্য কুকিদুর্গ জয় করিতে না পারিয়া হেড়ম্বসৈন্য ফিরিয়া গেল। তখন ধন্যমাণিক্য ঐ কুকি অঞ্চল জয়ে শ্বেতহস্তী পাইবার জন্য প্রধান সেনাপতি রায় কাচাগকে থানাসী নগরে পাঠাইলেন। আটমাস যাবৎ লড়াই চলিল কিন্তু থানাসী দুর্গ জয় হইল না। তখন কুকিরা গড়ের উপরে উঠিয়া ত্রিপুর সৈন্যকে পা দেখাইয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ইহাতে রায় কাচাগের ক্রোধের সীমা রহিল না। ত্রিপুর সেনারা যে ছাউনিতে বাস করিত, তাহার উপরের চালা ফেলিয়া দিলেন যেন বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ইহারা যুদ্ধে জিতিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। সৈন্যেরা প্রাণপণ করিল কিন্তু গড় অতিক্রম করিতে পারিল না।

এই সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। ত্রিপুর সেনাবাসের কাছে এক অতিকায় গোসাপ দেখা গেল—উহা লম্বায় আট এবং পাশে তিন হাত। রায় কাচাগের মাথায় এক ফন্দী আসিল, তিনি ঐ গোসাপের কোমরে এক লম্বা বেত বাঁধিয়া থানাসী গড়ের নীচে ছাড়িয়া দিলেন। তখন রাত্রি হইয়াছে গাছের নীচে জমাট আঁধার। থানাসীগড় এত খাড়া যে একমাত্র সর্পজাতীয়ই ইহার উপরে উঠিতে পারে। নীচে তাড়া খাইয়া গোসাপ গড় বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, রায় কাচাগ ঐ বেত আকড়াইয়া অন্ধকারের মধ্যে দুর্গের চূড়ায় আসিয়া পড়িলেন তাঁহার পেছনে পেছনে পিল পিল করিয়া সৈন্যের সারি উঠিতে লাগিল। কয়েকজন আসিয়া পড়িবার পর তাহারা বড় দড়ি ফেলিয়া দিল, তখন সিঁড়ি পাইয়া পিঁপড়ার স্রোতের ন্যায় বাকী সৈন্য উপরে উঠিল।

এ দিকে দুদ্ধর্ষ কুকি সৈন্যেরা প্রমোদে গা ঢালিয়া দিয়াছিল—মদের নেশায় একেবারে চুর। দুর্গের গা ঘেষিয়া যে ত্রিপুর সৈন্য উঠিতেছে এবং তাহাদের ঢাল তলোয়ারে ঘষা খাইয়া যে শব্দ হইতেছিল তাহার আওয়াজ মাতাল সেনাদের কানে মাঝে মাঝে বাতাসে আনিতেছিল। মদের নেশা মাঝে মাঝে টুটিতেছিল—আরে শোন্, ঐ যেন ঢালের আওয়াজ পাইতেছি, এরা আবার উপরে উঠিয়া না আসে! অন্য কুকি তাহাকে আর একটু মদ ঢালিয়া দিয়া কহিল—দূর বোকা, তাও কি কখনো হয়, এসব গবয়ের কাণ্ড, দুর্গের গায়ে এরা শিং

ঘষিতেছে! যাক্ এই ভাবে তারা মদে যতই অচেতন হইল, ত্রিপুর সেনারা সেই সুযোগে দুর্গের উপর ততই নিজের রণসজ্জা সমাপন করিল। শেষ রাত্রিতে সহসা রণ দামামা বাজিয়া উঠিল, থানাসী সেনা হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। কিন্তু কাহার সঙ্গে লড়িবে? যমতুল্য রায় কাচাগ সম্মুখে—পেছনে ত্রিপুর বাহিনী। চক্ষের নিমিষে রক্তনদী বহিয়া গেল, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে থানাসী কুকিরাষ্ট্রের উপর ত্রিপুর বৈজয়ন্তী উড়িল।

ধন্যমাণিক্যের দৃষ্টি বঙ্গদেশের উপর পড়িল। নিজ রাজধানী উদয়পুরের নিকটবর্ত্তী মেহেরকুল, পাটীকারা, গঙ্গামণ্ডল, বগাসার, বেজুরা ভানুগাছ, বিষ্ণুজুড়ী, লঙ্গলা প্রভৃতি দেশ হেলায় জয় করিয়া ফেলিলেন। বরদাখাত জমিদার প্রতাপ, গৌড়ের সম্বন্ধ ছাড়িয়া ত্রিপুরেশ্বরের সহিত যোগ দিলেন। কেবল মাত্র খণ্ডলই বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। ত্রিপুরেশ্বর এক সেনাপতির অধীনে সৈন্য দিয়া খণ্ডল অবরোধ করিলেন। খণ্ডলের লোকেরা কৌশলে সেনাপতিকে ধরিয়া ফেলিয়া গৌড়ের নবাবের দরবারে ইঁহাকে পাঠাইয়া দেয়। গৌড়ের অধিকার খর্ব্ব করায় নবাব পূর্ব্ব হইতেই ত্রিপুরার প্রতি বিরক্ত ছিলেন, তাই সেনাপতিকে হস্তী দিয়া পিষিতে হুকুম দিলেন। সেই সেনাপতি অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ত্রিপুরেশ্বর এই সংবাদ শুনিয়া রায় কাচাগকে খণ্ডল দলনে পাঠাইলেন। রায় কাচাগের নামে সকলই থরহরি কম্পমান,

কে আর যুদ্ধ করে? খণ্ডল বশ মানিল। খণ্ডলের বারজন ভূঁয়াকে রাজ-দরবারে পাঠান হয়, খণ্ডলে ভিতরে ভিতরে গৌড়ের সহিত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। সন্দেহের ফলে দরবারে ইহাদের মাথা কাটিয়া ফেলা হয়, গৌড়ে হাতীর পেষণে সেনাপতির মৃত্যুর এইরূপে প্রতিশোধ লওয়া হয়। ইহার পরে খণ্ডল আর টুঁ শব্দও করে নাই।

(১০)

ধন্যমাণিক্য ও হোসেন শাহ

কুকি রাজ্য জয়ে ত্রিপুরার পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মদেশ অবধি পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং চট্টগ্রামের উপর ত্রিপুরেশ্বরের ক্ষমতা যাহাতে না বাড়িতে পারে তৎপ্রতি একদিকে গৌড়ের নবাব হোসেনশাহ ও অন্যদিকে আরাকানপতি মেং তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। শীঘ্রই চট্টগ্রামের প্রাধান্য লইয়া যুদ্ধ বাঁধিল, মঘসৈন্য ও নবাবের সৈন্যে রণক্ষেত্র ছাইয়া গেল কিন্তু হনুমানধ্বজ রায় কাচাগের আগমনে হিন্দুর জয় হইল। রায় কাচাগের প্রবল পরাক্রমের নিকট পরাজিত হইয়া নবাবের যে ফৌজ স্থায়ীভাবে চট্টলে থাকিত তাহারা কিল্লা ভাঙ্গিয়া গৌড়ে চলিয়া গেল। চট্টলে হিন্দু রাজার কেতন উড়িল।

চট্টল অধিকার করায় গৌড়ের নবাব ত্রিপুরা জয়ের সঙ্কল্প করিলেন। রায় কাচাগের জয়যাত্রায় ত্রিপুরা ক্রমেই গৌড়ের প্রতিপক্ষরূপে ঠেকিতে লাগিল। নবাব বিপুল সৈন্যবাহিনী সাজাইয়া গৌর মল্লিকের অধীনে এক অভিযান পাঠাইলেন। কুমিল্লাতে নবাব সেনার সহিত প্রথম সংঘর্ষ হয়। যাহাতে মল্লিক আর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যাইতে না পারেন তজ্জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কুকি রাজ্য জয়ে রায় কাচাগের মাথায় যে অদ্ভুত কৌশল খেলিয়াছিল, এখানেও তাহার কম হইল না। কুমিল্লায় নবাব সৈন্যের শিবির খাটান হইল, দেশের অবস্থা মল্লিকের জানা ছিল না, তাই যুদ্ধের চাতুরী বুঝিয়া উঠেন নাই। কুমিল্লার উজানে সোণামুড়ার পাদদেশে গোমতী বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল, তিন দিন জল আটক রাখা হয়। তৃতীয় দিন রাত্রিকালে সহসা বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় আচম্বিতে জল আসিয়া রণক্ষেত্র ভাসাইয়া ফেলিল, পাঠানেরা হাহাকার করিয়া উঠিল একেবারে সাঁতার জল। চণ্ডিগড়ে পূর্ব্বেই ত্রিপুর সৈন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল, তাহারা সেই অবস্থায় পাঠানের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িক, ফলে গৌর মল্লিক কোনও রূপে শায়েস্তা খাঁর ন্যায় প্রাণ লইয়া পলাইলেন বটে কিন্তু তাঁহার পাঠান সৈন্যের মধ্যে কে বাঁচিল জানিবারও অবকাশ হইল না।

. গৌড়ের নবাব যখন এই পরাজয় কাহিনী শুনিতে পাইলেন, তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। হোসেন শাহ সেনাপতিদের নিয়া অনেক পরামর্শ করিলেন। তখন স্থির হইল হৈতন খাঁর

অধীনে পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য, অভিযান যাত্রা করিবে। তাহাই হইল। গৌর মল্লিকের অপযশ হইল, তাই তাহার আর ডাক পড়িল না --এবার হৈতন খাঁর পালা। হৈতন সেনাপতিত্ব পদে বৃত হইয়া কাযটিকে খুব কঠিন মনে করিলেন না। তিনি গৌর মল্লিকের সহিত পরামর্শ আঁটিয়া দেশের হালচাল বুঝিতে পারিতেন কিন্তু গৌর মল্লিকের অভিজ্ঞতার সন্ধান লইলেন না। আফজল খাঁ যেমন পূর্ব্ব প্রসঙ্গ বিস্মৃত হইয়া নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছিলেন শিবাজীকে বাঁধিয়া আনিবেন, হৈতন খাঁও তেমনি বীরদর্পে মেদিনী কম্পিত করিয়া ত্রিপুরনাথকে শিক্ষা দিতে চলিলেন।

এবারের আক্রমণ পূর্ব্বের ন্যায় কুমিল্লা অঞ্চলে হয় নাই। হৈতন খাঁ কুমিল্লার পথ ছাড়িয়া কৈলাগড় পথে অগ্রসর হইলেন। কৈলাগড় বর্ত্তমান কসবা। কসবা হইতে এক মাইল পশ্চিম দক্ষিণ দিকে বিজয় নদীর তীরে হৈতন খাঁ নিজ শিবির রচনা করেন। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে পরিখা বা গড়খাই কাটা হইয়াছিল। ঐ চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সেনাবাস রক্ষার জন্য বিজয়নদীর তীরে মাটির প্রাচীর তোলা হয়। কুমিল্লা হইতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অভিমুখে যে রাস্তা গিয়াছে তাহা এই পরিখা ভেদ করিয়া গিয়াছে। মেবার আক্রমণ উপলক্ষ্যে আকবর যেখানে সেনাবাস রচনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানটিকে এখনও দেখিলে চিনা যায়, উহা 'আকবর কা দিয়া' (দেওয়াল) নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তেমনি কসবার

সন্নিকটস্থ গড়-খাইকে হোসেন-সাহ-কা-দিয়া বলা যাইতে পারে।

কৈলাগড় অঞ্চলে ত্রিপুর সৈন্যের সহিত হৈতন খাঁর যুদ্ধ হয়। হৈতনের ধারণা হইল ত্রিপুরায় আর কত সৈন্য থাকিবে, যুদ্ধে ইহারা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। যুদ্ধে ত্রিপুরসৈন্যের পরাজয় হইতে লাগিল, হৈতন খাঁ খড়্গরায় প্রভৃতিকে যুদ্ধে হঠাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ক্রমে শুগড়িয়া গড়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে গগন সেনাপতিকে হারাইয়া উদয়পুর অভিমুখে গৌড় সৈন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। গঙ্গানগর পার হইয়া পথে শিবির রচনা হইল, পাছে গোমতীর জল বিষাক্ত হয় সেই ভয়ে এক দীঘি খনন করা হয়। হৈতন খাঁর সঙ্গে নানা শ্রেণীয় কারিগর মিস্ত্রীর অভাব ছিল না। গোমতীর এক বাঁক দেখিয়া হৈতনের বেশ পছন্দ হইল, স্থানটি দুর্গ নির্ম্মাণের পক্ষে উপযোগী বোধ করিয়া সেখানে গড় নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। কারিগর মিস্ত্রীরা কাযে লাগিয়া গেল। ঠিক ঐ স্থানের উজানেই ত্রিপুরার গড় পর্ব্বতের চূড়ায় রহিয়াছে। মহারাজ ধন্যমাণিক্য ঐ গড় হইতে পাঠানের দুর্গ নির্ম্মাণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

ত্রিপুরার স্বাধীনতা সঙ্কটাপন্ন, মহারাজ ধন্যমাণিক্য সেনাপতিদের লইয়া মন্ত্রণায় বসিলেন। এই জাতীয় সঙ্কট কালে ত্রিপুরার এক যুবতী তাঁহার ডাকিনী বিদ্যার শক্তিতে অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা গোমতীকে উজানে স্তম্ভিত করিয়া ফেলেন বলিয়া উল্লেখ

পাওয়া যায়। ইহার নাম বলাগমা। ফরাসী যুদ্ধের সময় যেমন Maid of Orleans এর আবির্ভাব দেখা যায়, এও তেমনি ইতিহাসের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! বলাগমার প্রভাবে গোমতী উজানে আটক পড়িল; সুতরাং ভাটিতে বেশ চড়া পড়িয়া গেল। গৌড় সৈন্য আনন্দিত হইয়া কহিয়া উঠিল— হোসেন সাহের ভাগ্যে নদী চর দিয়াছে। তাহারা শত্রুপক্ষীয়ের কৌশল না বুঝিয়া বালুর উপরে নিজেদের ছাউনি খাটাইয়া ফেলিল। হৈতন খাঁ পূর্ব্ব-ইতিহাসের খোঁজ রাখিতেন না বলিয়াই এরূপ প্রমাদে পড়িয়াছিলেন।

এদিকে উজানে নদী ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুর সৈন্যেরা অগণিত ভেলা তৈরী করিয়া ফেলিল। সন্ধ্যা হইতেই ঐ ভেলার উপর সারি সারি ত্রিপুর সৈন্য বসিয়া গেল, প্রত্যেক ভেলায় বড় বড় মশাল। রণসজ্জায় রাত দুপুর হইয়া গেল। তারপর যখন নদীর বাঁধ খুলিয়া দেওয়া হইল তখন জলের কি শব্দ। ভেলাগুলি পর পর তীরের বেগে ছুটিয়া চলিল, যেন দৌড়ের নৌকা ছুটিয়াছে। নদীর দুইপাশে জমাট আঁধার।

এ দিকে গৌড়সৈন্য সুখে নিদ্রা যাইতেছিল, কি অবস্থার মধ্যে তাহারা জাগিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কথায় বলে ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর, এখানেও তাহাই হইল। বিপদের উপরে বিপদ! জলে তাহারা ভাসিল, রাশি রাশি ভেলার উপর হইতে অস্ত্র বর্ষণ চলিল, তাহাদের পিছনে যে বনে আশ্রয় মিলিবার



জলে তাহারা ভাসিল, ভেলার উপর হইতে অস্ত্র বর্ষণ
চলিল……দাবানল জ্বলিয়া উঠিল।

কথা সেখানে দাউ দাউ করিয়া দাবানল জ্বলিয়া উঠিল, ত্রিপুর সৈন্যেরা সেখানে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। হৈতন খাঁ কোনওরূপে প্রাণ লইয়া শুগড়িয়া গড়ে আসিয়া পৌছিলেন।

গৌর মল্লিকের মত তাঁহারও সৈন্যদের মধ্যে কে বাঁচিয়া আছে খবর লইবার সুযোগ হইল না। শুগড়িয়া দুর্গে তিনি হতভম্ব অবস্থায় মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। ওঃ, বড়ই ভুল হইয়াছে, ত্রিপুরা জয় করিতে বহু সৈন্যের প্রয়োজন, অল্প সৈন্যে অভিযান চালান বেকুবের কায! যখন গৌড়ে পৌছিয়া হোসেন শাহের নিকট পরাজয় বার্ত্তা কহিয়া আরও সৈন্যের জন্য আবেদন জানাইলেন তখন নবাব বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন।

(১১)

ত্রিপুরাসুন্দরী প্রতিষ্ঠা

ধন্যমাণিক্যের কীর্ত্তি কাহিনীর মধ্যে অবিনশ্বর কীর্ত্তি হইতেছে তাঁহার রাজধানীতে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির নির্ম্মাণ ও তাহাতে দেবীর প্রতিষ্ঠা। কালিকা মূর্ত্তি কষ্টিপাথরে গড়া। মন্দির নির্ম্মাণ ধন্যমাণিক্যের হস্তে হইয়াছিল বটে কিন্তু মূর্ত্তির নির্ম্মাণ কবে হইয়াছিল ইহার কোন সঠিক নির্ণয় নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে পীঠস্থান সম্বন্ধে পীঠমালা তন্ত্রে উল্লেখ আছে যে ত্রিপুরা দেশে সতীর দক্ষিণ পদ পড়ায় দেবী হইতেছেন ত্রিপুরাসুন্দরী। আর

ভৈরব হইতেছেন ত্রিপুরেশ শিব। উদয়পুরের উপকণ্ঠে ভৈরবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। উদয়পুরের দেবী মন্দির ১৪২৩ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত (1501 A.D.)। ধন্যমাণিক্যের চট্টল জয়ের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। চট্টল জয় দ্বারা বিশেষ করিয়া ভারতের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ চন্দ্রনাথের সহিত ধন্যমাণিক্যের নাম জড়িত হয়। এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে চন্দ্রনাথ তীর্থের স্বয়ম্ভূনাথ লিঙ্গকে ধন্যমাণিক্য স্বীয় রাজধানী উদয়পুরে আনিতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু ভগবতী তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ দেন যেন ত্রিপুরাসুন্দরী বিগ্রহকে তথা হইতে আনিয়া উদয়পুরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বপ্নাদেশ অনুসারে ত্রিপুরাসুন্দরীকে চন্দ্রনাথ তীর্থ হইতে উদয়পুরে আনা হয়, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তির পশ্চাতে ত্রিপুরারি শিবেরই ইতিহাস রহিয়াছে যাঁহার ক্রোধানলে ত্রিপুর ভস্মীভূত হইয়াছিল। ত্রিলোচনের বংশের কুলদেবীরূপে ত্রিপুরাসুন্দরী হয়ত রাজ-পাটের পরিবর্ত্তনে স্থান হইতে স্থানান্তরে আসিয়াছেন, প্রতীতের সময় হইতে হয়ত ত্রিপুরা অঞ্চলে আসেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া দেবী অবশেষে উদয়পুরে প্রতিষ্ঠিত হন। সুদূর অতীতের কথা সঠিক বলার সুবিধা কই ?

মহারাজ ধন্যমাণিক্য আরও অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং প্রসিদ্ধ ধন্যসাগর খনন করেন। দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া তিনি ১৫১১ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন, সতী সাধ্বী কমলাদেবী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন।

(১২)

মৈথিলী ব্রাহ্মণ ও ত্রিপুররাজ

ধন্যমাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজ্য ক্ষীণবল হইয়া পড়িল। পিতার মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠপুত্র ধ্বজ সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার রাজত্ব কাল অতি অল্প। ধ্বজমাণিক্যের মৃত্যুর পর তদীয় শিশুপুত্র ইন্দ্র সিংহাসন পান নাই। ধন্যমাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র দেবমাণিক্য সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। এই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের প্রভাবে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হইল। বিক্রমাদিত্যের বেতাল পঞ্চবিংশতির ন্যায় রোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিতে লাগিল। মিথিলা নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ নামে এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ দেবমাণিক্যকে পাইয়া বসিলেন। রাজা তাঁহার নিকট তন্ত্রমতে ভাব, চক্র, শ্মশান-সাধন প্রভৃতি নিভৃতে শিখিতে লাগিলেন। রাজকার্য্য ও তন্ত্রসাধন এক সঙ্গে চালান যায় না সেই জন্য যাঁহারা সাধনমার্গে যাইতে চান তাঁহারা রাজ্যকে কণ্টক জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। কিন্তু দেবমাণিক্য দুই নৌকাতে পা দিয়াছিলেন। ফলে রাজার একুল ওকুল উভয় কূলই নষ্ট হইল। একদিন রাজাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, শেষে দেখা গেল শ্মশানে রাজার মৃত দেহ পড়িয়া আছে। রাজ্যময় ক্রন্দনের রোল পড়িল, দেবমাণিক্যের রাণী স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

এই সুযোগে ধ্বজমাণিক্যের রাণী ইন্দ্রকে রাজপদে বসাইয়া দিলেন। কপালকুণ্ডলার ন্যায় ঐ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের শাসনেই রাণী চলিতে লাগিলেন। মৈথিলী ব্রাহ্মণ রাজ্যে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রমাণিক্যের বয়স অল্প, কাযেই ইন্দ্রের নামে ঐ ব্রাহ্মণই রাজ্য করিতে লাগিলেন। দেবমাণিক্যের পুত্র বিজয় পাছে প্রমাদ ঘটায় এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ তাহার কয়েদের ব্যবস্থা করিলেন। এই ভাবে বৎসর কাল ধরিয়া ব্রাহ্মণ ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে সুবিধার জন্য স্বদেশ মিথিলা হইতে আড়াইশত যোদ্ধা আনাইয়া রাখিলেন।

ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র চলিল। প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের ঘরে বৈঠক বসিল, স্থির হইল ব্রাহ্মণকে বধ করিতে হইবে। ছল করিয়া ব্রাহ্মণকে দুপুর রাতে জানান হইল যে রাণীর প্রাণ সংশয় পীড়া, রাণী পায়ের ধুলো চাহিতেছেন। ব্রাহ্মণের মৃত্যু ঘনাইয়াছিল, তাই এ সংবাদে বিশ্বাস করিয়া চৌদোল চড়িয়া রাণীকে দেখিতে চলিলেন। পথে একদল সেপাহী ব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং শূলে চড়াইয়া মারিয়া ফেলিল। প্রাণ-বিয়োগ হইবার কালে ব্রাহ্মণ এক শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন, ইহার অর্থ যে হেয়ালীপূর্ণ তাহা বলাই বাহুল্য—"পৃথিবীতে কমলশোভিত হংসবিরাজিত সরোবর কি নাই? কিন্তু চাতক সে দিকে না গিয়া ইন্দ্রের বারি বর্ষণের প্রতীক্ষায়ই থাকে।" শ্লোক সমাপ্তির সঙ্গেই ব্রাহ্মণের দেহ প্রাণশূন্য হইল!

ইন্দ্রমাণিক্যের আসনের প্রতি চাতকের ন্যায় তৃষ্ণাতুর হইয়া যে ব্রাহ্মণ প্রাণ হারাইলেন একথা অবশ্যই সত্য। এই তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের প্রভাব বড়ই চমকপ্রদ! রেনে ফিউলিপ মূলারের রেসপুটিন অনেকটা এইরূপ। রাশিয়ার সর্ব্বশেষ জারের উপর ইহার অসামান্য প্রভাব ছিল। বায়স্কোপে লিওনেল ব্যারীমূর রেসপুটিনের ভূমিকায় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। অনেকের মতে রেসপুটিনের ইন্দ্রজালে জারের বশীকরণ হওয়ায়, রাশিয়াতে বলশেভিক গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়। ফল বিষময় হইয়াছিল, রেসপুটিন যে ইন্দ্রজালের আগুন জ্বালাইয়াছিল তাহাতে নিজে ত মরিলই, পরিণামে জার ও জারিনা ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। এখানেও সেই একই দৃশ্য। সৈন্যসামন্ত ক্ষেপিয়া গিয়া তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের প্রতি মন্ত্রমুগ্ধ ইন্দ্রমাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্যের জননীকে পর্য্যন্ত বধ করিয়া ফেলিল। তখন মৈথিলী সিপাহীর দল বেগতিক দেখিয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

বিজয়মাণিক্য ও দৈত্যনারায়ণ

প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের হাতেই শাসন ভার আসিয়া পড়িল। দেবমাণিক্যের পুত্র বিজয় তখনও বন্দী অবস্থায় হীরাপুরে ছিলেন, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নীত তাঁহার এই বন্দী দশার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দৈত্যনারায়ণ সেনা লইয়া বিজয়কে আনিতে হীরাপুরে গেলেন। বিজয়ের বন্দী দশার অবসান হইল, সেনাপতি সসৈন্যে সামরিক রীতিতে বিজয়কে ত্রিপুরেশ্বররূপে অভিবাদন করিলেন। শুভদিনে রাজধানীতে বিজয়ের পদার্পন হইল, একটা দুঃস্বপ্নের মোহ হইতে যেন ত্রিপুরারাজ্য মুক্ত হইয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিল।

ত্রিপুর কুলতিলক বিজয়মাণিক্য ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহাকে দৈত্যনারায়ণ স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন। একদিকে প্রধান সেনাপতি অন্যদিকে রাজার শ্বশুর হইয়া দৈত্যনারায়ণের প্রতাপের সীমা রহিল না। ত্রিপুরা রাজ্য তাঁহার হাতের মুঠোর মধ্যে আসিয়া পড়িল। রাজার বয়স অল্প, সুতরাং দৈত্যনারায়ণ একেবারে আকবরের অভিভাবক

বৈরাম খাঁ হইয়া বসিলেন। রাজ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ টুঁ শব্দটি করে না!

দৈত্যনারায়ণের কীর্ত্তি উদয়পুরে জগন্নাথ মন্দির নির্ম্মাণ। শ্রীক্ষেত্র হইতে জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের বিগ্রহ শ্রীশ্রীজগন্নাথ স্পর্শ করাইয়া আনা হয় এবং আড়ম্বরের সহিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বার মাসে বার ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল।

বিজয়মাণিক্য ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন কিন্তু দৈত্যনারায়ণের হাতের পুতুল হইয়া রহিলেন মাত্র। সৈন্যসামন্তের কুচকাওয়াজ হইতে হাতিশাল, ঘোড়াশাল পর্য্যন্ত দৈত্যনারায়ণের অঙ্গুলি সঙ্কেতে সকলি চলিতে লাগিল, বিজয়মাণিক্য কেবল দর্শক মাত্র, মুখের কথাটি কহিবার যো নাই। দৈত্যনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্ল্লভনারায়ণ জ্যেষ্ঠের বলে বলীয়ান্ হইয়া দৌরাত্ম্য করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। ক্রমেই অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠিল। একদিন মাধবতলার হাটে এক দরিদ্রা সুন্দরী নারী শাক বেচিতে বসিয়াছিল, তখন সে পথ দিয়া দুর্ল্লভনারায়ণ দোলায় চড়িয়া যাইতেছিল। রমণীর রূপ দেখিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া গেল। রমণীর স্বামী আসিয়া রাজার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বিচার প্রার্থনা করিল "আপনি ধর্ম্মাবতার, প্রজার মা বাপ, যদি এ অত্যাচারের বিচার না করেন তবে রাজ্যে বাস করিব কিরূপে?" বিজয়মাণিক্য তাহাকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন। তখন

মনে মনে ভাবিলেন—ধিক্ আমাকে, আমি ত রাজা নহি! দৈত্যনারায়ণের দৈত্যপণার দর্শক মাত্র, কিন্তু এভাবে আর কত কাল থাকিব? এইরূপ চিন্তা করিয়া দৈত্যনারায়ণের বড় জামাতা মাধবকে ডাকাইলেন।

মাধবের সহিত অনেক গোপন পরামর্শ হইল। মাধব যখন বুঝিতে পারিলেন দৈত্যনারায়ণকে সরান রাজার অভিপ্রেত তখন ভয়ে কাঁচুমাচু করিয়া উঠিলেন। "ইহা কি সম্ভব? যদি আমার ঘরে সেনাপতির মৃত্যু ঘটে তবে আপনার রাণী কি আমাকে রেহাই দিবেন?" তারপর অনেক আলাপের পর স্থির হইল মাধব ভূষণা চলিয়া যাইবেন, সেখানে দৈত্যনারায়ণকে কৌশলে আনিয়া তাহার বধ সাধন করাইতে হইবে। বিজয়-মাণিক্য সাবধান করিয়া দিলেন রাজার নামে কেহ ডাকিলেও মাধব যেন উহা বিশ্বাস না করেন, যখন তাঁহার হাতের হীরার অঙ্গুরী লইয়া কেহ যাইবে তখনই মাধব বুঝিবেন ইহা সত্যিকার ডাক, ছল নহে। এই স্থির করিয়া মাধব ভূষণায় গেলেন।

দৈত্যনারায়ণ মাধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভূষণায় আসিয়া দেখেন মাধব বড়ই বিমর্ষ। আহার করিয়া সেনাপতি পানে মত্ত হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহাকে বধ করা কঠিন হইল না। তারপর ঘরে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল, উদ্দেশ্য দৈত্যনারায়ণ পুড়িয়া মরিয়াছেন এই প্রচার করা। খবর রাজার নিকট পৌঁছিতেই তিনি সৈন্যসামন্তের শপথ গ্রহণ করিয়া নিজকে প্রধান সেনাপতির স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং অল্প

কালের মধ্যে অবলীলাক্রমে রাজ্য হাতের মুঠোর মধ্যে আনিয়া প্রবল প্রতাপে রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। এদিকে তাঁহার রাণী মাধবের সহিত রাজার ষড়যন্ত্রের ও সাঙ্কেতিক হীরার অঙ্গুরীর কথা গোপনে জানিয়া প্রতিহিংসায় জ্বলিতে লাগিলেন। কিন্তু মাধব আর উদয়পুরের ত্রিসীমানা মাড়ান না। একদিন রাণী দেখেন মহারাজ সেই সাঙ্কেতিক হীরার অঙ্গুরী বিছানার উপরে ফেলিয়া অতি প্রত্যুষে শিকারে বাহির হইয়া গিয়াছেন। এতদিনে সুযোগ মিলিল। রাণী চতুরতা করিয়া হীরার অঙ্গুরীয় লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিলেন। মাধব উহা দেখা মাত্রই বুঝিলেন মহারাজ ডাকিয়াছেন, তাই নিঃসন্দেহে উদয়পুরে রাজপুরীতে প্রবেশ করেন। কিন্তু উহা ছিল মৃত্যুর ডাক, প্রাসাদের পথে আসিতেই ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন!

মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর তিন দিন কাটিয়া গেল, মহারাজ সহসা এই কাহিনী শুনিতে পাইলেন। তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। যখন ভাল করিয়া জানিতে পারিলেন ইহা মহাদেবীর কার্য্য তখন রাণীকে নির্জ্জন অরণ্যে নির্ব্বাসনে পাঠাইলেন। পাটরাণীর পদ শূন্য হইল, নূতন পরিণয় দ্বারা তিনি শূন্যস্থান পূরণ করিলেন। শেষে পাত্রমিত্রের অনুরোধে সেই রাণীকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

(২)

বিজয়মাণিক্যের জয়ন্তী জয়

রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া বিজয়মাণিক্য দুর্জ্জয় সেনাবাহিনীর সৃষ্টিতে মন দিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সুযোগ পাইয়া সীমান্তের দেশগুলি মাথা উঁচু করিয়া উঠিতেছিল, ধন্যমাণিক্যের যে বাহুবলে নবাবের শক্তি এতদঞ্চলে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার পুনরভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। বাহিরে এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বিজয়মাণিক্যের হৃদয়ে বিজয় স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিত। যখন সেনাদল তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সামরিক কায়দায় গঠিত হইয়া গেল তখন বিজয়মাণিক্য দেশ জয়ে বাহির হইলেন।

শ্রীহট্ট অধিকারের প্রতি মনোযোগী হইয়া মহারাজ বিজয় ত্রিপুর সেনা পাঠাইয়া দিলেন। জয়ন্তীর রাজা তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যখন বেগতিক দেখিলেন তখন মহারাজের আনুগত্য স্বীকার করেন। জয়ন্তীর রাজা অনেক উপঢৌকন দিলেন, মহারাজ খুসী হইয়া তাঁহাকে সবৎসা একটী হস্তিনী ইনাম প্রদান করেন। জয়ন্তীরাজ নিজ রাজ্যে গিয়া প্রচার করিলেন—ত্রিপুরার মহারাজ রণে হারিয়া গিয়াছেন, একটি সবৎসা হস্তিনী নজর দিয়া কোনওরূপে প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। জয়ন্তী রাজ্যের এ সংবাদ গোপন রহিল না, এক

ব্রাহ্মণ আসিয়া মহারাজের কানে এ কথা তুলিলেন। মহারাজ বলিলেন—"ওঃ ইনাম হইয়া গেল নজর, আচ্ছা ভুল শোধরাইয়া দিতেছি।"

মহারাজ বিজয়মাণিক্য যুদ্ধের নামে এক প্রহসন করিলেন। জয়ন্তী উদ্দেশে চট্টগ্রাম হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত এক হাড়ীর দল সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা কোদাল খন্তী ও শূকর খেদান লাঠি লইয়া ডুগ্ ডুগি বাজাইয়া জয়ন্তী রাষ্ট্রে হানা দিল। জয়ন্তীরাজ ইহাতে লজ্জিত হইয়া হেড়ম্বরাজের আশ্রয় লইলেন। হেড়ম্বের সহিত ত্রিপুরার বহুকালের সম্বন্ধ। হেড়ম্বরাজ নির্ভয়নারায়ণ ত্রিপুরেশ্বরকে পত্র লিখিলেন—"ভাই ঘাট হইয়াছে, জয়ন্তীরাজ অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা চাহিতেছেন, হাড়ী সৈন্য দিয়া আর তাঁহাকে অপমান করিও না।" ত্রিপুরেশ্বর হেড়ম্বরাজের আহ্বানে হাড়ী সৈন্য ফিরাইয়া লইয়া শ্রীহট্টে কালনাজিরের অধীনে ত্রিপুর থানা বসাইয়া দিলেন।

(৩)

পাঠান বিদ্রোহ

বিজয়মাণিক্যের বিপুল সেনা মধ্যে একটি পাঠান ফৌজ গঠিত হইয়াছিল। চট্টগ্রামে মুসলমান শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল দেখিয়া বিজয়মাণিক্য দুই হাজার সৈন্য লইয়া স্বয়ং

যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে এক সহস্র পাঠান সৈন্য গিয়া মিলিত হইবে এইরূপ কথা রহিল। বিজয়মাণিক্য চলিয়া যাওয়ার পর পাঠানদের সহিত উজিরের ঝগড়া বাঁধিয়া গেল। রাজকোষ হইতে অর্থের ব্যবস্থা হইলেও বেতন বাকী পড়িয়াছিল, সেইজন্য পাঠানেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া উজিরকে মারিয়া ফেলে। উজিরের পুত্র প্রতাপনারায়ণ ভয়ে পলাইয়া গেলেন। উজিরের মৃত্যুর পর পাঠানেরা বিদ্রোহের জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিল, পূর্ব্ববঙ্গের এ অঞ্চলে যত পাঠান ছিল তাহাদের একত্র হইবার চেষ্টা চলিল। তাহাদের মধ্যে পরামর্শ হইল রাজধানী লুট করিতে হইবে এবং চট্টগ্রামের পথে বিজয়মাণিক্যকে অবরোধ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা অচিরেই মহারাজের কানে উঠিল, তখন বিজয়মাণিক্য সংহার মূর্ত্তি ধরিয়া স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং পাঠান সেনাকে ধরাশায়ী করিলেন। যাহারা প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিল তাহারা গৌড়ে যাইয়া নবাবের দরবারে লাঞ্ছনার কথা নিবেদন করিল।

বিজয়মাণিক্য পাঠান দলনের দ্বারা যেমন স্বরাজ্য নিষ্কণ্টক করিলেন তেমনি অমিত বিক্রমে নবাব সৈন্য পরাজিত করিয়া চট্টগ্রামের পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিলেন। চট্টগ্রাম হইতে বিতাড়িত হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে নবাবের অধিকার খর্ব্ব হইয়া পড়িল। নবাব সুলেমান বীর পুরুষ ছিলেন, উড়িষ্যা বিজয় দ্বারা তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সুতরাং ত্রিপুরেশ্বর হইতে তাঁহার পরাভব বিজয়ীর যশোরাশি ম্লান করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ নবাব নিজ শ্যালক মমারক খাকে সেনাপতি করিয়া দশ হাজার পদাতিক ও দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া চট্টগ্রাম জয় করিতে পাঠাইলেন। পাঠানবাহিনী ঝড়ের ন্যায় সহসা আসিয়া পড়িল, তজ্জন্য চট্টগ্রামে সেনা সন্নিবেশ পূর্ব্ব হইতে রাখা হয় নাই, কাযেই চট্টগ্রাম জয় করিতে পাঠানদের বেগ পাইতে হয় নাই। মমারক খাঁ সুলেমানের বিজয় কেতন চট্টগ্রামে উড়াইয়া দিলেন।

যখন বিজয়মাণিক্য ভগ্নদূত মুখে এ সংবাদ শুনিতে পাইলেন তখন তাঁহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সেনাপতিগণকে যুদ্ধ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে সসৈন্যে তাহাদিগকে রওয়ানা করাইলেন। সুদীর্ঘ আট মাস ধরিয়া চট্টল অবরোধ চলিল, কিন্তু পাঠান সেনানী মমারক খাঁকে তাহারা কিছুতেই হঠাইতে পারিল না। বিজয়মাণিক্য সেনাপতিদের অকৃত-কার্য্যতায় অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, বাহিরে এভাব প্রকাশ না করিয়া তাহাদিগকে চট্টগ্রাম হইতে ডাকাইয়া আনিলেন। রাজার ডাকে তাহারা যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া রাজধানীতে আসিয়া ভয়ে ভয়ে রাজদর্শন করিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্য যেমন বীর ছিলেন তেমনি রসগ্রাহী পুরুষও ছিলেন। জয়ন্তী রাজের সহিত রসিকতাই তাহার নিদর্শন। সেনাপতিদের নিয়া এইবার যে রসিকতা করিলেন তাহার তুলনা ইতিহাসে অল্পই দেখা

যায়। ভীত সেনাপতিগণকে সম্বোধন করিয়া মহারাজ বলিলেন, "চট্টল সংগ্রামে তোমাদের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া পুরস্কারস্বরূপ আমি তোমাদিগকে এক একটি চরখা দিতেছি,



পুরস্কার স্বরূপ আমি তোমাদিগকে এক একটি চরখা দিতেছি

অস্ত্র ফেলিয়া তোমরা নিজ নিজ ঘরে যাও, ঘরে গিয়া চরখা কাটায় মন দাও।" সেনাপতিরা মাথা নীচু করিয়া রহিল। তখন এক একটি চরখা দিয়া তাহাদিগকে রাজদ্বার হইতে বিতাড়িত করা হইল।

(৪)

গৌড়াধিপের পরাজয়

জয়ন্তী যুদ্ধের পর শ্রীহট্টে কালনাজির স্থাপিত হইয়াছিল—এইবার কালনাজিরের ডাক পড়িল। কালনাজির বীর পুরুষ। মহারাজ তাঁহাকে প্রধান সেনাপতিরূপে চট্টলে পাঠাইয়া দিলেন। কালনাজির আসিয়া দেখেন ত্রিপুর সৈন্যের মধ্যে বড়ই উৎসাহের অভাব, সেনাপতিদের উঠাইয়া নেওয়ায় ইহারা দমিয়া গিয়াছিল। কালনাজির সৈন্যগণকে চাঙ্গা করিয়া তুলিলেন। তারপর ভীষণ সংগ্রাম বাঁধিল। নাজিরের আগমনে পাঠান সৈন্য কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধে নামিল—অস্ত্রের ঝনৎকার ও বন্দুকের আওয়াজে কানে তালা লাগিয়াছিল। রক্ত নদী বহিয়া গেল, হাতিগুলি কালো মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্র ছাইয়াছিল এবং মেঘনাদের ন্যায় মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতেছিল। নাজির সেনাপতি রণমদে মত্ত হইয়া ত্রিপুর সৈন্যের পুরোভাগে থাকিয়া যুদ্ধ চালনা করিতেছিলেন, তখন সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়াছে এমন সময়ে পাঠানের অস্ত্রাঘাতে নাজির প্রাণত্যাগ করিলেন। সেনানীর মৃত্যুতে ত্রিপুর সৈন্যের বিজয় উল্লাসে বাধা পড়িয়া গেল, পাঠানের জয়ধ্বনিতে দিগন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। ত্রিপুরসেনা সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় যে গা ঢাকা দিল তাহার খোঁজ পাঠানেরা আর লইল না। রণশ্রান্ত হইয়া তাহারা

গড়ের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া আহার বিহারে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

এদিকে ত্রিপুরসেনা শৈলমালার নীচে জমাট বাঁধিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—এখন উপায়? পরাজিত হইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিলে সকলেরই মাথা কাটা যাইবে, তার চাইতে এখানেই প্রাণ দেওয়া ভাল। এইরূপ মরিয়া হইয়া তাহাদের দলপতি এক ফন্দী আঁটিল, গড়ের যে দিকটা পাহাড়ের গায়ে ঠেকিয়া আছে এবং দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া মাত্র জন কয় প্রহরী রহিয়াছে, তাহার নীচ দিয়া এক সুড়ঙ্গ কাটিয়া একেবারে গড়ের প্রবেশ-পথে পৌঁছান যাইবে। আজ রাত্রেই সুড়ঙ্গ করিয়া গড়ে প্রবেশ করিতে হইবে কারণ পাঠানেরা বুঝিয়াছে ত্রিপুর সৈন্য দেশে পলাইয়াছে, তাই নিশ্চিন্ত মনে গভীর নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িবে। যেমন কথা তেমনি কায! তিন হাজার সৈন্য সুড়ঙ্গ খনন করিতে লাগিয়া গেল, আর ঐদিকে শ্রান্ত পাঠানেরা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে লাগিল। গভীর অন্ধকারের মধ্যে ত্রিপুরসেনা পিঁপড়ার স্রোতের ন্যায় পিল্ পিল্ করিয়া সুড়ঙ্গ মুখে একেবারে দুর্গদ্বারে উপস্থিত! যে প্রহরীরা পাহারায় ফিরিতেছিল, তাহারা ব্যাপার বুঝিবার পূর্ব্বেই নিহত হইয়া গেল। তখন মুক্ত দ্বার পথে ত্রিপুরসেনা গড়ের মধ্যে ঢুকিতে লাগিল, ভিতরের প্রহরীরা এই কাণ্ড দেখিয়া দামামা পিটিয়া দিল। তখন এক মহা সোরগোল উঠিল। যে দিকেই পাঠান চোখ কচ্‌লাইয়া জাগিয়া



তখন মুক্ত দ্বার পথে ত্রিপুরসেনা গড়ের মধ্যে ঢুকিতে লাগিল

উঠে সেদিকেই ত্রিপুর সেনা যমের ন্যায় তাহার শিয়রে দণ্ডায়মান। এ অবস্থায় আর যুদ্ধ কি হইবে? গড় দখল হইয়া গেল, মমারক খাঁ বন্দী হইলেন।

চট্টল অধিকার হইয়া গেলে পাঠানশিবিরের ধনরত্ন মহারাজের ভেট স্বরূপ সংগৃহীত হইল, তাহার মধ্যে পাঁচশত সোণার কুমড়া ছিল, হাতী ঘোড়ার ত কথাই নাই। বিজয়ী ত্রিপুর সৈন্য সগর্ব্বে রাজধানী প্রবেশ করিল। বিজয়মাণিক্য মমারক খাঁকে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ঘটনাচক্রে মমারক খাঁ নিহত হন। পাঠান সেনার পরাজয়ে বিজয়মাণিক্য যেমনি বিজয় তিলক পরিলেন, গৌড়েশ্বর তেমনি মরমে মরিয়া গেলেন। যুদ্ধের সাতদিন পরে গৌড়ের নবাব সুলেমান মহারাজকে চিঠি দিলেন, "ভাই, বিরোধ ভুলিয়া যাও—তুমি আমার সখা; পদ্মার ঐপার অবধি যাত্রাপুর প্রভৃতি দেশ তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া উভয় রাজ্যের সীমানা নির্দ্ধারণ করিব। মমারক খাঁকে মুক্তি দাও ইহা আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।"

ত্রিপুরেশ্বর সোণার পাতে মুড়াইয়া নবাবের পত্রোত্তর পাঠাইলেন, মমারক জীবিত নাই, এজন্য প্রত্যর্পণ করিতে না পারায় বড়ই দুঃখিত।

(৫)

বিজয়মাণিক্যের জয়যাত্রা

দিল্লীর সিংহাসনে আকবর সমাসীন—মোগল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সুতরাং পাঠানের দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিল। বঙ্গদেশ জয়ের পরিকল্পনা চলিতে লাগিল, গৌড়ের নবাব সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। বিজয়মাণিক্য এই সুযোগে অভিযান যাত্রার আয়োজন করিলেন। শুভ দিনে অভিযান যাত্রা করিল। বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় দিন। এই বিজয় বাহিনী ছাব্বিশ হাজার পদাতিক, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, কতিপয় গোলন্দাজ ও পাঁচ হাজার নৌকা লইয়া গঠিত হইয়াছিল। জলে স্থলে ত্রিপুরসেনা অজেয় হইয়া দেশদেশান্তর অবলীলাক্রমে জয়স্রোতে ভাসাইয়া ঢাকা জিলার সোণার গাঁয়ে পৌঁছিল। সুবর্ণগ্রামে নবাবের ফৌজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। সুবর্ণ গ্রামে প্রথম উপনিবেশের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং তথাকার ব্রহ্মপুত্রে লাঙ্গলবন্ধ স্নানের ইতিহাসও বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে যাইয়া বিজয় মাণিক্যের লাঙ্গলবন্ধ স্নানের অভিলাষ হইল এবং স্নান কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইল। প্রথমে মহারাজ ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলেন, যেখানে পরশুরাম ধ্বজ আরোপণ করিয়াছিলেন সেইখানে ত্রিপুরেশ্বরের ধ্বজ আরোপিত হইয়াছিল। সোণার নিশান উড়িতে লাগিল, মহারাজ ধ্বজঘাটে দানে বসিলেন।

বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিষ্ণু প্রীত্যর্থে সোণা দান করা হইল। তারপর ব্রাহ্মণকে পাঁচদ্রোণ জমি ধ্বজঘাটের সমীপে দেওয়া হইল, সেইস্থান আজিও "পাঁচ দোনা" নামে প্রসিদ্ধ। তারপর মহারাজ লক্ষ্যা ও পদ্মাতে স্নান তর্পণ করিয়াছিলেন।

পদ্মাতীরে মহারাজ কিছুকাল বজরায় বাস করিতেছিলেন এবং শরীররক্ষী প্রহরীরা চড়ের উপর পাহারা দিতেছিল। এমন সময় দূরে এক গাছের উপরে দুইজন লুকাইয়া আছে এইরূপ দেখিতে পাইয়া সন্দেহে তাহাদিগকে ধরা হয় এবং বিজয়মাণিক্যের সমীপে আনা হয়। অনুসন্ধানে জানা যায় ইহারা গৌড়ের নবাবের প্রেরিত চর, মহারাজের কোন অনিষ্ট অভিপ্রায়ে আসে নাই, ত্রিপুর সৈন্যেরা দেখিতে কিরূপ, ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র কি আকারের, ঘোড়া চড়ার রীতি কেমন এগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া নবাবের গোচর করার জন্যই নবাব পাঠাইয়াছেন। মহারাজ এই কথা বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগকে গৌড়ে যাইতে দিলেন, প্রাণে মারিলেন না। ইহাতে বিজয়মাণিক্যের গভীর উদারতা প্রকাশ পায়।

সোণার গাঁ জয়ের পর ত্রিপুর সেনা বিক্রমপুর পরিক্রমণ করিয়া আসিল, তথাকার বাঙ্গালীর শীর্ষসমাজ মহারাজকে নতশির হইয়া অভিনন্দন জানাইল। তৎপর বিজয়বাহিনী শ্রীহট্ট অঞ্চল ঘুরিয়া স্বদেশে ফিরিল। বিজয়মাণিক্যের জয় যাত্রা সত্য সত্যই জয়যুক্ত হইয়াছিল। ফিরিবার পথে মহারাজ

বর্ত্তমান কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত ঊনকোটি তীর্থ পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন—তুলাপুরুষ, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর বিবিধ কীর্ত্তির সহিত তাঁহার নাম জড়িত। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া মহারাজ বিজয়মাণিক্য সগৌরবে সুদীর্ঘ ৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন। ত্রিপুরার সিংহাসনে তিনি যখন সমাসীন তখন দিল্লীর তক্তৃতাউসে ভাগ্যবিপর্য্যায় ঘটিয়া হুমায়ুন সরিয়া গেলেন, শেরসাহ বসিলেন, পুনরায় নিয়তির চক্রে পাঠান শাসন অন্তে হুমায়ুন আসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আকবর প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজপুতানার ইতিহাসে এই সময় উদয়সিংহ ও প্রতাপসিংহের আবির্ভাব কাল। এই ভাবে ভারত ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে বিজয়মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিজয়মাণিক্যের খ্যাতি যে আকবর বাদসাহের দরবারেও পৌছিয়াছিল তাহার প্রমাণ 'আইনী আকবরী' গ্রন্থ। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুলফজল বিজয়মাণিক্যের নামের সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন, তদীয় আইনী আকবরী গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"ভাটী প্রদেশের (হুগলী নদীর তীর হইতে মেঘনার তীর পর্য্যন্ত) সহিত সংলগ্ন একটি স্বাধীন রাজ্য আছে। সেই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা, রাজার নাম বিজয়মাণিক্য। যিনি রাজা হন তিনিই নামের অন্তে "মাণিক্য" উপাধি ধারণ করেন।

সেই রাজ্যের আমীর ওমরাহগণ "নারায়ণ" উপাধি পাইয়া থাকেন। এই রাজার দুই লক্ষ পদাতি ও এক সহস্র হস্তী আছে কিন্তু অশ্ব অতি বিরল।* "বিজয়মাণিক্যের পরলোক গমনের বৎসর রলফ ফিচ্ নামে এক পাশ্চাত্য পর্য্যটক এতদঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এইরূপ উল্লেখ আছে:—"সাতগাঁও হইতে আমি ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যের মধ্য দিয়া চট্টগ্রামে গমন করিয়াছিলাম।" †

বিজয়মাণিক্যের জীবন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, তিনি জ্যোতিষ গণনায় একান্ত আস্থাবান্ ছিলেন। একদিন তাঁহার দুই পুত্রের কোষ্ঠীর ফল বিচারে দেখিলেন জ্যেষ্ঠের কোষ্ঠীতে অঙ্গচ্ছেদ যোগ রহিয়াছে ও কনিষ্ঠের রাজযোগ রহিয়াছে। পাছে দুই ভাইয়ে রাজ্য লইয়া যুদ্ধ বাঁধে এই ভয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। যাহাতে কুমার সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে সেই জন্য সেখানে ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ন দিলেন। কুমারকে বুঝাইয়া দিলেন, তুমি সেখানে থাকিয়া জগন্নাথ সেবা করিবে, এই আমার অভিপ্রায়। পিতৃভক্ত পুত্র পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সিংহাসনের মমতা ছাড়িয়া সুদূর উড়িষ্যায় চলিয়া গেলেন। এদিকে রাজার কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত ক্রমে বড় হইলেন। প্রধান

* কৈলাস সিংহের রাজমালা হইতে উদ্ধৃত।

† From Satagaon I travelled by the country of the King of Tippara—Ralph Fitch—কৈলাস সিংহের রাজমালা।

সেনাপতি গোপীপ্রসাদ নারায়ণের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মহারাজ হয়ত ভাবিয়াছিলেন তাঁহার অবর্ত্তমানে অনন্ত ইঁহার নিকট সহায়তা পাইবেন কিন্তু ঘটনা দাঁড়াইল অন্যরূপ !

(৬)

অনন্তমাণিক্য

বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিপুরার রাজলক্ষ্মী যেন কিছুকালের জন্য অন্তর্হিতা হইয়া গেলেন। তাঁহার গৌরবে ত্রিপুরার যে আসন আকাশে উঠিয়াছিল তাঁহার জীবনান্তের সঙ্গেই উহা যেন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। অনন্ত-মাণিক্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন বটে কিন্তু গোপী-প্রসাদই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন।

দৈত্যনারায়ণের পুনরভিনয় চলিল। অনন্তমাণিক্যের দুর্ব্বলতা চরমে পৌঁছিল, এমন কি আহার বিষয়েও তিনি স্বাধীন ছিলেন না, শ্বশুরের গৃহে যাইয়া খাইয়া আসিতেন। তাহাতে এইরূপ ধারণা জন্মিল যেন শ্বশুর খাইতে দেন বলিয়া তিনি খাওয়া পান। গোপীপ্রসাদের কন্যা বয়সে কচি হইলেও বুদ্ধিমতী ছিলেন। রাজাকে বলিলেন---শ্বশুরঘরে কে নিত্য খায় ? রাজার পক্ষে খাওয়া ত কিছুতেই শোভে না। দুর্ব্বল অনন্তমাণিক্য উত্তর করিলেন—"না খাইয়া উপায় কি ? যখন

পিতা এঁর হাতে আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন তখন এঁর শাসনের বাহিরে যাই কি করিয়া?" এইরূপ বাক্যে রাণী ব্যথিতা হইলেন, ইহা কি রাজবাক্য? রাজার দুর্ব্বলতায় গোপীপ্রসাদ বুঝিলেন রাজা তাঁহার মৃত্যুর মধ্যে, সিংহাসন ও তাঁহার মধ্যে ব্যবধান যাহা কিছু তাহা এরই জন্য, একে সরাইতে পারিলে রাজমুকুট হেলায় তাঁহার মাথায় আসিয়া পড়িবে।

অনন্তমাণিক্যকে মারিবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিল, গোপীপ্রসাদ কংসের ন্যায় বধের উপায় ভাবিতে লাগিলেন। গদা ভীম নামক মল্লের নিকট অনন্তমাণিক্যের মল্লবিদ্যা শিখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। গোপীপ্রসাদ একে ইঙ্গিত করিলেন মল্লবিদ্যা অভ্যাসের ফাঁকে সহসা এর শ্বাস রোধ করিতে হইবে। কিন্তু গদা ভীম ইহাতে কিছুতেই রাজি হয় নাই। অবশেষে নিজ ভাগিনেয় মর্দ্দন নারায়ণকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। মর্দ্দনের হাতেই অনন্তমাণিক্যের জীবনান্ত ঘটিল। অনন্তমাণিক্যের রাজত্বকাল অতি অল্প।

অনন্তমাণিক্যের বধ সাধন করিয়া ম্যাকবেথের ন্যায় গোপীপ্রসাদ উদয়মাণিক্য নাম-ধরিয়া ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজপাটে বসিলেন। বিধবা রাণী অনন্তমাণিক্যের সহমরণ ইচ্ছা করিলে গোপীপ্রসাদ বাধা দেন। তখন রাণী পিতাকে তীব্র ভাষায় কটূক্তি করিলেন "তুমি রাজহন্তা, তোমার গতি ক্ষুরধার নরক।" এই বলিয়া রাণী রাজসিংহাসন দাবী করিলে গোপী-প্রসাদ রাজপাট উদয়পুরের সন্নিকটস্থ চন্দ্রপুর গ্রামে তুলিয়া নেন

এবং নিজ নামে "উদয়পুর" নামকরণ করেন, ইহার পরিমাণ চারি দ্রোণ চারিকাণি ভূমি। সেইখানে এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া চন্দ্রগোপীনাথ নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করেন।

ত্রিপুরারাজ্যে ম্যাকবেথের শাসন প্রবর্ত্তিত হইল- পবিত্র রাজবংশের ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হইল, গোপীপ্রসাদের অত্যাচারের সীমা রহিল না, নারী হরণে, ইহার নামে সকলে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল ত্রিপুরা রাজ্যের এই দুর্দ্দশার কাহিনী যথাসময়ে গৌড়েশ্বরের কানে উঠিল। মমারক খাঁর মর্ম্মান্তিক মৃত্যু ও চট্টলের পরাভব কাহিনী গৌড় ভুলিতে পারে নাই। এই সুযোগে পুনরায় চট্টল আক্রমণের জল্পনা কল্পনা চলিল।

(৭)

উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্য

গৌড়ের অভিযানবার্ত্তা শুনিয়া উদয়মাণিক্য গৌড় সেনার পথরোধ করিবার মানসে খণ্ডলে রণাগণ নারায়ণের অধীনে এক বিপুল ত্রিপুর বাহিনী পাঠাইলেন। প্রধান সেনাপতি রণা খণ্ডলে এক গড়ঘাই করিয়া ত্রিপুর সৈন্যের শিবির স্থাপন করিলেন, তাহাতে ৫২ হাজার সৈন্যের সমাবেশ হইল। রণার অধীনে চন্দ্রদর্প, চন্দ্রসিংহ, উড়িয়া, গজভীম প্রভৃতি অনেক

সেনাপতি ছিলেন। সমর সজ্জা যে উৎকৃষ্ট আদর্শের হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য কিন্তু অধর্ম্মের মূর্ত্তি উদয়ের মধ্যে লক্ষ্মীর চিহ্ন মাত্রও ছিল না। সুতরাং শ্রীহীন ত্রিপুর সৈন্যের মধ্যে যতই দম্ভ প্রকাশ পাউক না কেন, গৌড়ের আক্রমণ ইহারা প্রতিরোধ করিতে পারিল না। গৌড়সেনা জয়োল্লাসে ত্রিপুর সেনার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, ভীষণ যুদ্ধের পর ত্রিপুর গড় গৌড়ের হস্তগত হইল। মুসলমানদের মাত্র পাঁচ হাজার হত হইল কিন্তু ত্রিপুর সৈন্যের হত সংখ্যা হইয়াছিল চল্লিশ হাজার। নবাব এই সংবাদ শুনিয়া বাছাই বাছাই যোদ্ধা চট্টগ্রাম অধিকারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। পীরোজ খাঁ, জামাল খাঁ প্রভৃতি সদর্পে ত্রিপুর সৈনা দলনে আসিয়া পড়িলেন। চট্টগ্রামের পথে উড়িয়া নারায়ণ তাহাদিগের গতি রোধ করিলে কামানের গোলায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। চট্টগ্রাম অধিকার লইয়া ভীষণ যুদ্ধ ইহার পর পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল।

এদিকে অত্যাচারী উদয়ের প্রাণ নাশের জন্য ষড়যন্ত্র চলিল, অবশেষে এক দাসীর চক্রান্তে ইহার প্রাণবিয়োগ হয়।

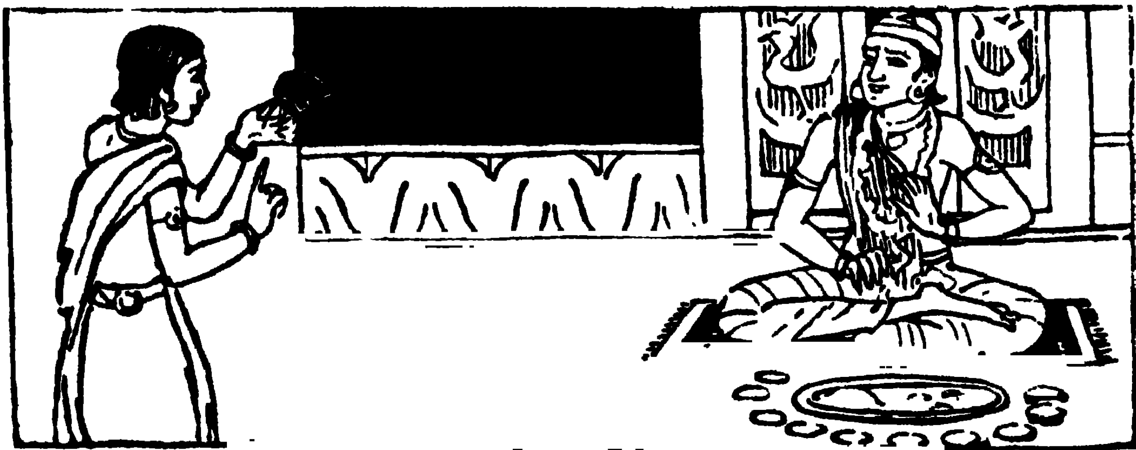
উদয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জয়মাণিক্য ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। জয়মাণিক্যের কিছুমাত্র বলবীর্য্য ছিল না, তাই গৌড় যুদ্ধ হইতে পিসা রণাকে আনাইলেন। প্রধান সেনাপতি রণার ভয়ে সকলেই থরহরি কম্পমান, দুর্ব্বল জয়মাণিক্য অনায়াসে তাঁহার হাতের মুঠোর ভিতর আসিয়া পড়িলেন। জয়ের নামে রণাই প্রকৃত প্রস্তাবে

রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। রণা প্রাচীন ছিলেন বলিয়া "বুড়া" নামে আখ্যাত হইতেন, স্বীয় নামে উদয়পুরে এক দীঘি খনন করেন, ইহা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের উত্তর দিকে অবস্থিত। এই দীঘি উৎসর্গের পর রণার রাজ্যলালসা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। জয়মাণিক্যকে সরাইয়া নিজের রাজমুকুট পরিবার সাধ হইল কিন্তু তাঁহার পত্নী দুই হাতে এই কুপ্রবৃত্তিকে রোধ করিতে লাগিলেন। রণা বেগতিক দেখিয়া বুড়া বয়সে আবার দার পরিগ্রহ করিলেন এবং নূতন স্ত্রীর সহিত রাজ্যলাভের নানা যুক্তি ফাঁদিতে লাগিলেন। হায় তৃষ্ণা, ইহা বুড়াশরীরেও তরুণ থাকিয়া যায়! রণা রাজস্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিতেন। জয়মাণিক্যকে সরান যে কঠিন হইবে না ইহা বেশ বুঝিতেন কিন্তু সিংহাসনের প্রধান কণ্টক ছিলেন অমর। রণার চক্ষু তাঁহার উপর পড়িল।

অমর দেবমাণিক্যের সন্তান। একদা দেবমাণিক্য বজরায় ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, চট্টগ্রামের পথে এক হাজরার সুন্দরী কন্যা দেখিয়া মোহিত হন, সেই হাজরা ছিলেন ফৌজদার। দেবমাণিক্যের নিকট কন্যার বিবাহ প্রস্তাব শুনিয়া তিনি সম্মত হন। সেই পরিণয়ের ফলে অমরের জন্ম হয়। সুতরাং অমর বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা। অমর প্রাপ্তবয়স হইয়া সেনাদলে প্রবেশ করেন এবং ক্রমে সেনাপতির পদে উন্নীত হন। গৌড়সৈন্যের সহিত যুদ্ধে অমরের কৃতিত্ব রণার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অমর দেখিতেছিলেন তাঁহার পিতৃসিংহাসন কিরূপে

সেনাপতির হাতে চলিয়া গিয়াছে, কিরূপে পৈত্রিক অধিকার ফিরিয়া পাওয়া যায় তজ্জন্য ভিতরে ভিতরে তীব্র ভাব পোষণ করিতেন। রণা সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিতে যাইয়া জয়মাণিক্য হইতে অমরকেই প্রথমে সরান কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

যে সময়ে অমর কল্‌মিগড়ের সেনানায়ক ছিলেন তখন সহসা একদিন রাজ-আহ্বান আসিয়া উপস্থিত—অমরকে রাজধানী আসিতে হইবে। অমর গড় ছাড়িয়া উদয়পুর আসিয়া পৌঁছিলেন। তোরণ দ্বারে পৌঁছিতেই তিনি জয়মাল্যে ভূষিত হইলেন এবং প্রধান সেনাপতির গৃহে ভোজনের আমন্ত্রণ পাইলেন। অমর ত অবাক! এত সম্মানের কারণ কি? ভিতরে ভিতরে তাঁহার একটু সন্দেহ হইল। যখন রণার গৃহে আসিলেন তখন দেখিলেন সেখানেও সম্মানের চূড়ান্ত হইল। তাঁহাকে



অমর বুঝিতে পারিলেন বোঁটার ন্যায় তাহার গলা দেহ হইতে পৃথক করিবার জন্য আয়োজন হইয়াছে।

বুঝাইয়া দেওয়া হইল তাঁহার বীরত্বে রণা মুগ্ধ হইয়াছেন

ভোজন কক্ষে ঢুকিয়া যখন আহারে বসিবেন এমন সময় দূরে তাঁহার এক প্রিয় সখাকে দেখিতে পাইলেন। সখা অমরকে অঙ্গুলি দ্বারা "সাবধান" এইরূপ সঙ্কেত করিয়া একটি পানের বোঁটা পান হইতে খসাইয়া ফেলিলেন। অমর বুঝিতে পারিলেন বোঁটার ন্যায় তাঁহার গলা দেহ হইতে পৃথক করিবার জন্য আয়োজন হইয়াছে। অমর শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু বিপদে সাহস হারাইলেন না। রণার নিকট কহিয়া উঠিলেন—"আমার সহসা বাহ্যের বেগ হইয়াছে, পায়খানায় এক্ষুণি যাওয়া দরকার।" ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রণা অমরকে পায়খানা দেখাইবার জন্য লোক সঙ্গে দিলেন। অমর পায়খানার পথে দেওয়াল টপ্‌কাইয়া কখন যে প্রস্থান করিলেন, সেবক জানিতে পারিল না। ভোজনশালায় রণা পার্শ্বচর সহ অমরের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

ওদিকে অমর ঘোড়াশালে অলক্ষিতে ঢুকিয়া ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া নিজ গড়ে পৌছিলেন। নিজের সৈন্যের নিকট ষড়যন্ত্রের কথা ব্যক্ত করিয়া পিতৃসিংহাসনের তিনিই যে ন্যায্য উত্তরাধিকারী তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার নিকট শপথ গ্রহণ করিল, এতদিনে অমরের ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল। সিংহাসন অধিকারের জন্য অমর বন্ধুগণ সহ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। রণার ভাই ছিলেন সমরজিৎ নারায়ণ। সমরজিৎ রণার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। যখন রণা অমরের পলায়ন কাহিনী ও যুদ্ধ সজ্জার বিষয় জানিলেন তখন নিজ দুর্গে তিনিও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ভ্রাতা সমরজিৎকে তিনি আসন্ন

বিপদের কথা জানাইয়া তাঁহার সহিত অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিবার জন্য এক গুপ্ত পত্র দিলেন। অমরের গুপ্তচর চারিদিকে ছড়ান ছিল, রণার পত্র-বাহক গুপ্তচরের হাত এড়াইতে পারিলনা। অমর তখন নদীতীরে চৌহাট্টা দুর্গে যুদ্ধের আয়োজন করিতে ছিলেন এমন সময় পত্রসহ ধৃত পত্রবাহককে তাঁহার নিকট আনা হয়।

অমর রণার পত্র পড়িয়া দেখিলেন মস্ত সুযোগ উপস্থিত। পত্রবাহককে বন্দী করিয়া তাঁহার একজন সুদক্ষ সেনাপতিকে ঐ ভৃত্যের পোষাক পরাইয়া দিলেন, কুর্ত্তার ভিতরে খুরধার অস্ত্র লুকান রহিল। ভৃত্যবেশী সেনাপতি সমরজিৎ-ভবনে রণার পত্রের কথা জানাইল। সমরজিৎ তখন বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন, পত্রবাহক হইতে পত্র লইয়া সমরজিৎ দেখিলেন রণার হাতের লেখা, পত্রখানি মাথায় ঠেকাইয়া পত্র পাঠে মন দিলেন। সেই সুযোগে সেনাপতি সমরজিতের গলা কাটিয়া ফেলিল। সমরজিতের মৃত্যু চক্ষের পলকে হইয়া গেল, বাহিরের লোক বড় একটা জানিতে পারিল না। সমরজিতের ছিন্ন মুণ্ড নানা কৌশলে রণার দুর্গে নিক্ষেপ করা হয়। যখন রণা ভ্রাতার ছিন্নমুণ্ড দেখিতে পাইলেন তখন বুঝিতে পারিলেন ইহা অমরের কার্য্য। ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া তিনি মনে করিলেন অমর ইতিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতার দুর্গ অধিকার করিয়াছেন নতুবা ভাই মরিল কি করিয়া? সমরজিতের মৃত্যুতে তাঁহার ডান হাত খসিয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে বর্ষার দুর্ব্বার ধারার ন্যায় অমরের সৈন্যগণে চতুর্দ্দিক ছাইয়া গেল। নিরুপায় দেখিয়া রণা রজনী যোগে পলায়ন করিলেন, প্রাণভয়ে এক জলাশয়ে ডুবিয়া রহিলেন কিন্তু অচিরেই ধরা পড়িলেন। অমরের আদেশে তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলা হয়। রণা অমরকে সরাইতে চাহিয়া নিজেই সরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ভীরু জয়মাণিক্য রণার মৃত্যুতে বুঝিলেন যে তাঁহার দিনও ফুরাইয়াছে তাই পলায়নের পথ খুঁজিলেন। সত্যই তাঁহার পরমায়ু ফুরাইয়াছিল, মল্লশালায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। জয়মাণিক্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুর সিংহাসনে ক্রমওয়েল যুগ বা সেনাপতির অধিকার ফুরাইয়া গেল। ত্রিপুরা রাজ্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

অমরসাগর খননে অমরমাণিক্য

১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে শুভদিনে অমরমাণিক্যের রাজ্যাভিষেক হইয়া গেল। এই বীরপুরুষের বাহুবলে বংশের নষ্ট-গৌরব পুনরায় ফিরিয়া আসিল, শুধু এই কারণেই তাঁহার নাম ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তিনি বয়স্ক হইয়া রাজপদে সমাসীন হন—তাঁহার চারিপুত্র সকলেই নারায়ণ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম রাজদুর্লভ, রাজধর, অমর

দুর্লভ ও যুঝা সিংহ বীর। তাঁহার রাজ্যলাভ স্মরণীয় করিবার জন্য তিনি 'অমরসাগর' খনন করান। আজিও রাজসিংহের রাজসমুদ্রবৎ 'অমরসাগর' তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহা উদয়পুরে অবস্থিত। অমরপুরেও ইঁহার নামে এক সাগর আছে। উদয়পুরের পূর্ব্বদিকে পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'অমরপুর' অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সেখানে অমরমাণিক্য নির্ম্মিত ত্রিতল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান্। অমরসাগর খনন উদ্দেশ্যে তাঁহার অধীনস্থ জমিদারবৃন্দকে লোক পাঠাইবার জন্য আমন্ত্রণ দেওয়া হয়। শুভদিনে দীঘির খনন কার্য্য আরম্ভ হয়। মহারাজের কৌতূহল হইল কোন্ জমিদার কিরূপ লোক দিয়াছেন। ইহা জানিতে চাহিলে সুবুদ্ধিনারায়ণ তাঁহাকে এইরূপ বলেন-- "বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদরায় দিয়াছেন ৭০০, বাকলার বসু ৭০০, গোয়ালপাড়ার গাজি ৭০০, ভাওয়াল জমিদার ১০০০, বানিয়াচঙ্গ হইতে ৫০০, সরাইলের ঈশা খাঁ ১০০০, ভুলুয়া হইতে ১০০০, ইহাদের মধ্যে কেহ ভয়ে কেহ বা প্রীতির সহিত এ লোক সংখ্যা পাঠাইয়াছেন কিন্তু শ্রীহট্টের তরপ হইতে কোন উত্তরই পাওয়া যায় নাই।"

এই কথায় তরপের উপর মহারাজের ক্রোধ হইল, রাজাদেশ অমান্য হইয়াছে বলিয়া ইহার জমিদারকে শিক্ষা দিবার জন্য কুমার রাজধর ২২,০০০ সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। ত্রিপুর সৈন্যের আগমনে জমিদার তরপ ছাড়িয়া শ্রীহট্টের

পাঠান শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁর আশ্রয় লইল। এই সংবাদে অমরমাণিক্য স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন। কথিত আছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে অমরমাণিক্য গরুড়ব্যূহ রচনা করেন। পুরোভাগে দুই সেনাপতি হইল গরুড়ের চঞ্চু, উভয় পার্শ্বস্থ সেনা হইল গরুড়পক্ষ আর হস্তী অশ্ব রহিল ভিতরে, তাহা যেন গরুড়ের উদর। বিশাল গজারূঢ় হইয়া অমর ব্যূহের পৃষ্ঠদেশে রহিলেন। যুদ্ধে ফতে খাঁ হারিয়া গেলেন, পাঠানের হাত হইতে শ্রীহট্ট খসিয়া পড়িল। ত্রিপুরার বিজয়কেতন শ্রীহট্টে উড়িল। কুমার রাজধর ফতে খাঁকে লইয়া উদয়পুর পৌঁছেন। ফতে খাঁর প্রতি অমরমাণিক্য অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করেন, নানা উপহার দিয়া তাঁহাকে বিদায় করা হয়।

তৎপর ভুলুয়া বিগ্রহ উপস্থিত হয়।* ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বিজয়মাণিক্য ভুলুয়া অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর যখন উদয় সিংহাসন অধিকার করেন তখন ভুলুয়ার শাসনকর্ত্তা উদয়কে রাজা মানিতে অস্বীকার করে, সেই হইতে

* সংস্কৃত রাজমালা পাঠে জানা যায় ৬১০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ের প্রাতঃস্মরণীয় নরপতি আদিশূরের বংশধর রাজা বিশ্বম্ভর শূর পোতারোহণে চন্দ্রনাথে আসিতে চেষ্টা করিয়া নাবিকগণের দিক্‌ভ্রমে নোয়াখালি জিলার ভুলুয়া গ্রামে (ভুল হুয়া হইতে ভুলুয়া নাম হইয়াছে) উপনীত হইয়াছিলেন।—স্বর্গীয় হরকিশোর অধিকারী সম্পাদিত 'চিত্রে চন্দ্রনাথ' ৮ পৃঃ।

ভুলুয়া ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। যখন অমরমাণিক্য ভুলুয়া বশে আনিতে চাহিলেন তখন ভুলুয়াপতি অমরকে নীচপদ হইতে রাজপদে উন্নীত বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ইহাতে অমরমাণিক্যের রোষানল জ্বলিয়া উঠিল। ভুলুয়া জয়ে মহারাজ স্বয়ং চারি কুমার ও ৩৬ হাজার সৈন্যসহ যাত্রা করেন। ভুলুয়া জয়ে বেগ পাইতে হয় নাই কিন্তু ঐ যুদ্ধে ভ্রমক্রমে ব্রাহ্মণ বধ হওয়ায় অমরমাণিক্য যার পর নাই ব্যথিত হন এবং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন। ভুলুয়া জয়ের পর মহারাজ বাকলা আক্রমণ করেন। সে সময় বাকলা চন্দ্রদ্বীপ ঐশ্বর্য্যশালী রাজ্য ছিল, সেই যুদ্ধে বাকলাধিপতি কন্দর্পরায় নিহত হন। বাকলা জয়ে অমরমাণিক্যের ধনাগার সমৃদ্ধ হয়।

ইতিমধ্যে অমরসাগর খনন কার্য্য সমাধা হয়। শুভদিনে মহারাজ অমর-সাগর পারে বসিয়া ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণযোগে অমরসাগর উৎসর্গ করেন। তখন ভূম্যাদি ষোড়শ দান অনুষ্ঠিত হয়। তারপর প্রস্তরের এক মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই উপলক্ষে নৃত্য গীতে রাজধানী মুখরিত হইয়াছিল, মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে মহারাজ তাম্রশাসন দ্বারা চতুর্দ্দশ গ্রাম উৎসর্গ করেন, উহা বর্ত্তমানে চৌদ্দগ্রাম পরগণায় পরিগণিত হইয়াছে। বার মাসে তের পর্ব্ব উৎসব চলিতে লাগিল—উৎসবে ব্রাহ্মণ-ভোজনের বিপুল আয়োজন হইত। এই ভাবে পূজা পার্ব্বণে ষোড়শ দানে ও তুলাপুরুষে তাঁহার নির্ম্মল যশঃ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে তাঁহার সভাগৃহে দুই শত ব্রাহ্মণ সমবেত থাকিতেন, মহারাজ অমরমাণিক্য বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ইহাদের সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন।

(৯)

অমরমাণিক্যের সেনাপতি ইষা খাঁ

অমরমাণিক্য ধর্ম্মকর্ম্মে তৎপর হইয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন কিন্তু রাজাদের ভাগ্য প্রজার ভাগ্যের সহিত জড়িত, তাই ধর্ম্মকার্য্য লইয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তিভোগ ঘটিয়া উঠে না। আবার এক উৎপাত দেখা দিল। বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ইসলাম খাঁ ঢাকা নগরীতে নিজ রাজপাট স্থাপন করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি করিতেছিলেন। বিজয়মাণিক্যের সময় সোণার গাঁ হইতে পাঠান বিতাড়িত হয়, সেই সূত্রে ত্রিপুরার উপর ক্রোধ রহিয়াছিল। ইস্‌লাম খাঁ সঙ্কল্প করিলেন ত্রিপুরা রাজ্য জয় করিতে হইবে, তাই সহসা অভিযান প্রেরণ করিলেন। বিদ্যুৎবেগে এই সংবাদ ত্রিপুরা রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িল, তখন ঘরে ঘরে সাজ সাজ রব উঠিল!

সে সময়ে ইষা খাঁ ছিলেন অমরমাণিক্যের একজন প্রধান সেনাপতি। ইষা খাঁর উপর মহারাজ যুদ্ধের ভার অর্পণ করিলেন। ইষা খাঁ বিপুল সেনা লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সরাইলের নিকট গড়খাই করিয়া শত্রুপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা

করিতে লাগিলেন। এদিকে ইস্‌লাম খাঁর সৈন্য ঐপথে আসামাত্রই ইষা খাঁ বার হাজার অশ্বারোহী ও অল্প পদাতি লইয়া শত্রুর গতিরোধ করিলেন, বাকী সৈন্য গড়ে রহিয়া গেল। ইষা খাঁর আক্রমণের ক্ষিপ্রতায় শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, তাহারা পুনঃ জমাট বাঁধিবার পূর্ব্বেই ইষা খাঁর প্রবল চাপে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। বিপদের মেঘ কাটিয়া গেল, ইষা খাঁ লব্ধকীর্ত্তি লইয়া সগৌরবে রাজধানীতে ফিরিলেন। মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হইয়া ইষা খাঁর উপর রাজসম্মান বর্ষণ করিলেন।

অমরমাণিক্যের ভাগ্যে আবার হরিষে বিষাদ ঘটিল। ভুলুয়া জয়ের পর যুবরাজ রাজদুর্লভ সেখানে ত্রিপুর সেনার ছাউনিতে বাস করিতেছিলেন। সে স্থান সমুদ্রের সন্নিকট, লোনা জলে তাঁহার অসুখ করিল—ক্রমে ব্যাধি দুরারোগ্য হইয়া যুবরাজের জীবনান্ত ঘটাইল। পুত্রশোকে অমরমাণিক্য অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। চিত্তবিনোদনের জন্য মহারাজ শিকারে বাহির হন। কৈলাগড় (কসবা) পথে অমরমাণিক্য যাত্রা করেন, তৎপরে জলপথে সেনাপতিসহ দাউদপুর ঘাটে আসিয়া উপনীত হন। সেখানকার জমিদার যেখানে মহারাজের অভ্যর্থনা করেন তাহা 'মিলন ঘাট' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিতাস পার হইয়া মহারাজ সরাইল গমন করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইষা খাঁ সেখানে গড়খাই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তখন সরাইলে গভীর অরণ্য। সুতরাং শিকারের সুবিধা হইয়াছিল।

সরাইলের দক্ষিণে জঙ্গল কাটাইয়া কুমার রাজধরের উৎসাহে বেয়াল্লিশ নামক নগর বসান হয়, বর্ত্তমানেও সরাইল পরগণার দক্ষিণাংশ "তপে বেয়াল্লিশ" নামে পরিচিত।

এই সময়ে রাজধরের পুত্র যশোধর জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার জন্মপত্রিকায় ছেদ যোগ থাকায়, কাণ নাকের কিঞ্চিৎ ছেদন করা হয় যেন দোষ কাটিয়া যায়। ইহার একবৎসর পরে কৈলাগড়ে মহামাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র গগনের ধারায় কল্যাণের (মাণিক্য) জন্ম হয়। কল্যাণের জন্মপত্রিকা দৃষ্টে ইহা বুঝা গিয়াছিল যে এই শিশু কালে অসামান্য তেজস্বী হইবেন।

(১০)

অমরমাণিক্য ও মঘরাজ

সুখ দুঃখ বিধির বিধানে মানুষের ভাগ্যে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অমরমাণিক্যের জীবনের সুখের ভাগ ফুরাইয়াছিল এখন কেবলি দুঃখের ভাগ অবশিষ্ট রহিল। তাই তাঁহার শেষ কাল অনেকটা সাজাহানের মত। সাজাহানের ন্যায় তিনি সহসা পীড়িত হইয়া পড়িলেন আর অমনি পুত্রদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল সিংহাসন কাহার হইবে! রাজ্যের দূর প্রান্তে থাকিয়া যখন রাজধর শুনিলেন পিতার অসুখ অমনি তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহারাজের

শয্যাপার্শ্বে তখন কনিষ্ঠ পুত্র যুঝা সিংহ ছিলেন, তিনি বেগতিক দেখিয়া খড়্গ লইয়া হাঁকিয়া উঠিলেন—রাজধরের কি রাজ্য-লোভ, পিতা বাঁচিয়া থাকিতেই সিংহাসনে বসিতে চায় ? কি আস্পর্দ্ধা ! এই হাঁক ডাক রাজার কানে গেল, তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন প্রধান সেনাপতি ইষা খাঁকে দিয়া যাহাতে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ না বাঁধিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিলেন এবং স্বয়ং সিংহাসনে বসিয়া এই সঙ্কট সময়ে রাজাদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিরোধের করাল ছায়া মিলাইয়া গেল বটে কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ ঠিক মিটিল না, কেবল ভবিষ্যৎ সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল।

কিছুকাল পরে মহারাজ সুস্থ হইয়া রীতিমত রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন কিন্তু মনের শান্তি ফিরিয়া পাইলেন না। রাজধানীতে নানাগুজবের সৃষ্টি হইতে লাগিল, অযথা রটনা হইল দেবতার নিকট শিশু বলি দেওয়া হইবে, ঘরে ঘরে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। শিশুদিগকে লুকাইয়া রাখিতে লাগিল। মহারাজ শুনিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হায় হায়, এসব কি কথা, কে এই ভীতির সঞ্চার করিতেছে ?"

কুমারদের মধ্যে বিরোধের হেতু রাজ্যে গোল হইতেছে জানিয়া আরাকানপতি চট্টগ্রাম অঞ্চল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বাণিজ্যের লোভে পর্ত্তুগীজেরা সেই অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, আরাকানপতি ইহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পর্ত্তুগীজের নৌবহর সমুদ্র মোহনা হইতে কর্ণফুলি

নদীতে ভিড়ান হইল, ইহাদের উৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র থাকার কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং মহারাজের প্রতিপক্ষরূপে য়ুরোপীয় একটি জাতিও দাঁড়াইল। এ সংবাদ অমরমাণিক্য যথা সময়ে জানিতে পারিয়া তদুপযোগী আয়োজন করিলেন। যুবরাজের মৃত্যুতে রাজধরই ভাবী রাজারূপে গণ্য হইতেন, তাই রাজধরকে সেনাপতিপদে বরণ করিতে বাধ্য হইলেন, তাঁহার অধীনে অপর দুই ভাই অমর ও যুঝা স্ব স্ব সৈন্য মিলাইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তিন ভাইয়ের সৈন্য একত্রিত হইলেও ইহাদের মনের মধ্যে পূর্ব্ববৎ পার্থক্য রহিয়া গেল। প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান ও নিজ নিজ কৃতিত্ব দেখাইতে তৎপর। এমন অবস্থায় যুদ্ধের ফল পূর্ব্বেই অবধারিত, এক্ষেত্রেও সেই বিষময় ফল ঘটিয়াছিল।

ত্রিপুর সৈন্য চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া স্থির করিল আরাকান-পতিকে আক্রমণ করা দরকার, সেই মতে এক নিভৃত প্রদেশে কর্ণফুলি নদীর উপরে ভাসমান সেতু সৃষ্টি করিয়া নদী পার হইয়া ত্রিপুর সৈন্য মঘ রাজ্য প্লাবিত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাম্বু, দেয়াঙ্গ প্রভৃতি স্থান জয় হইয়া গেল। মঘদের কৌশল রাজধর বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ত্রিপুর সৈন্য যখন বিজয় গর্ব্বে দিশাহারা হইয়াছিল তখন দেখা গেল মঘ ও পর্ত্তুগীজেরা তাহাদিগকে পেছন হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা বেড়াজালে আটক হইয়া পড়িয়াছে। নদী পার হইয়া তাহারা যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছে তাহা তখন বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। মঘেরা রসদের সব রাস্তা বন্ধ

করিয়া দিল, ত্রিপুর সৈন্যের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। খাদ্যাভাবে তাহারা পার্ব্বত্য জুমের খোঙ্গা আলু চিবাইতে লাগিল, অদ্যাপি সেই স্থানের পর্ব্বতকে খোঙ্গি শৈল কহে। মঘেরা তাহাদিগকে তাড়া করিয়া নদীতীরে আনিল, অনশনে উদ্বেগে তাড়া খাইয়া অনেকেরই প্রাণ বিয়োগ হইল, যাহারা প্রাণে বাঁচিল তাহারা নদী সাঁতরাইয়া এপারে আসিল।

রাজধর বুঝিলেন মস্ত ভুল হইয়া গেল। কর্ণফুলি নদীর তীরে মাথায় হাত দিয়া নিজের শিবিরে বসিয়া পড়িলেন, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ছাইয়া গেল। অনেক চিন্তার পর রাজধর স্থির করিলেন, রাত্রি থাকিতে থাকিতে গিরিবর্ত্মগুলিতে ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে সৈন্য রাখিতে হইবে, যেন মঘেরা বিন্দুমাত্র টের না পায়। নিজের গড়খাই হইতে কিছুদূরে সৈন্য সজ্জা রাখা হইবে যেন মঘেরা মনে করে ত্রিপুর সৈন্য ইহার বেশী অগ্রসর হয় নাই; নিঃসঙ্কোচে যখন ইহারা পর্ব্বত হইতে নামিতে থাকিবে তখন সঙ্কেত পাইয়া ত্রিপুর সৈন্যেরা ইহাদের উপর লাফাইয়া পড়িবে। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। সারারাত্রি ধরিয়া যুদ্ধের ফাঁদ পাতা হইল, মঘেরা বিজয়োল্লাসে পান ভোজনে মত্ত থাকিয়া কিছুই জানিতে পারিল না।

পরদিন অতি প্রত্যূষে লড়াই বাঁধিয়া গেল। মঘেরা পাহাড় হইতে নামিতে গিয়া একেবারে টুকরা হইয়া গেল। দূরে ত্রিপুরসৈন্য ইহা দেখিয়া তাহাদিগকে তাড়া করিয়া আসিল,

তৃতীয় কুমার অমর দুর্লভ সেনাপতিরূপে তাহাদিগকে চালনা করিয়া শৈলমূলে স্বীয় সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন। মঘেরা এই অতর্কিত আক্রমণে ভীত হইয়া পড়িল, তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই কুমার অমরের চাপে একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। অমর দুর্লভ তখন অশ্বারোহণে সৈন্য চালনা করিয়া শত্রুর পশ্চাৎ ছুটিলেন। রণমদে মত্ত হইয়া দুই জন মাত্র সওয়ার সাথে অমর দুর্লভ রাইপুর পর্য্যন্ত শত্রু হঠাইতে হঠাইতে গেলেন। রাজধর স্বীয় শিবিরে থাকিয়া আক্রমণকারী একদল মঘের সহিত লড়িলেন, তাহাতে প্রায় সহস্রাধিক মঘের পতন হইয়াছিল। ইহার পর আর কোন দিক হইতে মঘেরা তাঁহার সহিত লড়িতে আসে নাই।

এদিকে দুপুর পার হইয়া গেল, সূর্য্যদেব ক্রমশঃই পশ্চিম গগনে পদার্পণ করিতে লাগিলেন তথাপি অমর দুর্লভের কোন খবর নাই। রাজধর বড়ই চিন্তিত হইলেন, তাঁহার দূতেরাও তাঁহার সম্বন্ধে সঠিক খবর দিতে পারিতেছিল না কারণ কুমার আগু হইয়া পড়িয়াছিলেন। সন্ধ্যা ঘনীভূত হইল, এমন সময় দেখা গেল তিনজন অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে রাজধরের শিবির অভিমুখে আসিতেছে, যখন কাছে আসিল তখন রাজধরের বদন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রক্তাক্ত তরবারী হাতে অমর দুর্লভ ঘোড়া হইতে নামিলেন আর অমনি রাজধর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

(১১)

মঘরাজের মুকুট প্রেরণ

ভীষণ ঝটিকার বেগে বাহিরে কোথাও তিষ্ঠাইতে না পারিয়া কপোত যেমন নিজ নীড়ে ফিরিয়া যায় পরাজিত মঘসৈন্য তেমনি মঘ দুর্গে ফিরিয়া আসিল। মঘরাজ নিরুপায় দেখিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিয়া উড়িয়া রাজা নামক স্বীয় দূতকে রাজধরের শিবিরে পাঠাইলেন। উড়িয়া রাজা সন্ধিপত্র করযোড়ে রাজধরের নিকট নিবেদন করিল। রাজধর পত্র পড়িয়া দূতকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন, "মহারাজ অমর মাণিক্যের অভিমত জানিয়া মঘরাজকে উত্তর দিব বলিও।" দূত চলিয়া গেল। পত্রে মঘরাজ এক বৎসরের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন।

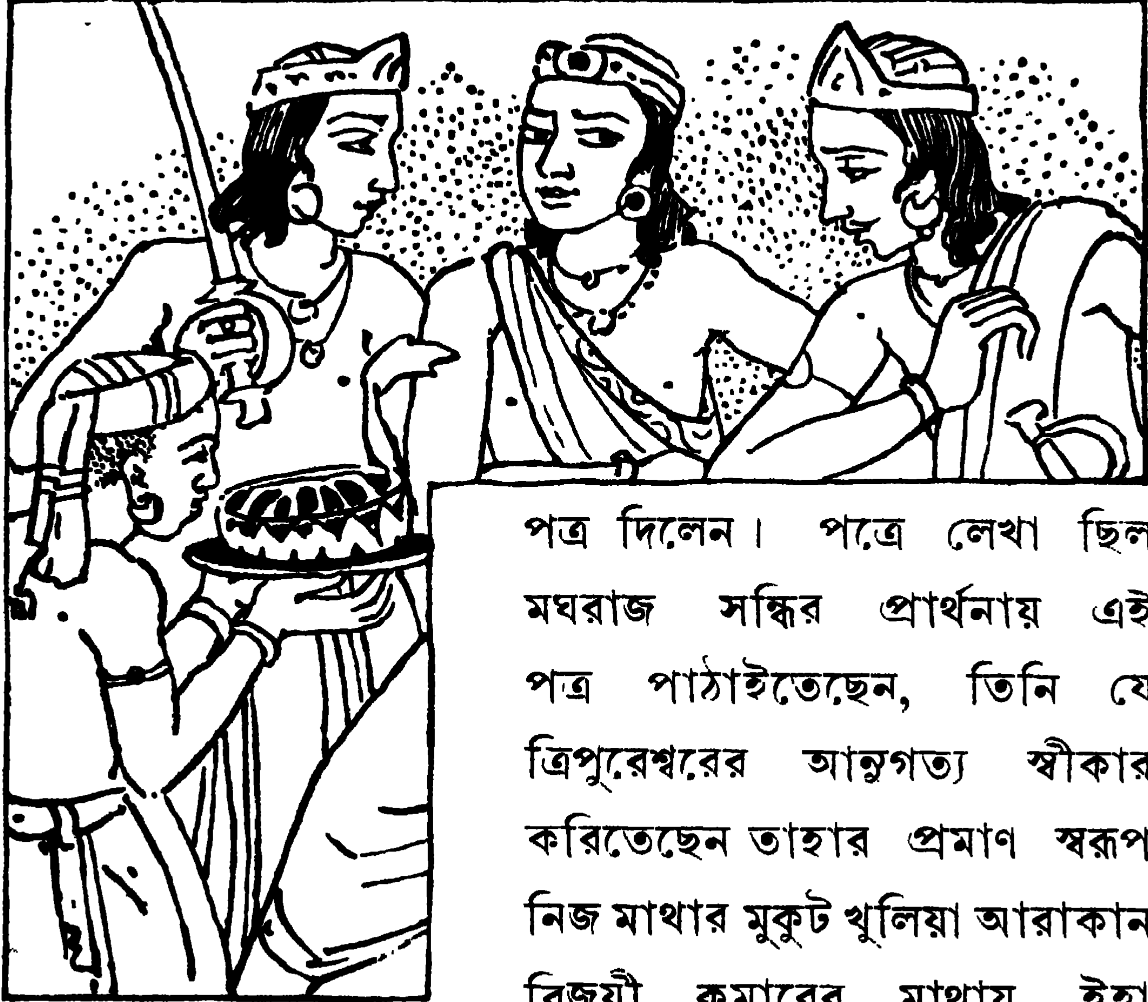
তখন দুর্গোৎসবের কাল সমাগত, উদয়পুরে পূজায় ধমধাম চলিতেছে, পুত্রদের দেখিবার জন্য অমরমাণিক্যের মন ব্যাকুল হওয়া স্বাভাবিক। এমন অবস্থায় আরাকানপতির যুদ্ধ-স্থগিত-প্রার্থনা রাজধরের দূত-হস্তে মহারাজের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। মহারাজ সম্মতি জানাইয়া পত্র দিলেন এবং লিখিয়া দিলেন যেন কুমারেরা দুর্গোৎসবের দিনে রাজধানীতে পৌঁছে। রাজধর পত্র পাইয়া মঘরাজকে যুদ্ধবিরতি জানাইয়া দিলেন এবং মঘরাজের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ভাইদের সহিত উদয়পুরে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু এই উদারতা অনুচিত ব্যক্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়া গেল, দেবী চলিয়া গেলেন। উদয়পুর যেন নষ্টশ্রী হইয়া পড়িল, কি অমঙ্গলের আশঙ্কায় রাজপুরী যেন কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এইরূপ জনরব শুনা যাইতে লাগিল মন্দিরে দেবতার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিতেছে, আকাশ হইতে তারা খসিয়া পড়িতেছে, অকারণে শৃগাল কুকুর রোদন করিতেছে।* এই অবস্থার মধ্যে চট্টগ্রাম হইতে দুঃসংবাদ আসিল মঘরাজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া চট্টল অধিকার করিয়াছেন। তখনই দুর্গ তোরণে দামামা বাজিয়া উঠিল, সাজ সাজ রব উঠিল! রাজধর, অমর দুর্লভ ও যুঝা সিংহ স্ব স্ব সৈন্যসহ যাত্রা করিলেন। কনিষ্ঠ কুমার যুঝা যেরূপ ক্রোধী তাহাতে তিনি যুদ্ধে যান ইহা মহারাজের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যুঝাকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না। রাজধর হইলেন প্রবীণ সেনাপতি, তাঁহার দুই ভাই অধীনে রহিলেন।

ত্রিপুর সেনা যখন গড়খাই করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তখন মঘরাজ যেন মহাভয় পাইয়াছেন এরূপ ভান করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কিঞ্চিৎ হঠিয়া গেলেন। কুমারদের প্রত্যয় হইল মঘরাজ সত্যই ভয় পাইয়াছেন। মঘরাজ জানিতেন যে তিন ভাইয়ের সৈন্য একত্রিত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহাদের মনের সমতা নাই, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। তাই তিন ভাইয়ের মধ্যে যাহাতে ভাল করিয়া বিবাদ বাঁধে সেই

* দৈবতানি রুদন্তীব স্বিদ্যন্তি প্রচলন্তি চ—ভাগবত ১।১৪।২০

উদ্দেশ্যে তিনি রত্নখচিত হস্তিদন্তের একটি রাজমুকুট দূত হস্তে ত্রিপুর শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন, তৎসঙ্গে রত্নপেটিকায় একটি



বিজয়ী রাজপুত্র বলিয়া সকলেই রাজমুকুট পরিতে চাহিলেন।

পত্র দিলেন। পত্রে লেখা ছিল মঘরাজ সন্ধির প্রার্থনায় এই পত্র পাঠাইতেছেন, তিনি যে ত্রিপুরেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিজ মাথার মুকুট খুলিয়া আরাকান বিজয়ী কুমারের মাথায় ইহা পরাইয়া দিতেছেন।*

আরাকানপতির গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, দূত হস্ত হইতে পত্র লইয়া যখন রাজধর ইহা পাঠ করিলেন তখন অমর দুর্লভ ও যুঝা সিংহ নিকটে থাকিয়া

* এই ঘটনা অবলম্বনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "মুকুট" নামে নাটিকা রচনা করেন।

ইহার মর্ম্ম অবগত হন। পত্র পাঠের পর যখন রাজমুকুট কুমারদের সম্মুখে বাহির করা হইল তখন ইহার গায়ের বহুমূল্য রত্নগুলি ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিয়া এক অপূর্ব্ব দীপ্তি ছড়াইল। ইহাতে কুমারদের চক্ষু ঝল্‌সিয়া গেল, জ্যেষ্ঠ বলিয়া মান্য রহিল না। অমর ও যুঝা সিংহের মধ্যে মুকুট লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল, বিজয়ী রাজপুত্র বলিয়া সকলেই মুকুট পরিতে চাহিলেন। দূত এই সুযোগে শিবিরের চারিদিক ঘুরিয়া সেনা সংখ্যার পরিমাণ মঘরাজের অভিপ্রায় অনুযায়ী জানিয়া লইয়া বিদায় হইল।

দূত মুখে কুমারদের বিবাদের সংবাদ এবং ত্রিপুরসৈন্য সংখ্যার পরিমাণ অবগত হইয়া মঘরাজ আর কালবিলম্ব করিলেন না। কুমারদের মধ্যে তিনি বিবাদের বীজ (apple of discord) রোপণ করিয়া বন গহন দিয়া স্বসৈন্য চালনা করিলেন, নিজ নিজ আস্ফালনে মত্ত কুমারদের মুকুটের নেশা তখন টুটিয়া গেল। যখন ভীত সন্ত্রস্ত প্রহরী আসিয়া নিবেদন করিল যে মঘ সৈন্য ত্রিপুর সেনাবাসের অতি সন্নিকটে; চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যুঝাসিংহ বীরদর্পে যুদ্ধ করিতে রওনা হইলেন, তাঁহার বীররস দেখিয়া সকলেই ভয় পাইলেন কিন্তু যুঝাকে বুঝান গেল না। যুঝাকে যখন ছত্র নাজির এইরূপ হঠকারিতা দেখাইতে নিষেধ করিলেন তখন যুঝা বীররসের অভিনয় করিয়া উত্তর দিলেন—ছত্রনাজির যেন স্ত্রীলোকের ন্যায় শঙ্খ বস্ত্র পরিয়া ঘরে চলিয়া যায়।

(১২)

উদয়পুর অধিকার ও অমরমাণিক্যের মৃত্যু

বিজয়ী হইয়া মুকুট পরিবেন এই দুরন্ত আশা লইয়া রণনায়করূপে যুঝা মঘ সৈন্যের সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। যুঝার বয়স তখন ২৫, যুদ্ধ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ অথচ দুর্জ্জয় আত্মাভিমান। রাজধর প্রমাদ গণিলেন, তিনি যুদ্ধ চালনার সুযোগ না পাইয়া শিবিরের সম্মুখ রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে যুঝা পর্ব্বত আক্রমণ করিয়া মঘসৈন্য হঠাইতে হঠাইতে অপর প্রান্তে মাঠে আসিয়া পড়িলেন, —তখন দূরে মঘ দুর্গ দেখা গেল। যুঝার সঙ্কল্প হইল দুর্গ জয় করিবেন। মঘেরা তখন ত্রিশ হাজার বন্দুক হইতে অনবরত অনল বর্ষণ করিতে লাগিল।

দুর্গজয় করিবার অভিলাষে যুঝা রাজধরের জয়মঙ্গল হস্তী আরোহণে যাইতেছিলেন কাযেই বিপক্ষের গোলা লাগিবার সুবিধা হইয়াছিল। যখন হস্তীর উপর উঠিতেছিলেন তখন বিপক্ষের গোলা লাগিয়া হস্তী নড়িয়া উঠিল এবং যুঝা হাওদা হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন—দৈবচক্রে হাতীর পায়ের আঘাতে যুঝা প্রাণত্যাগ করেন। এইরূপে নিজ হঠকারিতায় যুঝা প্রাণ হারাইলেন। অমর দুর্লভ ও রাজধর উভয়ই পশ্চাদ্ভাগে ছিলেন। যুঝার মৃত্যুতে যখন চারিদিকে দারুণ বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়িল তখন বর্শা আসিয়া র‍্যজধরের অঙ্গে বিদ্ধ

হয় তাহাতে প্রচুর রক্তপাতে যুবরাজ অবসন্ন হইয়া পড়েন। হাতীর উপর হইতে তাঁহাকে নামাইয়া শিবিরে আনা হয়। আঘাত এত গুরুতর হইয়াছিল যে একমাত্র কপালে রাজযোগ ছিল বলিয়াই সে যাত্রা তিনি টিকিয়া গেলেন। অমরতুর্লভ মঘের দুর্ব্বার স্রোত রোধ করিতে পারিলেন না। সুতরাং ত্রিপুর সৈন্য ভীষণভাবে পরাজিত হইল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠারা যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল এই মঘসমরেও ত্রিপুরশক্তি অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়িল।

ভগ্নদূত মুখে এই সংবাদ পাইয়া অমরমাণিক্যের দুঃখের সীমা রহিল না—একে পুত্রশোক তদুপরি ত্রিপুর বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ে তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, যে অসি সাহায্যে তিনি সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন সেই অসিতে ভর করিয়া শেষ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যুদ্ধ-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কেবলি মনে পড়িতে লাগিল, তাঁহারি যে বাহুবলে ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ব্বরাজাদের সময়ে সুরক্ষিত ছিল সে বাহুবলের কোথায় অভাব ঘটিল যে ত্রিপুরা রাজ্য টলমল করিতেছে!

ভগ্নহৃদয়ে মহারাজ চট্টল শিবিরে পৌঁছিলেন। রাজধর পিতার চরণে লুটাইয়া নিবেদন করিলেন যে যুঝার হঠকারিতাই যুদ্ধে হারিবার প্রধান কারণ, যুঝা কাহারও নেতৃত্ব মানিবার পাত্র নহেন, নিজের বুদ্ধিতে কায করায় সমস্তই পণ্ড হইয়াছে।

অমরমাণিক্য ছত্রভঙ্গ সৈন্য একত্র করিয়া একবার শেষ চেষ্টা পাইলেন। স্বয়ং দুর্গের ভার রাখিয়া যুদ্ধ চালনা করিতে লাগিলেন, দুই হাজার পাঠান অশ্বারোহী মঘ সৈন্য আক্রমণ করিল, ঘোর যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। রণক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে দুই লক্ষ মঘ সৈন্যে ছাইয়া গেল, ত্রিপুরার হতাবশিষ্ট সেনা এই লোকবলের সহিত কি করিয়া লড়িবে? পাঠানেরা রণে ভঙ্গ দিয়া যে যেদিকে পারিল পলাইল, মহারাজ এই সংবাদ শুনিয়া বুঝিলেন সমুদ্র তরঙ্গ রোধ করিবার উপায় নাই সুতরাং ত্রিপুর শিবির উঠাইয়া ফেলিয়া চৌদোলে উদয়পুর চলিয়া আসিলেন।

রাজধানীতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই খবর পাওয়া গেল মঘরাজ বিজয়োল্লাসে উদয়পুর নিতে আসিতেছেন। অমরমাণিক্য আত্মরক্ষার কোন পথ না পাইয়া উদয়পুর ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। গভীর মনোদুঃখে পরিজনসহ ডোমঘাট পথে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, বিলাসবৈভবের উদয়পুর যেন শ্মশান হইয়া গেল। রাজহীন রাজ্যে বাস অসম্ভব দেখিয়া অনেকেই মহারাজের অনুগমন করিল। শৌর্য্যবীর্য্যের আধার উদয়পুর একটি কঙ্কালের ন্যায় পড়িয়া রহিল।

এদিকে মঘরাজ উদয়পুর প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সৈন্যেরা লুটপাট করিল। পনর দিন অবস্থানের পর মহারাজ বুড়ামঘী নামে এক সর্দ্দারকে মঘ সৈন্যের সহিত উদয়পুরে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করেন। মহারাজ অমরমাণিক্য বনে বনে ফিরিতে লাগিলেন, উদয়পুর-লুণ্ঠন সংবাদ তাঁহার হৃদয়ে যেন

শেল বিদ্ধ করিল। এক এক দিন নিবিড় সন্ধ্যায় বনানীর অন্তরালে বসিয়া নিজের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা ভাবিতেন আর দর দর ধারে চক্ষের জল বহিয়া যাইত। তাঁহার নিঃশ্বাসে সমবেদনায় বনে মর্ম্মর ধ্বনি জাগিত, পাখীরা কূজনবিরত হইত, একটি একটি করিয়া আকাশে তারা ফুটিত, ভাগ্যহীন অমরের প্রতি যেন তাহারা নিষ্পলক চাহিয়া থাকিত।

আষাঢ় মাস উপস্থিত, মহারাণীর সহিত আলাপ করিয়া মহারাজ স্থির করিলেন কুমার রাজধরকে রাজপাটে বসাইয়া তিনি বিদায় লইবেন। সেই মতে সকল অনুষ্ঠান হইল। আষাঢ় মাস, জলে ভরা নদী, মহারাজ নৌবিহার ইচ্ছা করিলেন। পালে পালে নৌকা সাজিল, মনুনদীর তীরে তেতৈয়া নামক স্থানে আসিয়া নৌবহর থামিল। স্বদেশের এই ঘোর বিপদ তাঁহার প্রাণে এতই বাজিয়াছিল যে বাঁচিতে তাঁহার আর সাধ ছিল না। তীর্থ-মৃত্যুতে চন্দ্রলোক-গতি হয় ইহা শাস্ত্রোক্তি। পবিত্র মনুনদীতে স্নাত হইয়া মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া মহারাজ অহিফেন ভক্ষণ করেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মনুনদীতীরে তাঁহার চিতানলে মহাদেবী সহমৃতা হইলেন। জীবনের গভীর দুঃখ চিতানলে নির্ব্বাণ লাভ করিল। ফিনিসীয় মহাবীর হ্যানিবলের ন্যায় অমরমাণিক্যের জীবন-নাট্য বড়ই বিয়োগান্তক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১)

রাজধরমাণিক্য

১৬০১ খৃষ্টাব্দে রাজধরমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। মঘের উৎপীড়নে উদয়পুর হস্তচ্যুত হইলেও ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরভাগ অক্ষুন্ন রহিয়া গেল। বর্ত্তমান কৈলাসহর বিভাগের মনুনদীর তীরে মহারাজ অমরমাণিক্য রাজপাট স্থাপন করিয়া জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেন। মহারাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রাজধরের মস্তক রাজমুকুটে বিভূষিত হইল। যে স্থানে অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা 'রাজধর ছড়া' নামে খ্যাতিলাভ করে। বর্ত্তমানে কৈলাসহর অঞ্চলে ঐ স্থানকে চল্‌তি ভাষায় 'রাতাছড়া' বলা হয়, ইহা দেম্‌তুম্‌ ছড়ার নিকটবর্ত্তী। কিছুকাল পূর্ব্বে রাজধর ছড়ায় মৎস্য ধরার সময় তুইটি ত্রিপদী পাওয়া যায়, ত্রিপুরেশ্বরগণ যেরূপ ত্রিপদীতে ভোজন পাত্র স্থাপন করেন এই তুইটিও তদনুরূপ।

আকবরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া রাণা প্রতাপ যেরূপ পর্ব্বতের নিভৃত প্রদেশে সামান্য গৃহে রাজপাট স্থাপন করেন, অমরমাণিক্যও তেমনি জীবনের শেষ দিনগুলি সামান্য ঘর বাড়ীতে কাটাইয়া যান। পিতার মৃত্যুর পর রাজধর এই

সামান্য বসন-ভূষণ-ভবনে রাজা হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। উদয়পুরের স্মৃতি কখনও ভুলিতে পারিতেন না। কি উপায়ে পিতৃপিতামহের গৌরব-সমুজ্জ্বল উদয়পুরের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন সেই চিন্তায় দিবারাত্র বিভোর থাকিতেন।

কিছুকাল পরে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। মঘরাজ্যে গোলযোগ হওয়ায় মঘ সৈন্য উদয়পুর হইতে উঠিয়া গেল। এই সুযোগে রাজধর পাত্র মিত্র সভাসদ্ লইয়া উদয়পুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তখন ভাদ্রের প্রথমভাগ, কৃষ্ণপক্ষ, পর্ব্বতে পর্ব্বতে জুম ধান পাকিয়া সুঘ্রাণ ছড়াইতেছে, মাথার উপরে রাজচ্ছত্র মৃদুমন্দ পবনে হেলিতেছে, রাজধর চাহিয়া দেখিলেন হাস্যময়ী প্রকৃতি যেন তাঁহাকে সাদরে নিরীক্ষণ করিতেছেন। খুটিশৈল বামে রাখিয়া ধ্বজনগরপথে রাজধর বর্ত্তমান আগরতলার পার্শ্ব ঘেষিয়া বিশালগড়ে পৌঁছিলেন, সেখান হইতে অভিনিষ্ক্রমণ স্থান ডোমঘাট পৌঁছিতেই চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। মহাসমারোহে রাজধর পুরপ্রবেশ করিলেন, সে সময়ে সেলামবাড়ি নামে জাতীয় বাদ্য বাজিতেছিল।

রাজধর সিংহাসনে বসিয়া কেবলি দেবসেবায় মন দিলেন। পিতার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাঁহার বোধ হইয়াছিল একমাত্র বিষ্ণু সেবাই সার আর সকলই অসার। নিত্য প্রাতঃস্নান করিয়া সন্ধ্যাপূজায় নিমগ্ন থাকিতেন, রাজপুরোহিতদ্বয় সার্ব্বভৌম ও বিরিঞ্চিনারায়ণ মহারাজকে দিয়া প্রত্যহ পঞ্চপাত্রে অন্নদান

করাইতেন। এইরূপে দেবকার্য্য সমাধা করিয়া তিনি দ্বিপ্রহরে রাজসভায় মন্ত্রী পরিবেষ্টিত হইয়া বসিতেন। আবার সন্ধ্যায় ভাগবত শ্রবণে তন্ময় থাকিতেন, মহারাজের ধর্ম্মানুরাগ এইভাবে দিন দিন বাড়িতে লাগিল, তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন অহোরাত্র হরিকীর্ত্তন শুনিয়া জীবন কাটিয়া যাউক, আর মনুষ্যজন্ম হয় কি না কে জানে! তরুণ বয়সে রাজাকে হরিনামে বিভোর দেখিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন---"মহারাজ বৃদ্ধ বয়সে হরিনাম অহোরাত্র করিবেন, এখন ত সে সময় আইসে নাই।" মহারাজের একথা অবশ্যই মনঃপূত হইল না।

মহারাজের মনের ভাব ছিল—'গৃহীত ইব কেশেষু ধর্ম্মমাচরেৎ'। তাই মুখ ফুটিয়া বলিলেন—"প্রভো, কতদিন বাঁচিব তারই ঠিক কি, যতক্ষণ শ্বাস আছে ততক্ষণ হরিনামের সঙ্গেই এ শ্বাস ক্ষয় হউক, তাহাতে সর্ব্বপাপ ধুইয়া যাইবে এবং অন্তে হরিপদ পাইব।" তাঁহার সঙ্কল্প অনুযায়ী অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইল, আটজন কীর্ত্তনীয়া এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইল। মহারাজ হরিনামে বিভোর হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। এক বিচিত্র বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করিয়া মহারাজ তাহাতে বিষ্ণু আরাধনা করিতেন। অবিরত ধর্ম্মকর্ম্মে রাজধর আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এই সংবাদ দেশ দেশান্তর ছাপাইয়া ক্রমে গৌড়েশ্বরের কানে উঠিল, তিনি দেখিলেন ইহা এক মস্ত সুযোগ। ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য গৌড়সৈন্য সমরায়োজন করিতে লাগিল।

ত্রিপুরারাজ্য হস্তিবলে সমৃদ্ধ, গৌড়েশ্বর হস্তী অশ্ব ধনরত্ন লুণ্ঠন অভিপ্রায়ে এক বিপুল ফৌজ পাঠাইয়া দিলেন। মহারাজ হরিনামে তন্ময় এমন অবস্থায় তাঁহার কানে এই দুঃসংবাদ পৌঁছিল। এক কালে রাজধর যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, সেই শৌর্য্যবীর্য্য ত্রিপুরার এ সঙ্কট কালে তাঁহাতে পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। মহারাজ স্ব-সেনাপতিগণকে অভয় দিলেন—"মাভৈঃ, বিষ্ণুকৃপায় সর্ব্ব অমঙ্গল নিরস্ত হইবে।" ত্রিপুর সৈন্যের অধিনায়করূপে চন্দ্রদর্পনারায়ণ কৈলাগড়ে (কস্‌বা) গড়খাই করিয়া গৌড়সৈন্যের গতিরোধ করিলেন। গৌড়সেনাপতি ত্রিপুরেশ্বরের হরিনামে ডুবিয়া থাকিবার কথায় মনে করিয়াছিলেন যুদ্ধ বড় একটা হইবে না, গৌড়সৈন্যের সদর্প পদধ্বনিতেই পথ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এইরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণায় যখন গৌড়সেনা আরাম আয়েসে গা ঢালিয়া আসিতেছিল তখন অতর্কিতে ত্রিপুরসৈন্যের প্রবল আক্রমণে তাঁহাদের সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। গৌড়বাহিনী একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বিষ্ণুশক্তিতে যেন ত্রিপুরসৈন্যের বাহু সবল হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলের নিকট পরাভূত হইয়া গৌড়-কটক পলায়ন করিল।

বিপদের মেঘ কাটিয়া গিয়া আনন্দের সুপ্রভাত হইল। উদয়পুরে আর আনন্দ ধরে না, গৃহে গৃহে উৎসব মুখরিত। বিষ্ণুকৃপায় রাজ্য রক্ষা পাইয়াছে ইহা সকলেরই ধারণা হইল। রাজধর বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ ও বিষ্ণুর পাদোদক গ্রহণ করিতে করিতে তাঁহার জীবনের দিনগুলি কাটাইতেছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত

বিষ্ণুমন্দির গোমতীনদীর তীরে। সেই নিভৃত স্থানে মহারাজের সকাল সন্ধ্যা কাটিতে লাগিল। একদিন হরিনামে বিভোর হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, ভাবাবেশে কখন যে গোমতী নদীতে পড়িলেন জানিতে পারিলেন না। এই ভাবে বিষ্ণুভক্ত রাজার মৃত্যু ঘটিল, রাজ্যময় সে শোকসংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। মহারাজ রাজধরের পুত্র যশোধর পাত্রমিত্র মন্ত্রী সভাসদ্ ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত সহ নদীতীরে ছুটিয়া গেলেন। বৈকুণ্ঠাখ্য রাজ-শ্মশানে দাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল।

(২)

যশোধরমাণিক্য ও জাহাঙ্গীর

১৬১৩ খৃষ্টাব্দে রাজধরের পুত্র যশোধর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। যশোধর মঘরাজের বিক্রম জানিয়া তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন, ইহাতে রাজ্যে মঘভীতি দূর হইয়া যায়। ইহার পর ভুলুয়া বিদ্রোহী হয় কিন্তু যশোধরমাণিক্যের প্রবল আক্রমণে ভুলুয়া পুনঃ পদানত হইয়া পড়ে।

যশোধরমাণিক্য দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। গৌড়েশ্বর হস্তীর লোভে ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন, এ সংবাদ বাদশাহের কানে উঠে। ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণে অগণিত হস্তিবল দ্বারা মোগল সৈন্য সমৃদ্ধ হইবে এই ভরসায় জাহাঙ্গীর সুদূর ত্রিপুরায় অভিযান প্রেরণ করেন।

এতকাল ত্রিপুরার সহিত গৌড়েশ্বরের শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে, এইবার দিল্লীর বাদশাহ ত্রিপুরা ধ্বংসের জন্য স্বীয় বাহুবল প্রয়োগ করিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল।

নবাব ফতেজঙ্গ দিল্লী হইতে দুইজন প্রধান উমরা সঙ্গে লইয়া বিপুল বাহিনীসহ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং কিছুকাল মধ্যে ঢাকা আসিয়া পৌঁছিলেন। ফতেজঙ্গ ঢাকার কেল্লা পরিদর্শন করিয়া সেখান হইতেও সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। ঢাকা নগরীতে বসিয়া ফতেজঙ্গ যুদ্ধের পরিকল্পনায় ব্যস্ত হইলেন, যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরার গিরিবর্ত্ম জানে তাহারা পথ ঘাটের সন্ধান ফতেখাঁর গোচর করাইল। ফতেখাঁ যুদ্ধের নক্সা আঁকিয়া ফেলিলেন—একভাগ কৈলাগড় পথে ও অপর ভাগ মেহেরকুল (কুমিল্লা) পথে আসিয়া উদয়পুরকে যুগপৎ ঘেরাও করিয়া গলা টিপিয়া মারিবার ব্যবস্থা করিবে। নবাব ফতেখাঁ ঢাকায় রহিয়া গেলেন, তাঁহার নক্সা অনুযায়ী দুই উমরাহ ইস্পিন্দার ও নুরুল্যা দুইভাগে সৈন্য লইয়া বাদসাহী ফৌজসহ যাত্রা করিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে পৌছিয়াই ইস্পিন্দার কৈলাগড় (কসবা) পথে এবং নুরুল্যা মেহেরকুল পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এতবড় সমরায়োজনেও যশোধরমাণিক্যের বীর হৃদয় দমিয়া যায় নাই ইহা অত্যন্ত গৌরবের কথা। তিনি মোগল সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য দুইদিকেই সৈন্য পাঠাইলেন

এবং বাদশাহ কি কারণে তাঁহাব সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন জানিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় দূত মোগল শিবিরে প্রেরণ করিলেন। মোগল শিবির হইতে উত্তর আসিল—দিল্লীশ্বর এই ইচ্ছা করেন যে ত্রিপুরার যত হস্তী আছে সমস্তই বাদসাহকে অর্পণ করা হউক। যদি ত্রিপুরার মহারাজ ইহাতে অস্বীকৃত হন তবে যেন মোগলের সহিত স্বীয় বাহুবল পরীক্ষা করেন। যশোধর মাণিক্য প্রত্যুত্তরে জানাইলেন বীরের ন্যায় তিনি খাপ হইতে তরবারী খুলিবেন, যদি হার হয় তবেই ইহা সম্ভব।

সুতরাং প্রবল পরাক্রম দিল্লীশ্বরের সহিত ত্রিপুরার নরনাথ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। বীরত্বের তীব্র উদ্দীপনায় বিপক্ষের সমুদ্রপ্রমাণ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ আদৌ সম্ভবপর কিনা ইহা ভাবিয়া দেখেন নাই কিন্তু যখন ত্রিপুর সৈন্যেরা যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শত্রুসৈন্যের কূলকিনারা পাইল না তখন সকলেই রণে ভঙ্গ দিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রিপুর সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় কাহিনী মহারাজের কানে আসিতে আসিতেই খবর পৌঁছিল যে ইস্পিন্দার ও নুরুল্যা বাদশাহী ফৌজ লইয়া উদয়পুর আসিয়া পড়িয়াছেন প্রায়। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল, যশোধর মাণিক্য স্বীয় পরিজন ও পাত্রমিত্র সহ অমরমাণিক্যের ন্যায় গভীর অরণ্যে লুকাইয়া পড়িলেন—প্রজারাও যে যেদিকে পারিল ছুটিল, উদয়পুর শ্মশানের ন্যায় শূন্য নির্জ্জন হইয়া পড়িল। যখন উমরাহদ্বয় রাজধানীতে পৌঁছিলেন তখন আকবরের

আক্রমণে শূন্য চিতোরের ন্যায় উদয়পুর আলোক-বিহীন (বে-চেরাগ)। মোগল সৈন্যেরা লুটতরাজ করিল, শূন্য নগরীতে শিবির খাটাইয়া সমরোল্লাসে রজনী কাটাইল, পরদিন রাজার খোঁজে লোক ছুটিল, গুপ্তচরে উদয়পুরের বনবনানী ছাইয়া গেল। শৈল হইতে শৈলান্তরে পলায়মান প্রতাপ সিংহের ন্যায়, যশোধর শত্রুহস্ত এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু এইভাবে কতদিন চলে? চরমুখে রাজবার্ত্তা শুনিয়া নুরুল্যা একদিন সহসা সৈন্যদিয়া মহারাজের বিশ্রামবন ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। যশোধরমাণিক্য ধৃত হইলেন।

বন্দী অবস্থায় যশোধরমাণিক্যকে লইয়া ইস্পিন্দার ও নুরুল্যা ঢাকায় চলিয়া আসিলেন। এদিকে উদয়পুরে মোগল ফৌজ অবরোধ করিয়া রহিল। নবাব ফতেজঙ্গ মহারাজকে পাইয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। মহারাজকে পাইলে বাদশাহের আনন্দের সীমা থাকিবে না, নবাবের ভাগ্যেও কত না জয়মাল্য পড়িবে!

ফতেজঙ্গ মহারাজকে সমাদর করিয়া কহিলেন—"আপনি যখন বাদশাহের অভিপ্রায় মানিতে চাহেন না তখন বাদশাহের সহিত আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতেছি, আপনার যাহা বক্তব্য থাকে বাদশাহকেই বলুন।" ফতেজঙ্গ যশোধরমাণিক্যকে বাদশাহ সমীপে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন। মহারাজ দিল্লীতে পৌঁছিলে, বাদসাহের দরবার হইতে তাঁহার ডাক পড়িল। যশোধরমাণিক্য যখন বাদশাহের দরবারে উপনীত হইলেন

তখন জাহাঙ্গীর প্রচুর সম্মানের সহিত মহারাজকে স্বীয় আসনের নিকট বসাইয়া সৌজন্য পূর্ব্বক যুদ্ধের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।



যশোধরমাণিক্য বলিলেন— আর রাজত্বে কায নাই।

তাঁহাকে বলা হইয়াছিল—"মহারাজ আপনার ত্রিপুরা রাজ্যে আপনি স্বচ্ছন্দে ফিরিয়া যান, শুধু হস্তিবল বাদশাহকে অর্পণ করুন।" যশোধরমাণিক্যের চিত্ত স্বাধীনতা হারাইয়া এত ব্যথিত হইয়াছিল যে বাদশাহকে মুখ ফুটিয়া বলিলেন—"বাদশাহ, আপনার নিকট একটি প্রার্থনা জানাইতেছি আর রাজত্বে কায নাই, আমাকে ছুটি দিন। যে রাজ্যে পরাজিত হইয়া আমাকে স্বদেশত্যাগে সুদূর দিল্লীতে চলিয়া আসিতে হইয়াছে সে দেশে আর অপমানের ডালা মাথায় করিয়া

যাইতে চাহি না। বাদশাহের অনুমতি পাইলে জীবনের বাকী দিনগুলি তীর্থপর্য্যটনে কাটাইতে ইচ্ছা করি।”

বাদশাহ মহারাজের রাজোচিত বলদৃপ্ত বাক্য শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তীর্থদর্শনের জন্য অবাধগতির অধিকার দান করিলেন। দরবার হইতে বিদায় হইয়া যশোধরমাণিক্য সর্ব্বপ্রথমে কাশীধাম যাত্রা করিলেন, মহারাণী ও অন্যান্য পরিজন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কাশীবাসে মহারাজের মনের গ্লানি দূর হইল। মণিকর্ণিকাতে গঙ্গাস্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন করিলেন এবং মহারাণীর সহিত অন্যান্য দেবতা দর্শনে পরিতৃপ্ত হইলেন। এইভাবে কিছুকাল কাশীতে পরমানন্দে কাটাইয়া মহারাজ প্রয়াগ যাত্রা করেন, সেখানকার পিতৃকার্য্যাদি করিয়া মথুরাধামে পৌঁছেন। মথুরা, গোকুল, গিরিগোবর্দ্ধন, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড ও শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে মহারাজের আনন্দের সীমা রহিল না। শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার জীবনের দিনগুলি ভক্তিরসে সিক্ত হইয়া কাটিতে লাগিল, কেবলি ভাবিতে লাগিলেন কতদিনে এ তনু ত্যজিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইব। এইভাবে ৭২ বৎসর বয়সে মহারাজ ধাম প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ যশোধরমাণিক্যের শেষজীবন পুরাকালের রাজর্ষিদের ন্যায়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু যে হরিপদ-প্রাপ্তিতে মৃত্যুভয় দূর হয় সে জয় যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তিনি পরাজিত হইয়াও জয়ী।

(৩)

কল্যাণমাণিক্যের অভিষেক

মহারাজ যশোধরমাণিক্য প্রবাসে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন, আর এদিকে উদয়পুরে কষ্টের সীমা রহিল না। অবরোধকারী মোগলসৈন্যের অত্যাচারে লোকজন অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। উৎপীড়িত হইয়া যাহারা অতি কষ্টে টিকিয়াছিল তাহারাও পলায়ন করিতে লাগিল। দেবকার্য্যে মোগলেরা বাধা দিতে লাগিল, চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরে ও কালিকা দেবীর মন্দিরে আর শঙ্খঘণ্টা বাজে না, সকাল সন্ধ্যার সুমধুর আরতি-ধ্বনি দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত করেনা। ধূপধুনার গন্ধে মন্দির আমোদিত হইয়া উঠেনা। ধনরত্নের আশে মোগলেরা উদয়পুরের স্ফটিক-স্বচ্ছ সরোবর হইতে জল বাহির করিয়া এগুলিকে শুকাইয়া ফেলিতে লাগিল। কি নিদারুণ অর্থশোষ! ধনরত্ন বাহির হইল না কিন্তু মহামারীর করাল মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিল, দলে দলে মোগলেরা মরিতে লাগিল, পথে ঘাটে মরিয়া পড়িতে লাগিল। মড়ক বুভুক্ষু রাক্ষসের ন্যায় লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া মোগল ফৌজ গ্রাস করিতে লাগিল। ইহাতে মোগলেরা আতঙ্কিত হইয়া উদয়পুর হইতে অবরোধ তুলিয়া মেহেরকুল * (কুমিল্লা) অঞ্চলে চলিয়া গেল।

* এই সময়ে মোগলগণ ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র অধিকার পূর্ব্বক তাহার বন্দোবস্ত ও রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন। যে সকল পরগণা সামন্ত

আড়াই বৎসর ধরিয়া অরাজক অবস্থা চলিয়াছিল। মোগলদের অবরোধত্যাগে ছত্রভঙ্গ ত্রিপুরবাহিনীর মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল, এ অবস্থায় আর কতদিন? পাত্রমিত্র সভাসদ্ মন্ত্রী ও সেনাপতির আগমনে উদয়পুর পুনরায় মুখরিত হইয়া উঠিল, কাহাকে রাজপদে বসান যায় এই লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। যশোধরমাণিক্য তখন মথুরায় বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র নাই, ভ্রাতা নাই, কেহ নাই যাঁহাকে রাজপদে নির্ব্বাচন করা যায়। তখন মহামাণিক্যের ধারায় জন্ম পুরন্দরপুত্র কল্যাণকেই বসান স্থির হইল। যশোধরমাণিক্যের রাজত্বকালে তিনি কৈলাগড়ে (কসবা) সেনাপতি পদে বৃত ছিলেন। রণক্ষেত্রে নৈপুণ্য দেখাইয়া যশস্বী হন, সুতরাং তাঁহার দিকেই চক্ষু পড়িল। বিধাতা যাঁহার ভালে রাজমুকুট আঁকিয়া দিয়াছেন সকলের চক্ষুই যে তাঁহার উপর পড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি?

নরপতি কিম্বা জমিদারদিগের অধিকারভুক্ত ছিল তাহা ত্রিপুরা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। কয়েকটি পরগণায় মুসলমান জমিদার নিযুক্ত করা হয়। তদ্ব্যতীত যে সকল স্থান মহারাজের খাসদখলে ছিল মোগলগণ তাহাকে "সরকার উদয়পুর" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক নূরনগর, মেহেরকুল প্রভৃতি চারিটি পরগণায় বিভক্ত করিয়া তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৯৯,৮৬০ টাকা অবধারণ করেন। প্রায় দুই বৎসর কাল তাঁহারা এইরূপে ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র শাসন করিয়াছিলেন।

—কৈলাস সিংহ প্রণীত রাজমালা; ৭৭পৃঃ।

১৬২৬ খৃষ্টাব্দে শুভদিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যথারীতি কল্যাণমাণিক্যের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। মঙ্গলবাদ্য বাজনায় রৌশনচৌকির রং পরঙে উদয়পুর ভরিয়া উঠিল, আবার মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা রব নিনাদিত হইল, চারিদিকেই আনন্দের হিল্লোল, পুর-লক্ষ্মীর আবির্ভাবে নগরী হাসিয়া উঠিয়াছে। অভিষেক সমাধা হইলে ত্রিপুর সেনা মুক্ত কৃপাণে মহারাজকে অভিবাদন করিল। তখন মহারাজ কালিকাপ্রসাদ নামক রাজহস্তী চড়িয়া সহর পরিভ্রমণে বাহির হইলেন। পথে পথে ধনরত্ন বিলাইয়া দেওয়া হইল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে অকাতরে অর্থদান করা হইল।

রাজপদে সমাসীন হইয়া কল্যাণমাণিক্য প্রথমেই সেনা বাহিনীর পুনর্গঠনে মন দিলেন। বিচ্ছিন্ন ত্রিপুর সৈন্য পুনরায় তাঁহার রাজচ্ছত্র তলে সমবেত হইল এবং জন্মভূমির উদ্ধার সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কঠোর অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে মহারাজ স্বপ্নে দেখিলেন কালিকাদেবী তাঁহার দেবালয় মূলে সরোবর খননে আদেশ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণের পরামর্শ ক্রমে শুভদিনে মহারাজ পুষ্করিণী খনন আরম্ভ করাইলেন, উহাই "কল্যাণসাগর" নামে পরিচিত। ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর মন্দিরের সন্নিহিত পূর্ব্বদিকে ইহা অবস্থিত। মঘ আক্রমণ কালে ঐ মন্দিরের চূড়া শত্রুরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, পুনর্ব্বার মহারাজ উহার সংস্কার সাধন করেন। তৎপর যে সব দীঘি মোগলেরা ধনরত্নের লোভে খাল কাটিয়া

শুকাইয়া ফেলিয়াছিল, সেগুলির পুনরুদ্ধার করেন। জলাশয়গুলি নির্ম্মল জলে ভরিয়া উঠায় উদয়পুরের পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসিল এবং স্বাস্থ্যসুখে জলস্থল পূর্ব্ববৎ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

কল্যাণমাণিক্যের প্রথমা মহিষীর গর্ভে গোবিন্দ ও জগন্নাথ, দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভে নক্ষত্র রায় ও কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভে যাদব ও রাজবল্লভ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কুমারেরা যুদ্ধ বিদ্যায় নিপুণ হইয়া উঠিলেন। উদয়পুরের পূর্ব্ব-উত্তর কোণে আচরঙ্গ বহুকালের প্রসিদ্ধ সীমান্তদেশ, গোমতীর উৎপত্তিস্থল ডম্বুরের সন্নিহিত মাইনি পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে আচরঙ্গ নদী আছে—উহা চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে যাইয়া মিশিয়াছে। আচরঙ্গ বহুকাল ত্রিপুরা রাজ্যের সীমারূপে পরিগণিত ছিল। উদয়পুর মোগল অধিকৃত হইলে রণজিৎ সেনাপতি আচরঙ্গ যাইয়া নিজকে রাজা বলিয়া প্রচার করিলেন। কালক্রমে রণজিতের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ পিতার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নশীল হন। ইহাতে কল্যাণমাণিক্যের ক্রোধের সীমা রহিল না, তাঁহার বাহুপাশ এড়াইয়া বিদ্রোহ করা অসীম সাহসের কথা।

মহারাজের আদেশে গোবিন্দনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযান যাত্রা করিলেন। দুর্গম পর্ব্বত মধ্য দিয়া ত্রিপুরসৈন্য একমাস কাল কাটাইয়া আচরঙ্গ প্রান্তে পৌঁছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ এই বার্ত্তা শুনিয়া ব্যস্তসমস্তে রাজ্য ছাড়িয়া আরও গভীরতর পর্ব্বতে গা ঢাকা দিলেন। সেস্থান আচরঙ্গ হইতে তিন দিনের পথ। আচরঙ্গ গড়ে কিছু সৈন্য রাখিয়া গোবিন্দ

নারায়ণ স্বীয় সৈন্য সহকারে লক্ষ্মীনারায়ণকে ঘেরাও করিলেন। ধৃত অবস্থায় লক্ষ্মীনারায়ণকে উদয়পুরে আনা হয়, কল্যাণমাণিক্য অপরাধীকে মার্জ্জনা করেন। আচরঙ্গ দলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যমধ্যে স্ব স্ব প্রধান ভাব দূর হইয়া গেল, কল্যাণমাণিক্যের বাহুবলে রাজত্ব সুরক্ষিত হইল। তিনিই কল্যাণপুরের স্থাপয়িতা।

(৪)

কল্যাণমাণিক্য ও বাদসাহী ফৌজ

যশোধরমাণিক্যের সহিত বাদসাহ যে সমর করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় পুনরায় দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট হস্তিবল সংগ্রহের জন্য এক তাগিদ আসিল। নবাব ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য তোড়জোড় করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক ধূলি সমাচ্ছন্ন করিয়া নবাবের ফৌজ ঝড়ের মেঘের মত ত্রিপুরার আকাশে উদিত হইল, মহা দুর্দ্দিন উপস্থিত! কল্যাণমাণিক্য দূতমুখে এই সংবাদ শুনিয়া অসীম সাহসে বুক বাঁধিয়া সমরায়োজন করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরার স্বাধীনতা রক্ষায় ত্রিপুর বীরেরা সমরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। মোগল সৈন্য ত্রিপুরার সীমান্তে আসিয়া পড়িল, নবাবের পত্র লইয়া দূত ত্রিপুর-শিবিরে পৌঁছিলে

মহারাজের সম্মুখে পত্র পাঠ হইল। তাহাতে লেখা ছিল, ত্রিপুরেশ্বর যেন বাদশাহের নজরানা স্বরূপ সহস্র হস্তী পাঠাইয়া দেন। ত্রিপুর দরবার হইতে জানান হইল, ত্রিপুরেশ্বর বশ্যতা স্বীকারে অসমর্থ, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিবেন, তথাপি মাথা নীচু করিবেন না।

বীরত্বপূর্ণ ত্রিপুরলিপি পাঠে মোগল শিবিরে রণচাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। দুই পক্ষে ঘোর সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কৈলাগড়ে ত্রিপুর সৈন্যের সমাবেশ হইল, কমলা সাগরের পশ্চিমে মোগল সেনাবাস রচিত হইল। জীবণ পণ করিয়া ত্রিপুর সেনা দুর্জ্জয় সাহসে যুঝিতে লাগিল। গোবিন্দনারায়ণ সৈন্যের অগ্রভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন আর মহারাজ স্বয়ং ত্রিপুর বাহিনীর মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া রণক্ষেত্রে ত্রিপুর সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। যেখানে উদ্যম ভঙ্গ লক্ষিত হইতেছিল, শাণিত কৃপাণহস্তে বর্ম্মপরিহিত মহারাজ সেইখানে অশ্বারোহণে যাইয়া যুদ্ধের গতি ফিরাইয়া দিতেছিলেন। এইভাবে এক অখণ্ড তেজে ত্রিপুরসৈন্যেরা যুঝিতে লাগিল। মোগলসৈন্যেরা তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া যুদ্ধের শেষ অস্ত্র কামান প্রয়োগ করিল। বড় বড় কামানের গোলা আসিয়া কৈলাগড়ে পড়িতে লাগিল। গোবিন্দনারায়ণ মহারাজকে আনিয়া গোলা দেখাইলেন। তখন যুদ্ধের কৌশল পরিবর্ত্তন করিয়া শত্রুপক্ষকে বুঝান হইলে যেন ত্রিপুরসৈন্যেরা

রণক্ষেত্র হইতে হঠিয়া গেল। কারণ সম্মুখ সমর ত্যাগ করিয়া সৈন্যেরা পর্ব্বতগাত্রে গা ঢাকা দিয়া রহিল। যখন তোপ দাগা বিরাম হইল তখন গোবিন্দনারায়ণ বুঝিলেন, ত্রিপুর সৈন্য সমূলে বিধ্বস্ত হইয়াছে ভাবিয়া এইবার মোগলেরা তাহাদের গড় ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে পারে।

তখন সন্ধ্যা সমাগত, কল্যাণমাণিক্য শিবিরে বিশ্রাম করিতে করিতে কুলদেবতা স্মরণ করিতেছেন—স্বদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন, এ যাত্রা সে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি? গোবিন্দ-নারায়ণের উপর প্রধান সেনাপতির ভার অর্পণ করিয়া মহারাজ বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে। মহারাজ মুক্ত আকাশে দেখিলেন একটি একটি তারা ফুটিতেছে, ইহারা জয় পরাজয়ের বার্ত্তা বহন করে—ত্রিপুরার ভাগ্যে জয় না পরাজয়?

গভীর নিশীথে গোবিন্দনারায়ণ মোগল শিবির আক্রমণ করিলেন, ত্রিপুর সৈন্যের অতর্কিত আগমনে মোগল বাহিনী বে-কায়দায় পড়িয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া গোবিন্দনারায়ণ এরূপ প্রবল চাপ দিলেন যে মোগল সৈন্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। দুর্গ প্রাকারে নাকাড়া বাজিলেও মোগলের সৈন্যসজ্জা ঘটিয়া উঠিল না। চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা, অর্দ্ধসুপ্ত সৈনিকেরা চোখ কচ্‌লাইয়া দেখিল—এ কাহারা? হাতে কৃপাণ তুলিয়া লইবার পূর্ব্বেই তাহাদের ছিন্নমুণ্ড ধূলিতে গড়াইতে লাগিল। গোবিন্দনারায়ণের সমরকৌশলে মোগলেরা সম্পূর্ণরূপে

পরাজিত হইল, বাদসাহী ফৌজের যাহারা হতাবশিষ্ট ছিল তাহারা প্রাণ লইয়া কোনওরূপে পলায়ন করিল। মোগলের পরাজয় বার্ত্তায় ত্রিপুরার খ্যাতি দিগ্‌দিগন্ত ছাইয়া গেল, প্রধান সেনাপতি গোবিন্দনারায়ণের জয়-ঘোষণায় ত্রিপুরা রাজ্য মুখরিত হইয়া উঠিল!

যুদ্ধজয়ের অনতিকাল মধ্যেই মহারাজ কল্যাণমাণিক্য গোবিন্দনারায়ণকে যৌবরাজ্য প্রদান করেন, শুভদিনে এই পুণ্যকার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। মহারাজের শেষকাল বহুবিধ পুণ্য-কার্য্যের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ভারত ইতিহাসে হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে যেরূপ দান-কাহিনী প্রচলিত আছে, কল্যাণ-মাণিক্য সম্বন্ধেও সেইরূপ আখ্যান শুনা যায়। বিবিধ দানের মধ্যে তাঁহার তুলাদান বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। যজ্ঞ-হোম অন্তে মহারাজ তুলাদণ্ডে ধর্ম্মের আসনে বসিলেন—অপর দিকে ধনুরত্ন রাখিয়া তাঁহার সমান ওজন করা হইল। তখন আসন হইতে নামিয়া আসিয়া মহারাজ সেই ধনরত্ন উৎসর্গ করিয়া দান করিলেন। নিজ পুরোহিত সিদ্ধান্তবাগীশকে তিন হস্তী, পঞ্চ অশ্ব, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং মেহেরকুলে এক গ্রাম উৎসর্গ করিয়া দিলেন। তাঁহার তুলাদান কালে উদয়পুরে পঞ্চদশ সহস্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। সেতুবন্ধ মথুরা বারাণসী উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ হইতে দানগ্রাহীরা সমাগত হইয়াছিল। চন্দ্রপুরে উদয়মাণিক্য প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রনাথ গোপীনাথ মূর্ত্তি অমর-মাণিক্যের রাজত্বকালে মঘেরা লইয়া গিয়াছিল, নিজ বাহুবলে

চট্টগ্রাম হইতে সেই মূর্ত্তির পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া শূণ্যমঠে স্থাপন করেন। সেই মঠের বাম পার্শ্বে ধর্ম্মমঠ নামে নূতন এক মঠ স্থাপন করেন, পুরসম্মুখে বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূর্ব্বদিকে দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন, তাহারই সম্মুখভাগে দুর্গাগৃহ নির্ম্মিত হইল। উদয়পুরে তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তিসমূহ ভগ্নাবস্থায় আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

"কৈলাগড় দুর্গ মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত সিংহবাহিনী মহিষাসুর-মর্দ্দিনী দশভুজা ভগবতী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ প্রতিমার নিম্নভাগে একটি শিবলিঙ্গ খোদিত থাকায় কালীমূর্ত্তি বলিয়া আখ্যাত হয় (তদন্তে দুর্গমধ্যে চ স্থাপয়ামাস কালিকাং —সংস্কৃত রাজমালা)। এই দেবীর মন্দির দুর্গমধ্যস্থিত উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। দুর্গের পশ্চাদ্ভাগে অনন্তবিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার সম্মুখভাগে যতদূর দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় সমতল ক্ষেত্র করতলস্থ রেখার ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সমতল ক্ষেত্র হইতে এই মন্দির কিম্বা দুর্গ কিছুমাত্র লক্ষ্য হয় না।"*

এই দুর্গের আশ্রয়েই ত্রিপুরসৈন্য বাদসাহী ফৌজের পরাজয় সাধনে সক্ষম হয়। "মহারাজ কল্যাণমাণিক্য 'হরগৌরী' নাম স্বীয় নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা নির্ম্মাণ

* কৈলাস সিংহ প্রণীত রাজমালা, পৃঃ ৮২।

করিয়াছিলেন।" (কৈলাসসিংহ প্রণীত রাজমালা, পৃঃ ৮০) ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া মহারাজ পরলোক গমন করেন।

কল্যাণমাণিক্য গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের কালে ত্রিপুরা রাজ্য গৌরবের উচ্চ সীমায় আরোহণ করে, তৎপর সুযোগ্য বংশধরের অভাবে এবং সেনাপতির সিংহাসন অধিকারহেতু ত্রিপুর-রাষ্ট্রে পুনরায় দুর্ব্বলতা প্রবিষ্ট হয়। যদিচ অমরমাণিক্যের সুদৃঢ় ভুজবলে রাষ্ট্রের পুনরুদ্ধার ঘটে তথাপি তাঁহার পুত্রগণ মুকুটের প্রলোভনে মঘরাজের নিকট যে পরিমাণে হৃতশক্তি হন সে পরাজয়ের বেগ তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। ত্রিপুরা রাজ্য ক্রমেই দিকে দিকে খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল। কল্যাণমাণিক্য স্বীয় অমিত বাহুবলে পুনরায় নষ্টশক্তির কিয়ৎপরিমাণে উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন এবং যে গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, পরলোক গমন-কালে সেই নৈরাশ্যের তিমির ভেদ করিয়া আশার আলোকে ত্রিপুরা রাজ্য ভরিয়া তুলিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি।

১৫৭৩ শকাব্দে কল্যাণমাণিক্য, উদয়পুরে ধন্যমাণিক্য নির্ম্মিত শিবমন্দিরের সংস্কারসাধন করেন।

শ্রীশ্রীকল্যাণদেবস্ত্রিপুর-নরপতি···প্রাদাৎ···ভক্তিতঃ শঙ্করায়। শাকে ১৫৭৩।

(৫)

গোবিন্দমাণিক্য ও নক্ষত্র রায়

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দমাণিক্য পিতৃসিংহাসন আরোহণ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দমাণিক্যের আখ্যানভাগ অবলম্বনে 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জ্জন' রচনা করেন। কবির অমর লেখনী দ্বারা গোবিন্দমাণিক্যের নাম বঙ্গভাষায় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মহাকবির রচনা দ্বারা ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এরূপ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন যে তাঁহাদের অপেক্ষা শৌর্য্যে বীর্য্যে ইতিহাসে উচ্চস্তরের বীর থাকিলেও, সেই সকল বীর ইতিহাসের পাতায়ই নিবদ্ধ থাকিয়া যান, তাঁহাদের নাম সাহিত্যজগতে আসে না। ইতালীর অমর কবি দান্তে তদীয় বন্ধু কেসেলাকে যে অমর আসন দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতালীয় বহু বীরের ভাগ্যে ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথও তেমনি গোবিন্দমাণিক্যকে বাঙ্গালী জাতির মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, শৌর্য্যে বীর্য্যে ত্রিপুর সিংহাসনে তাঁহা অপেক্ষা গরীয়ান্ রাজা বসিলেও তাঁহাদের নাম ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের বাতায়নে তাঁহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

গোবিন্দমাণিক্যের অভিষেক কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। মোগল সমরে যাঁহার বলবীর্য্যের পরীক্ষা হইয়াছিল

তাঁহার হস্তে ত্রিপুরার দাজদণ্ড ন্যস্ত হওয়ায় সকলের চিত্তে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু ঈর্ষীর মনে তাহাতে সুখ হয় না, তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের মনে রাজ্যলোভ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। রাজপুত ইতিহাসে রাণা প্রতাপের সহিত শক্ত সিংহের যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল, গোবিন্দমাণিক্যের সহিত নক্ষত্ররায়ের সেই সম্বন্ধ সৃষ্টি হইল। গোবিন্দমাণিক্যের কানে নানা কথা ভাসিয়া আসিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়কে ঘেরিয়া চক্রান্তকারীদের সাহায্যে ষড়যন্ত্রের জাল ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিল। রাণা প্রতাপকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য শক্ত যেমন আকবরের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, নক্ষত্ররায়ও তেমনি মোগল দরবারে আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন।

ভ্রাতৃবিরোধের করালছায়াপাতে ত্রিপুর-রাষ্ট্রের শান্তি সুখ অন্তর্হিত হইতেছিল। সে সময়ে সাজাহান-পুত্র সুজা বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা, নক্ষত্ররায় তাঁহার সহিত রাজদ্রোহমূলক সম্বন্ধ স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া গোবিন্দমাণিক্যের উদার হৃদয় ব্যথিত ও বিচলিত হইল। 'রাজর্ষি'তে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অমর লেখনী দ্বারা গোবিন্দমাণিক্যের অপূর্ব্ব স্বদেশ প্রীতি ও অতুলনীয় আত্মত্যাগ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অভিষেক হইবার কয়েক মাস মধ্যেই গোবিন্দমাণিক্য যখন বুঝিতে পারিলেন, নক্ষত্ররায় রাজমুকুটের লোভে স্বদেশের সর্ব্বনাশ ঘটাইবে তখন তিনি রাজর্ষির ন্যায় সর্ব্বস্ব ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন! পাত্রমিত্র মন্ত্রী সভাসদ্ সকলের পরামর্শ অনায়াসে

পরিহার করিয়া মহারাজ নক্ষত্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ কামনা করিলেন। নিভৃতে দুই ভাইয়ের মিলন হইল। মহারাজ বলিলেন "ভাই, তুমি যখন সিংহাসন চাও, নবাবের সাহায্যের



মহারাজ নক্ষত্ররায়কে সিংহাসনে বসাইয়া রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন।

প্রয়োজন কি? এসো, আমিই তোমাকে সকলের সমক্ষে

সিংহাসনে বসাইয়া রাজা বলিয়া ঘোষণা করি।” তাহাই হইল, পাত্র মিত্র মন্ত্রী সভাসদে দরবার গৃহ পূর্ণ হইল, মহারাজ নক্ষত্ররায়কে সিংহাসনে বসাইয়া রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন। তারপর সভা লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বলিলেন, “অদ্য হইতে নক্ষত্ররায় আমার স্থলে অভিষিক্ত হইলেন, ভাইকে সিংহাসনে বসাইয়া আমি সানন্দে বনে চলিয়া যাইতেছি! আমার স্বদেশের কল্যাণ হউক, ইহাই আমি বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি।” মহারাজের বাক্য শুনিয়া সকলের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। এইরূপে উদয়পুর যখন অশ্রুজলে ভাসিতেছিল গোবিন্দমাণিক্য রাণী গুণবতী ও কয়েকজন পরিজন সহ নিঃশব্দে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বনের পথে অদৃশ্য হইলেন।

ভ্রাতৃবিরোধের সমরানল জ্বলিয়া না উঠিতেই নিভিয়া গেল। গোবিন্দমাণিক্যের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে বিরোধের দাবানল আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পাইল না। যদি মহারাজ স্বেচ্ছায় নিজ অধিকার ছাড়িয়া না দিতেন তবে পরিণাম কি হইত তাহা দিল্লীর সিংহাসনের দিকে দৃষ্টি করিলেই অনায়াসে প্রতীত হয়। ঠিক সেই সময়ে ময়ূরসিংহাসনের লোভে ভারতব্যাপী সমরানল জ্বলিয়া উঠে এবং দারার ছিন্নমুণ্ড ভূমিতে গড়াইয়া পড়ে।

(৬)

আরাকান রাজ্যে গোবিন্দমাণিক্য ও সুজা

রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া গোবিন্দমাণিক্য প্রথমতঃ রিয়াং প্রজাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে কিছুকাল থাকার পর রাণী গুণবতী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন প্রজাদের আদর যত্ন যেন ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। অদৃষ্ট যাহার প্রতি সুপ্রসন্ন নহে তাহার প্রতি কাহারও অনুরাগ জন্মে না। দুঃসময় এমনি, যে রাজদর্শন প্রজাদের একান্ত কাঙ্খনীয় সে রাজা আসিয়া প্রজাদের সহিত স্বয়ং বাস করিতে চাহিতেছেন তথাপি ইঁহাদের মনে সন্তোষ নাই, কতদিনে রাজরাণী বিদায় হইবেন সেই প্রতীক্ষায় যেন ইহারা অধীর হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় ত আর থাকা চলে না! অবশেষে রাজারাণী ত্রিপুরা রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রিয়াং বাস সমাপনান্তে গোবিন্দ-মাণিক্য চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যাঞ্চলে উপনীত হইলেন। এক সময়ে যে আরাকান রাজের সহিত ত্রিপুরার ভীষণ শত্রুতা ছিল সেই আরাকানপতির রাজধানী রসাঙ্গ প্রান্তে যাইতেই মঘরাজের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিল। অদৃষ্ট এইবার সুপ্রসন্ন হইল, মঘরাজ রাজ্যহীন গোবিন্দমাণিক্যকে পথের কাঙ্গাল ভাবিয়া উপেক্ষা করিলেন না, আতিথ্য দিতে সম্মত হইয়া নিজ অনুচরবর্গকে পাঠাইয়া দিলেন।

গোবিন্দমাণিক্যের সহিত তৎকালে অনুজ জগন্নাথ, যুবরাজ রামদেব, জগন্নাথ-তনয় সূর্য্যপ্রতাপ ও চম্পকরায় ছিলেন। রাণী ও স্বীয় পরিজনবর্গসহ গোবিন্দমাণিক্য আরাকানপতির আতিথ্য-গ্রহণ করিয়া সেখানে বসবাস করিতে লাগিলেন। এদিকে অদৃষ্ট চক্রের ঘূর্ণনে যে সুজা বঙ্গের শাসনকর্ত্তাপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নক্ষত্ররায়কে ত্রিপুরসিংহাসনে বসাইলেন, তিনি কিয়ৎকাল মধ্যেই মসনদ্‌চ্যুত হইয়া গোবিন্দমাণিক্যের ন্যায় পথে পথে ফিরিতে লাগিলেন। নিয়তির কি পরিহাস! গোবিন্দমাণিক্য যে আরাকানপতির আশ্রয়ে দিনপাত করিতেছিলেন, সেই একই স্থানে সুজা ঔরঙ্গজেবের ভয়ে কোনওরূপে প্রাণে বাঁচিবার জন্য বেগম ও সাহজাদীসহ আশ্রয়প্রার্থী হইলেন।

তখন রসাঙ্গরাজ ও গোবিন্দমাণিক্য আলাপে রত ছিলেন এমন সময় কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় সুজা আসিয়া উপস্থিত। গোবিন্দমাণিক্য স্বীয় স্বভাবের ঔদার্য্যে তৎক্ষণাৎ নিজ আসনে সুজাকে বসিতে দিলেন। রসাঙ্গরাজের ইহা অভিপ্রেত ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলিয়া উঠিলেন—"ম্লেচ্ছ সুজাকে দেখিয়া আপনার আসন ত্যাগের কোন কারণ নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাকিতে পারেন।" কিন্তু সুজা ন্যায়তঃ এ সম্মান তাঁহার নিকট পাইতে পারেন এই বলিয়া গোবিন্দমাণিক্য শিষ্টাচার দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না। রসাঙ্গরাজের বাক্যে সুজার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা এক অন্তর্যামীই বুঝিয়াছিলেন। হায় মানুষের অদৃষ্ট!

সুজা রসাঙ্গরাজের নিকট যে অভ্যর্থনা পাইলেন তাহা দ্বারাই অনুমান করা যায় আরাকান বাস তাঁহার পক্ষে কিরূপ সুখের হইবে। আরাকান রাজ্যের বাহিরে সুজার গতি ঐতিহাসিকেরা জানিতে পারেন নাই, তাই সুজার পরিণাম ইতিহাসে গভীর রহস্যময়। একমাত্র অন্তর্যামীর নিকটই ইহার সন্ধান রহিয়াছে।

যখন আরাকান-রাজের দরবার ভঙ্গ হইল তখন সুজা ও গোবিন্দমাণিক্য মঘরাজের নিকট বিদায় চাহিয়া বাহিরে আসিলেন। মঘরাজের প্রতিহারী শুনিতে না পায় এইভাবে রাজভবন হইতে একটু ব্যবধানে আসিয়া সুজা গোবিন্দমাণিক্যের হাত ধরিয়া বলিলেন—"মহারাজ, আপনি আজ আমার মুখ রাখিয়াছেন, যদি আপনি আসন ত্যাগে আমাকে এই সম্মান না দিতেন তবে আমার মর্য্যাদা কোথায় থাকিত? ভাগ্যের তাড়নায় আমি আজ সর্ব্বস্বান্ত, কি দিয়া যে আপনার ঋণ শোধ করিব বুঝিয়া উঠিতে পারি না।" এই বলিয়া সুজা ক্ষণকাল অধোবদনে রহিলেন, তারপর নিজহস্ত হইতে হীরার অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া মহারাজের হাতে পরাইয়া বলিলেন—"মহারাজ, দুর্ভাগা সুজার স্মরণ-চিহ্নটুকু ধারণ করুন, এই আমার অনুরোধ।" গোবিন্দমাণিক্য সসম্মানে সে অনুরোধ রক্ষা করেন।

ভাগ্যবিপর্য্যয়ে রাজ্যভ্রষ্ট উভয় নৃপতিরই দিন রসাঙ্গে কাটিতে লাগিল। সুজা একবার শেষ অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য চেষ্টা পাইলেন। তিনি মঘরাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আরাকানপতির সহিত মেলামেশা করিতে লাগিলেন। রসাঙ্গের

এক প্রান্তে গভীর পর্ব্বতমালার মধ্যে তাঁহার ভবন নির্ম্মিত



সুজা নিজ হস্ত হইতে হীরার অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া
মহারাজের হাতে পরাইয়া দিলেন।

হইয়াছিল। মঘরাজকন্যা সেই ভবনে কখনো কখনো বাস

করিতেন আবার বাপের বাড়ী চলিয়া আসিতেন। এই ভাবে রাজকন্যার যাওয়া আসার ধূমধাম কিছুকাল চলিল। একবার রাজকন্যা বাপের বাড়ী যাইতেছে এই অছিলায় সারি সারি দোলা সাজান হইল, সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে স্ত্রী-বেশধারী চল্লিশ জন মল্ল ঐগুলিতে প্রবেশ করিয়া দ্বার রোধ করিয়া রহিল। যখন শিবিকা-বাহকেরা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রথম ফটকে পৌঁছিল তখন প্রতিহারী বাধা দিতে চাহিলে জানান হইল রাজদুহিতা পিত্রালয়ে যাইতেছেন। ফটক খুলিয়া গেল, এই ভাবে একে একে ছয়টি ফটত পার হইয়া যখন সর্ব্বশেষ ফটকে পৌঁছিল সেখানকার প্রহরীরা সঙ্গীন উঁচু করিয়া জোরে হাঁকিল—কোন্ হ্যায়? পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকেও বলা হইল, সেবিকাসহ রাজকন্যা আসিতেছে, পথ ছাড়! কিন্তু প্রহরীদের সন্দেহ হইল—রাজকন্যার সঙ্গে এত পাল্‌কির কি দরকার? এই বলিয়া তাহারা বাহকগণকে তাড়া করিল। বাহকেরা পাল্‌কি ফেলিয়া সরিয়া গেল।

তখন বেশ সন্ধ্যা হইয়াছে, উদ্যানের পথে অন্ধকার ভরিয়া উঠিয়াছে, রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ ঝাড় লণ্ঠন হইতে আলোকরশ্মি সাছের ফাঁকে ফাঁকে পড়িয়াছে। প্রহরীদের হুমকিতে যখন বাহকেরা সরিয়া গেল তখন দোলার দ্বার খুলিয়া চল্লিশ জন মোগল মল্ল বাহির হইয়া আসিল, উভয়ে লড়াই বাঁধিয়া গেল। একজন প্রতীহার নাকাড়া বাজাইয়া দিল। সঙ্কট সঙ্কেত পাওয়া মাত্র দুর্গ হইতে পিল্ পিল্ করিয়া সৈন্যের স্রোত ছুটিল।

এমন অবস্থায় মোগলেরা আর কি করিবে, প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর ফিরিবার উপায় রহিল না। মঘরাজের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিল, তিনি সুজার চতুরতা বুঝিতে পারিলেন। রাজ্যচ্যুত হইয়া আপন আশ্রয়দাতার সিংহাসন অধিকারেও যখন সুজা উদ্যত হইয়াছে তখন তাঁহাকে ত আর আশ্রয় দেওয়া চলেনা। এই ভাবিয়া সুজাকে বন্দী করিবার জন্য ফৌজ পাঠাইয়া দিলেন। দুর্ভাগা সুজার দুর্ভাগ্য চরমে পৌঁছিয়াছিল, আপন মোগল বাহিনীর পরাজয়বার্ত্তা জানিয়া সুজা সেই রজনীর গভীর অন্ধকারে বেগম পরিভানু ও সাহজাদীসহ রসাঙ্গ ত্যাগ করিলেন। মঘরাজ-সৈন্যে চতুর্দ্দিক ছাইয়া গেল, সুজার খোঁজে ইহারা আতিপাতি করিয়া সমস্ত বন অন্বেষণ করিল কিন্তু সুজা নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন, সুজাকে কোথাও পাওয়া গেল না, সেই রাত্রির অন্ধকারে যেন সুজা চিরতরে মিলাইয়া গেলেন।*

* রাজমালায় বিবৃত কাহিনী এইরূপ কিন্তু কৈলাস সিংহ প্রণীত পুস্তকে ভিন্ন বিবৃতি রহিয়াছে। মঘরাজ সুজার বেগম ও কন্যাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করায় সুজা উহা প্রতিরোধ করিতে যাইয়া মঘরাজের চক্রান্তে জলে ডুবিয়া প্রাণ হারান এবং তৎপর বেগম ও সাহজাদীরা স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন; সুজার তৃতীয় কন্যা মঘরাজ-অন্তঃপুরে স্থান প্রাপ্ত হন। রাজমালার সহিত এ কাহিনীর পার্থক্য থাকিলেও সুজার পরিণাম যে বিষাদময় ইহাই প্রতীত হয়।

(৭)

গোবিন্দমাণিক্যের পুনরভিষেক

সুজার ভাগ্যে অদৃষ্টের অন্ধকার-রাত্রি আর পোহাইল না কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের দুর্ভাগ্য রজনী প্রভাত হইল। সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া নক্ষত্ররায় পরলোকগমন করেন, এ সংবাদ শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া গেল। মঘরাজ যখন এ সংবাদ পাইলেন তখন গোবিন্দমাণিক্যকে রাজসভায় ডাকাইয়া আনিলেন—"মহারাজ, আপনার দুঃখের দিন ফুরাইয়াছে এখন ত্রিপুরা অভিমুখে যাত্রা করুন। নক্ষত্ররায়ের মৃত্যুতে সিংহাসন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, এ সিংহাসন আপনার, অপর কাহারও ইহাতে অধিকার নাই।" এই বলিয়া মঘরাজ গোবিন্দমাণিক্যকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়া বিদায় করিলেন। মঘরাজের আগ্রহ ও সৌজন্য দৃষ্টে ইহাই মনে হয় যদি সৈন্য সাহায্যের প্রয়োজন হইত তবে আরাকানপতি তাহাতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

রাণী গুণবতী ও পরিজনসহ মহারাজ রসাঙ্গ ত্যাগ করিয়া চট্টগ্রাম আসিলেন। সমতল ক্ষেত্রে পৌঁছিতেই উদয়পুর হইতে প্রেরিত দূতগণ আসিয়া মহারাজের চরণ বন্দনা করিয়া নক্ষত্র রায়ের পরলোক-প্রাপ্তি-সংবাদ জানাইল। মহারাজ যখন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় ত্রিপুরবাসী পথ চাহিয়া আছে তখন তাঁহার দ্বিধা কাটিয়া গেল।

তিনি সসম্মানে অভ্যর্থিত হইয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রজাবৎসল গোবিন্দমাণিক্য স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিতেছেন, এ সংবাদে ত্রিপুরাবাসীর আর আনন্দ ধরে না— রঘুপতি যেন বনবাস অন্তে স্বরাজ্যে ফিরিতেছেন! মহারাজের আগমন বার্ত্তায় উদয়পুর আনন্দ মুখরিত হইয়া উঠিল, পুরদ্বারে মহারাজ বিজয়মাল্যে ভূষিত হইলেন, দেবালয়ে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। যিনি প্রজার হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতেই অভিষিক্ত হইয়া আছেন তাঁহার পুনরভিষেকে সকলেরই মন পুলকে নাচিয়া উঠিল।

নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নাম গ্রহণে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার স্মৃতি অধুনালুপ্ত 'ছত্রসাগর' নামক দীঘিতে, ও কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী 'ছত্রের খীল' ও চান্দিনা থানার অন্তর্গত 'ছত্রের কোট' ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অন্তর্গত 'ছত্রপুর' প্রভৃতি গ্রামের নামে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।* গোবিন্দমাণিক্য যখন পুনরায়

* কৈলাস সিংহ প্রণীত পুস্তকে এইস্থানগুলির উল্লেখ আছে, রাজমালায় ইহাদের উল্লেখ নাই। সিংহ মহাশয়ের পুস্তকে Tavernier-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"টেবার্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ছত্রমাণিক্যের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। টেবার্ণিয়ার বলেন যে মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমা আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকান নামক তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্যের সহিত সংযুক্ত। টেবার্ণিয়ার স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে স্বর্ণ ও তসর বাণিজ্যার্থে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য সমুৎপন্ন স্বর্ণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে।"—Tavernier's Travels in India, P. 156.

রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন তখন ছত্রমাণিক্য-তনয় কুমার উৎসব রায় উদয়পুর ত্যাগ করিয়া ঢাকা চলিয়া যান। উদার হৃদয় গোবিন্দমাণিক্য ভ্রাতুষ্পুত্রের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উৎসব রায়কে কাদবা, বেদারা ও আমিনাবাদ এই তিন পরগণা দান করেন।

বর্ত্তমানেও নক্ষত্ররায়ের বংশ ঢাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। নক্ষত্ররায়ের ধারাভুক্ত স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয়ের উল্লেখ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইনি কিছুকাল পূর্ব্বেও শাসন-পরিষদের মেম্বররূপে পোর্টফলিও অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনায় সুনাম অর্জ্জন করেন।

(৮)

গোবিন্দমাণিক্যের নিকট আওরঙ্গজেবের পত্র

গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সুজাকে বন্দী করিয়া লইবার জন্য দিল্লীর দরবার হইতে নানা তদ্বির আসিতে লাগিল। ভাগ্যহীন সুজা যদি সে রাত্রে পলায়নে সক্ষম হইয়া থাকেন তবে পলায়মান অবস্থায় তাঁহার জীবন কিরূপ দুর্ব্বহ হইয়াছিল তাহা নিম্নোক্ত পত্র হইতে অনায়াসেই অনুমিত হইবে, কারণ দারার ছিন্নমুণ্ডের ন্যায় তাঁহার ছিন্নমুণ্ডের জন্য শাণিত তরবারি লইয়া দিকে দিকে লোক ছুটিয়াছিল। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য দিল্লীর বাদসাহ

আওরঙ্গজেব হইতে নিম্নোক্ত পত্র প্রাপ্ত হন। পত্রখানি ফারসী ভাষায় লিখিত। *

অদ্বিতীয় উজ্জলমণি-বংশজ বিষমসমরবিজয়ী পঞ্চ শ্রীযুত
মহারাজ গোবিন্দকিশোর মাণিক্য বাহাদুর—

জগদীশ্বর আপনার রাজ্যশাসন অক্ষুণ্ণ রাখুন !

আমরা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম যে, আমাদের পৈত্রিক শত্রু সুজা গুপ্তভাবে আপনার রাজ্যে অবস্থান করিতেছে। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ সভ্যতা ও স্বীয় ক্ষমতানুসারে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত বন্ধুতা ও একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় রাজ্যের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, পুরাতনকালে আফগান বংশ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মুক্ত কৃপাণ সম্মুখে পলায়ন করতঃ আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ-পতাকা উড়াইলে, আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বোক্ত একতা ও বন্ধুতা বলে ঐ হতভাগ্যগণকে পূর্ব্ব-বাঙ্গলা হইতে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে বিপদাপন্ন করতঃ স্বদেশ অভিমুখে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। †

সুতরাং আশা করি বর্ত্তমানে আমাদের লেখা অনুযায়ী উল্লিখিত শত্রুকে বন্দী করিয়া আমাদের রাজ্যে প্রেরণ করিবেন। যদি মহারাজের অনুমতি হয় তবে আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষকে মুঙ্গের

* উমাকান্ত একাডেমীর হেড্ মৌলবী সিরাজুল ইসলাম "কর্ত্তৃক অনূদিত।

† বিজয়মাণিক্যের কালে গৌড়ের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং পাঠানেরা ত্রিপুরেশ্বর হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

জেলাতে উপস্থিত থাকিয়া অপেক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিব। অতঃপর তাহাকে ধৃত করিলে বিশেষ যত্ন ও সতর্কতা সহকারে আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষের হাওয়ালা (অর্পণ) করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করতঃ পুরাতন জাবেতা অনুযায়ী বন্ধুতার শৃঙ্খল দৃঢ় করিবেন। নতুবা সম্পূর্ণ বিশ্বাস, যদি সেই অপরিণামদর্শী আপনার রাজ্যে অবস্থান করে তবে নিশ্চয়ই রাজ্যের অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিবে সন্দেহ নাই। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই যে পুরাতন বন্ধুতা অনুযায়ী উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

নিবেদক
আলমগীরসাহ
দিল্লীর সম্রাট্।

গোবিন্দমাণিক্য সবেমাত্র সিংহাসনে বসিয়াছেন, এরই মধ্যে প্রবল পরাক্রম আলমগীর বাদসাহের চিঠিতে তিনি নিশ্চয়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুজার নিরুদ্দেশ যাত্রার সংবাদ তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন। সুজা যতকাল ধৃত না হইবে বাদসাহ হয়ত ভাবিবেন ত্রিপুরেশ্বর তাঁহাকে শৈলমালার মধ্যে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন। বাদসাহের এই সন্দেহের মূলে রাজত্বের সমূহ অনর্থ ঘটিতে পারে। একবার সুজার চক্রান্তে রাজ্যহারা হইয়াছিলেন, এবার বাদসাহের রোষে পড়িলে কি না ঘটিতে পারে? তাই যশোধরমাণিক্য হইতে হস্তী লইয়া এ যাবৎ দিল্লীর সম্রাটের সহিত যে মন কষাকষি চলিতেছিল এক্ষণে তাহা মানিয়া লইয়া

বিরোধের অবসান ঘটাইলেন। স্থির হইল ত্রিপুরেশ্বর দিল্লীর সম্রাটকে বার্ষিক যত হস্তী ধৃত হইবে তাহার অর্দ্ধেক নজরানা স্বরূপ প্রদান করিবেন, তবে পাঁচ হস্তীর কম দিবেন না। এইভাবে গোবিন্দমাণিক্য কিঞ্চিৎ ন্যূনতা স্বীকার করিয়াও বাদসাহকে প্রীত করাইয়া নিজ রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

দিল্লীশ্বরের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন বটে কিন্তু সর্ব্বহারা সুজার স্মৃতি গোবিন্দমাণিক্যের চিত্তে নিষ্প্রভ হয় নাই। নিজে সৌভাগ্য-সোপানে আরোহণ করিলেও দুর্ভাগা সুজার স্মৃতি মহারাজের উদার হৃদয় ব্যথিত করিত। রসাঙ্গ বাসের দুঃখের দিনগুলি তাঁহার বিশ্রাম সময়ে কখনও কখনও মনে পড়িত আর মনে পড়িত সুজা যে তাঁহার হাতে হীরকাঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই করুণ চিত্র তাহার প্রাণে অশ্রুময় ঝঙ্কার তুলিত। সুজার দুঃসময়ের দান তিনি আপন অভাব অনটনের মধ্যেও সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এইবাব সেই দানটিকে সুজার স্মৃতি রক্ষার কার্য্যে লাগাইতে ইচ্ছা করিয়া হীরকাঙ্গুরীয় বিক্রয় করাইলেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা গোমতী নদীর তীরে বৃহৎ "সুজা মসজিদ' নির্ম্মাণ করিলেন। মসজিদের নিকটে সুজাগঞ্জ নামে এক বাজার বসাইলেন, উদ্দেশ্য হয়ত এইরূপ থাকিবে মসজিদের ব্যয়ভার বাজারের আয়ে নির্ব্বাহ হইবে। 'সুজামসজিদ' নির্ম্মাণ গোবিন্দমাণিক্যের এক অতুলনীয় কীর্ত্তি; ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। নিজে হিন্দু রাজা

হইয়া অন্য ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এ গৌরব যেমন ইহার সহিত একদিকে জড়িত রহিয়াছে ইহার অপর দিকে রহিয়াছে সর্ব্বস্বান্ত জনের স্মৃতিরক্ষা এবং তাহাও আবার বিপুল বিক্রম আওরঙ্গজেবের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া। মসজিদের প্রাত্যহিক নমাজ দ্বারা নিরুদ্দিষ্ট সুজার ইহলোকে বা পরলোকে শান্তি সুখ হওয়ার বিষয় ইতিহাসের আলোচ্য না হইলেও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রতি চক্ষু রাখিয়া একথা অবশ্যই বলিতে হয় গোবিন্দমাণিক্য সুজার একজন অকৃত্রিম বন্ধুর কার্য্যই করিয়াছিলেন।

(৯)

রাজর্ষির পরলোকগমন

গোবিন্দমাণিক্যকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। তিনি যথার্থই রাজর্ষি ছিলেন। চট্টলে চন্দ্রশেখর ভারত প্রসিদ্ধ অতি মনোরম তীর্থ, জটাকলাপে বিভূষিত হইয়া মহাদেব যেন সেই গগনস্পর্শী শৈলশিখরে বিরাজমান ত্রিশিখরে মহাদেব ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজিত, প্রথমে স্বয়ম্ভুনাথ, তৎপরে বিরূপাক্ষ, সর্ব্বোচ্চ শিখরে চন্দ্রশেখর। গোবিন্দমাণিক্য চন্দ্রশেখরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অতুল কীর্ত্তিলাভ করেন। চন্দ্রনাথ তীর্থে ত্রিপুররাজের তীর্থপুরোহিত স্বর্গীয় হর কিশোর অধিকারী স্বীয় সুরম্য 'চিত্রে চন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

"ত্রিপুরেশ্বর-দত্ত চন্দ্রনাথ-সেবাকার্য্যের দেবোত্তর সম্পত্তির বার্ষিক আয় দশ সহস্র।" গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মহারাজ তীর্থ দর্শনে বাহির হন, ভাগীরথীতীরে স্নান সমাপ্ত করিয়া তাম্রপত্রে সনদ লিখিয়া নানা দেশীয় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন। সেই সকল তাম্রশাসন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাণী গুণবতীর নামে কস্‌বা থানার অধীন জাজীয়াড়া গ্রামে গুণসাগর দীঘি খনন করা হয়।* গোবিন্দমাণিক্যের সহোদর ভ্রাতা জগন্নাথের নামে একটি এক মাইল ব্যাপী দীঘি খনন করিয়া রাজপুত্রের স্মৃতি অমর করা হয়। কুমিল্লা হইতে চট্টগ্রাম অবধি যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তায় খণ্ডলের সন্নিকটে এই দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের এক অমূল্য সম্পদ।† মেহেরকুলে গোমতীর উভয় পার্শ্বে বহু সংখ্যক ঝিল থাকায় নদীর জলে শস্যের প্রচুর ক্ষতি হইত, তাই মহারাজ বহু অর্থ ব্যয়ে উভয় তীরে গাঙ্গাইল বাঁধিয়া দেন। এইরূপে পুণ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে মহারাজের জীবন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। সর্ব্বগ্রাসী কাল যখন

* গুণবতী ১৫৯০ শকাব্দে বিষ্ণুর উদ্দেশে উদয়পুরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। শিলালিপিপাঠ কবিত্বপূর্ণ—মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য শৌর্য্যে রঘুর ন্যায়, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, সৌন্দর্য্যে কন্দর্পের ন্যায় এবং দানে বলির ন্যায়।

† উদয়পুরে প্রস্তর নির্ম্মিত জগন্নাথ মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। এই মন্দির গোবিন্দমাণিক্য ও অনুজ জগন্নাথ দেবের কীর্ত্তি—শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্য··· ততঃ কনীয়ান্ শ্রীজগন্নাথ···শ্রীবিষ্ণবে অনন্ত ধাম্নে প্রাদাৎ প্রাসাদমুত্তমং।

গোবিন্দমাণিক্যের জীবন হরণ করিল তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। শত শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মরদেহ ধরণীতে মিলাইয়া গেলেও গোবিন্দমাণিক্য স্বীয় কীর্ত্তির মধ্যে আজিও জীবিত, কারণ 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি'।

(১০)

রাম মাণিক্য

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ রামদেব মাণিক্য উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। রামমাণিক্যের শাসনকাল ঘটনা বিরল। তাঁহার চিত্তের ঔদার্য্যসূচক একটি কাহিনী আজিও এদেশে প্রচলিত আছে। সরাইলের জমিদার নুরমহম্মদের পুত্র নাছির শিকার উপলক্ষে রাজপুত্র চন্দ্রসিংহের মৃত্যুর কারণ হওয়ায় ত্রিপুরদরবার ইহার শাস্তি বিধানে উদ্যত হইলে, জমিদার নুরমহম্মদ পুত্রকে স্বয়ং শাস্তির জন্য মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। যখন নাছিরকে মহারাজের সম্মুখে আনা হইল, তখন রামমাণিক্যের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—'পুত্রহন্তাকে বধ করিয়া কি লাভ হইবে, যিনি সৃষ্টির কর্ত্তা তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন,' এই বলিয়া নাছিরকে মুক্তি দিলেন। উক্ত ঘটনা দ্বারা মহারাজের অপূর্ব্ব চিত্ত-সংযমেরই পরিচয় পাওয়া যায়, এরূপ ক্রোধ সংবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একান্ত বিরল।

নক্ষত্র রায় * হইতে মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত রাজদ্রোহ-সূচক সূত্র দৃষ্ট হয়, সেই সূত্র অবলম্বনে তাঁহার পিতার ন্যায় তাঁহারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিল। রামমাণিক্যের অনুজ দুর্গাঠাকুর-তনয় দ্বারকা নক্ষত্ররায়ের অভিনয় সুরু করেন। তিনি গোপনে মুর্শিদাবাদ যাইয়া নবাবের সাক্ষাৎ কামনা করেন। নবাব সকাশে ষড়যন্ত্রের বিষয় চাপিয়া যাইয়া কৌশলে কেবল এইটুকু জানান যে রামমাণিক্য বার্দ্ধক্য হেতু একেবারে স্থবির, রাজ্যশাসনে অপারগ। মুখে না বলিলেও ইঙ্গিতে বুঝাইতে চাহিলেন যদি নবাব সৈন্য সাহায্য করেন তবে দ্বারকা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া নবাবের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে পারেন। সুচতুর নবাব দ্বারকার বাক্য প্রত্যয় না করিয়া নিজ অনুচর পাঠাইয়া দেন।

নবাবের অনুচর এদিক সেদিক ঘুরিয়া সকল খবর সংগ্রহ

* রাজমালায় ঠাকুর উপাধি নক্ষত্র রায়ের সহিত যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। রত্নমাণিক্যও রাজা হইবার পূর্ব্বে রত্ন ঠাকুর নামে আখ্যাত হইতেন, তাঁহার অন্যান্য ভাইদের নামের সঙ্গেও ঠাকুর উপাধিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ে ঠাকুর উপাধি বর্ত্তমানের মহারাজ কুমার ও কুমারের স্থলবর্ত্তী ছিল।

"মহারাজ রামমাণিক্য স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রত্নদেব ঠাকুরকে যৌবরাজ্যে এবং "বড়ঠাকুর" নামে একটি নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া দ্বিতীয় পুত্র দুর্জ্জয়দেব ঠাকুরকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" কৈলাস সিংহের রাজমালা—৯৫ পৃঃ।

করিল, তারপর নবাবের গোচর করিল। নবাব যখন দ্বারকার চক্রান্ত বুঝিলেন তখন চক্রান্তকারীরা সরিয়া পড়িল।

স্বীয় নামে রামমাণিক্য রামসাগর খনন করেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কালপ্রাপ্ত হইলেন। *

(১১)

দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য

পিতার মৃত্যুর পর ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য পিতৃসিংহাসন আরোহণ করেন। তখন রত্নের বয়স অল্প। রত্নের মাতুল বলিভীমনারায়ণ রত্নের নামে রাজক্ষমতা পরিচালন করিতে লাগিলেন এবং নিজকে যুবরাজরূপে প্রচার করিলেন। রামমাণিক্যের অষ্টাদশ পুত্র ছিল, বলিভীম ইহাদিগের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারগণকে ক্রমে ক্রমে সরাইয়া ফেলিলেন। বলি-ভীমের দৌরাত্ম্য এতই বাড়িয়া উঠিল যে এ সংবাদ ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁর কানে উঠিল। তখন শায়েস্তা খাঁ ঢাকার শাসন কর্ত্তা, তিনি বলিভীমনারায়ণকে ধরিবার জন্য বহু সৈন্যসহ

* উদয়পুরে গোপীনাথের মন্দিরের পশ্চিমভাগে একটি মন্দির আছে উহার অস্পষ্ট শিলালিপি পাঠে প্রতীত হয় তিনি ১৫৯৫ শকাব্দে বিষ্ণুর উদ্দেশে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। গোমতী নদীর উত্তর পারে ভগ্নপ্রায় রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন মন্দির গাত্রে শিলালিপি পাঠে জানা যায় রামমাণিক্য ১৫৯৯ শকাব্দে তাঁহার পিতার স্বর্গলাভ কামনায় বিষ্ণুর উদ্দেশে ঐ মন্দির দান করেন।

কেশরীদাসকে কুমিল্লা প্রেরণ করেন। বলিভীম আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ধৃত হইলেন, প্রথমে তাঁহাকে ঢাকা নেওয়া হয় তৎপর মুর্শিদাবাদ নবাবের নিকট পাঠান হয়। এইরূপে বলিভীমের দুর্বৃত্তপণার অবসান ঘটে।

শায়েস্তা খাঁ বলিভীমের স্থানে কাহাকে বসাইবেন এই লইয়া চক্রান্ত চলিতে লাগিল। রামমাণিক্যের সময়ে দ্বারকা একবার সিংহাসনে বসিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন এইবার তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। শায়েস্তা খাঁর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ফৌজসহ দ্বারকা ঢাকা হইতে উদয়পুর আক্রমণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রত্নমাণিক্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক, দেশ-দ্রোহীর এরূপ সমরায়োজনে ভয় পাইয়া তিনি পরিজনসহ উদয়পুর ছাড়িয়া বনে প্রবেশ করিলেন। রামমাণিক্যের অনুজ জগন্নাথ-তনয় সূর্য্যনারায়ণ ছিলেন উজীর, অন্য তনয় চম্পক রায় ছিলেন দেওয়ান।* দ্বারকার আক্রমণে উজীরের মৃত্যু হয়; তখন বেগতিক দেখিয়া চম্পকরায় পলায়ন করেন। দ্বারকার দীর্ঘকালের সঞ্চিত উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইল, উদয়পুর সগৌরবে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজকে নরেন্দ্রমাণিক্য নামে প্রচার ক্রমে সিংহাসন আরোহণ করেন। নরেন্দ্রমাণিক্য আপন অভিপ্রায় গোপনে রাখিয়া বনবাসী রত্নমাণিক্যের নিকট উদয়পুরে

---

* চম্পকবিজয় নামক একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে তৎকালীন ঘটনার সবিস্তার আভাষ দেওয়া হইয়াছে, পুস্তকখানি পদ্যে লিখিত কিন্তু রাজমালার ন্যায় ইহার ভাব সুপরিস্ফুট নহে।

প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য রাজদূত পাঠাইয়া দিলেন। রাজদূত রত্নমাণিক্যকে পত্র দিল।

পত্র পাঠে রত্নের মনে হইল, নরেন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন সবই সত্য, তাঁহার অভাবে উদয়পুর নরেন্দ্রের নিকট প্রাণহীন ঠেকিতেছে, রত্নের আগমনে পুনরায় নগরে প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়া আসিবে। এই ভাবিয়া রত্ন ফিরিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার পরিজনবর্গ প্রতিকূলে অনেক বুঝাইল, কিন্তু কোন ফল হইল না।

রত্নমাণিক্যকে প্রত্যাবর্ত্তনে কৃতনিশ্চয় বুঝিয়া পাত্র মিত্র মন্ত্রী সকলেই রাজার অনুগামী হইলেন। উদয়পুরে পৌঁছিয়াই রত্ন নিজের ভুল বুঝিলেন কিন্তু তখন ফিরিবার সময় নাই। নরেন্দ্রমাণিক্য সুযোগ বুঝিয়া সকলকে সৈন্য দিয়া ঘেরাও করিলেন এবং একে একে তাঁহাদিগকে বন্দীশালায় পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে মন্ত্রীবর্গের প্রাণ সংহারে অধিক বিলম্ব হইল না। এইরূপে কৌশলে পলায়মান শত্রুকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়া দেওয়ান চম্পক রায়কে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিতে লাগিলেন।

চম্পক রায় চট্টগ্রামে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে ধৃত হইবার উপক্রম হওয়ায় তিনি ভুলুয়া চলিয়া আসেন, সেখানেও যখন তিষ্ঠান দায় হইল তখন চম্পকরায় উপায়ান্তর না দেখিয়া ঢাকার নবাবের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। মহারাজ রত্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধন তথায় চম্পকের সহিত মিলিত হন, নবাব সেনাপতি আমির খাঁ ইঁহাদের পক্ষ লইলেন। এই তিনজনে মিলিয়া রত্নমাণিক্যকে পুনঃ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য

সচেষ্ট হইলেন। নবাবকে অনেক বুঝান হইল যে নরেন্দ্র নবাবের অভিপ্রায় অনুযায়ী যুবরাজ না হইয়া একেবারে মস্‌নদ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন এবং রত্নমাণিক্যও তাঁহার অমাত্য বর্গকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। এই সংবাদে নবাব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নরেন্দ্রকে ধরিয়া আনিবার জন্য মোগল ফৌজ পাঠাইয়া দিলেন। চম্পক রায়ের প্রচেষ্টা সফল হইল, নরেন্দ্রকে বন্দী করিয়া ঢাকা আনা হইল। রত্নমাণিক্য পুনরায় সিংহাসনে বসিলেন এবং চম্পক রায় যুবরাজরূপে ঘোষিত হইলেন।

এই ভাবে রাজ্যশাসন কিছুকাল চলিল। কিন্তু নক্ষত্ররায় বাঙ্গলার নবাবের সাহায্যে ভ্রাতৃবিরোধের যে দাবানল জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিভে নাই। রামমাণিক্যের পুত্রদের মধ্যে রাজা হইবার লালসা সকলকেই পাইয়া বসিয়াছিল, রত্নমাণিক্যকে দূর করিয়া কি ভাবে সিংহাসনে বসা যায় ইহাই হইল ইহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। সেই অভীষ্ট সাধনের জন্য স্বদেশের স্বাধীনতা বলি দিতে ইঁহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। নরেন্দ্রের কার্য্যকলাপ দেখিয়া পুনরায় রত্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজস্বপ্নে বিভোর হইলেন। তিনি গোপনে মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট যাইয়া সৈন্যপ্রার্থী হইলেন। নবাব ত্রিপুরাকে অল্পায়াসে বশ করিতে পারিবেন দেখিয়া ইহাতে সম্মত হইলেন। আবার মোগল সৈন্য আসিয়া উদয়পুরে হানা দিল, রত্নমাণিক্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন না। সুতরাং ঘনশ্যাম ঠাকুরের হাতে উদয়পুর চলিয়া আসিল। ঘনশ্যাম মহেন্দ্রমাণিক্য নামে নিজকে

প্রচার করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। রত্নের দিন বন্দীশালায় কাটিতে লাগিল। মহেন্দ্রমাণিক্যের শাসনে রত্নের প্রাণসংহারের ব্যবস্থা হইল, অত্যল্পকাল মধ্যেই রত্নমাণিক্যের প্রাণহীন দেহ ভূমিতে লুটাইল। স্বামীর চিতায় রাণী রত্নবতী সহমৃতা হইলেন।

রত্নমাণিক্যের রাজত্বকাল সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের অধিক, তিনি আওরঙ্গজেবের রাজত্বের মধ্যভাগে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া উক্ত মোগল সম্রাটের পরেও কয় বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার শাসনকাল যেন মেরুদণ্ডবিহীন এক মানুষের জীবন-কাহিনী। রাজ্যলোভী কুমারেরা পুণ্যকীর্ত্তি পূর্ব্বপুরুষের স্বদেশ-প্রেম বিস্মৃত হইয়া, বিশাল ত্রিপুরা রাজ্যকে সম্রাটের হাতে সঁপিয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। এত চক্রান্ত-জালের মধ্যেও ত্রিপুরার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নাই। "মেজর ষ্টুয়ার্ট স্বপ্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে যদিচ ইতঃপূর্ব্বে মুসলমানদিগের বাহুবলে ত্রিপুরা লুণ্ঠিত ও বিজিত হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নাই। ত্রিপুরেশ্বর স্বাধীন ছত্র ধারণ পূর্ব্বক স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচার করিতেছিলেন। ১৭০৭-০৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরেশ্বর, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর প্রবল বিক্রম কাহিনী শ্রবণে তাঁহাকে গজ ও গজদন্ত প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান করেন। তদ্বিনিময়ে নবাব ত্রিপুরেশ্বরকে "খেলাত" প্রদান করিয়াছিলেন।"*

* Stewart's History of Bengal, p. 233. কৈলাস সিংহ প্রণীত রাজমালা, পৃঃ ৯৯।

(১২)

শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও সতর রতন

রত্নমাণিক্যের সময় কুমিল্লার প্রসিদ্ধ সতর রতন মন্দির নির্ম্মিত হইতে থাকে, ইহা কৈলাস সিংহ মহাশয়ের পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়। বিজয়মাণিক্যের শাসনকালের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি হইতেছে জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপন। এ সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় রাজমালার দ্বিতীয় লহরে লিখিয়াছেন —মহারাজ বিজয়মাণিক্য, উদয়পুরে জগন্নাথবিগ্রহ স্থাপনোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। সেই দানের তাম্রফলকে উৎকীর্ণ হইয়াছে ঃ—

রাজরাজশিরোরত্ননিঘৃষ্টচরণাম্বুজঃ।
শ্রীশ্রীবিজয়মাণিক্যো রাজা রাজভীরাজতে॥

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের রাজত্ব ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়, সুতরাং বিগ্রহ স্থাপনের কাল অতি প্রাচীন। অমরমাণিক্যের রাজত্বের শেষ ভাগে রাজ্যহারা হইবার পূর্ব্বে জগন্নাথ বলরামের নেত্র অশ্রুকণায় পূর্ণ হইয়াছিল এরূপ উল্লেখ রাজমালায় পাওয়া যায়।* তাহার পর নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ঝড় উদয়পুরের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। উদয়পুরের জগন্নাথ মন্দির ভারতীয় স্থপতি শিল্পের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

* অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে প্রস্তরনির্ম্মিত জগন্নাথ মন্দিরের উল্লেখ পূর্ব্বে পাইয়াছি তাহাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত হন।

কালের কুটিল প্রবাহে সেই মন্দির বিগ্রহহীন হইয়া পড়ে। কৃষ্ণমাণিক্যের সময় উদয়পুর হইতে জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের বিগ্রহ কুমিল্লায় আনা হয়, কি জন্য আনা হইয়াছিল রাজমালায় তাহার উল্লেখ নাই। স্থানীয় জগন্নাথ বাড়ীর অন্যতম পাণ্ডা শ্রীযুক্ত মুরলীধর ত্রিপাঠীর মুখে শুনিয়াছি, সতর রতন নির্ম্মাণ অবসানে উদয়পুর হইতে জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের বিগ্রহ নৌকাযোগে আনা হয়। যে ঘাটে নৌকা লাগে তাহা জগন্নাথ ঘাট এবং তন্নিকটস্থ গ্রাম জগন্নাথপুর নামে অদ্যাপি পরিচিত। কিন্তু সতর রতন মন্দিরে জগন্নাথ বাস করিতে অসম্মত হন, স্বপ্নযোগে জানান হয়, মন্দির শ্মশানের উপর নির্ম্মিত তাই উহা বাসের অযোগ্য। তৎপর ঐ সতর রতনের সংলগ্ন ভূমিতে নূতন আবাস রচিত হয় সেইখানেই জগন্নাথ আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছেন। উড়িষ্যার এই পবিত্র ব্রাহ্মণ পরিবারের উপর কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বে বিগ্রহ স্থাপন অবধি জগন্নাথের পূজার ভার অর্পিত হইয়াছে। এখন ইঁহারা বহু পরিবারে বিভক্ত, তাই পালাক্রমে ভগবানের সেবার ভার পাইয়া থাকেন।

(১৩)

দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্য

১৭১৬ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রমাণিক্য সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বকাল দুই বৎসরেরও কম। ভ্রাতাকে বধ

করিয়া মহেন্দ্রের মনে সুখ ছিল না, বিধাতার অভিসম্পাতে তাঁহার জীবনের দিনগুলি নানা বিভীষিকায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। খাইতে গেলে মুখে অন্ন রোচে না, শুইলে দুঃস্বপ্নে নিদ্রা দুঃখকর ঠেকে এবং জাগরণে নিদ্রায় তাঁহার মনে হইত তাঁহাকে যেন কে গলা চাপিয়া ধরিতেছে! রত্নমাণিক্যকে গলা চাপিয়া মারা হইয়াছিল। হায় রাজ্যলোভ! ইহার জন্য কত অনর্থই না হইয়াছে! কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও জীবনের কয়েকটি বৎসর মানুষ সুস্থির হইয়া কাটাইতে পারে না। দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া দুষ্কৃতি-পাংশুলচিত্তে মহেন্দ্রমাণিক্য কালপ্রাপ্ত হইলেন।

ভ্রাতার মৃত্যুর পর ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধন ধর্ম্মমাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র গঙ্গাধর ঠাকুর এবং গদাধর ঠাকুর বর্ত্তমানেও তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমণি ঠাকুরকে যৌবরাজ্য প্রদান করেন। অনন্তরাম উজীর এবং রণভীম ছিলেন সেনাপতি। অমরমাণিক্যের কালে উদয়পুর জয় করার ফলে রাজধানীতে মঘ বসতি হইয়াছিল। সেই হইতে মঘবংশ বর্দ্ধমান হইয়া উদয়-পুরের অনেকাংশ জুড়িয়া রহিল। ইহারা অকুতোভয়ে চলাফেরা করিত এবং রাজশাসনও উপেক্ষার চক্ষে দেখিত। সেইজন্য ইহাদিগকে ভোজনের কৌশল অবলম্বনে ধ্বংস করা হয়।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আওরঙ্গজেব বাদসাহের সহিত হস্তি-কর মূলক সন্ধি করিয়াছিলেন। সেই সর্ত্ত

ধর্ম্মমাণিক্য হাতী নজরানা পাঠাইতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া কর প্রেরণ স্থগিত রাখিলেন। ইহাতে নবাবের বিরক্তির সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। ধর্ম্মমাণিক্যের প্রতিনিধি মুর্শিদাবাদের নবাব দরবার হইতে পুনঃ পুনঃ এ বিষয় স্মরণ দিতে লাগিলেন কিন্তু মহারাজের চৈতন্য হইল না। এ বিষয় জানিতে পারিয়া নক্ষত্ররায়ের প্রপৌত্র জগৎরাম ঢাকার নবাবের নিকট দরবার সুরু করিলেন। তিনি বলিলেন যদি তাঁহাকে রাজাসনে বসাইয়া দেওয়া হয় তবে তিনি হস্তি-কর চুকাইয়া দিবেন। ইহাতে নবাব সম্মত হইয়া জগৎরামকে সৈন্য সাহায্য দিলেন, ধর্ম্মমাণিক্যের সহিত বল পরীক্ষা করিতে গিয়া জগৎরামের হার হইল। এ সংবাদ শুনিয়া নবাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নূরনগর ও গোমতী নদী এই দুই পথে দুই ফৌজ পাঠাইয়াছিলেন।

নবাব সৈন্যের গতিরোধে অসমর্থ হইয়া ধর্ম্মমাণিক্য অরণ্যে গা ঢাকা দিলেন। এদিকে নবাবের সৈন্য উদয়পুর লুট করিয়া রাজমঙ্গল প্রভৃতি হস্তী লইয়া ঢাকা চলিয়া আসিল। রাজমালায় যুদ্ধের ফলে জগৎমাণিক্যের কি লাভ হইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই। কৈলাস সিংহ প্রণীত ইতিহাসে এইরূপ লেখা হইয়াছে—“ঢাকা নেয়াবতের সুবিখ্যাত দেওয়ান মির হবিব জগৎরাম ঠাকুরকে ‘রাজা জগৎমাণিক্য’ আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক ত্রিপুরার রাজা বলিয়া প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র সমতলক্ষেত্র জগৎমাণিক্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

নবাব সুজাউদ্দিন ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্রকে 'চাকলে রোশনাবাদ' আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক বার্ষিক ৯২,৯৯৩ টাকা কর ধার্য্য পূর্ব্বক জগৎমাণিক্যকে জমিদারী স্বরূপ ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত রাজস্ব মধ্যে পরগণে নূরনগরের বার্ষিক রাজস্ব ১৫,০০০ টাকা, দিল্লীর সম্রাটের পূর্ব্ব আদেশ মত সামরিক জায়গীর এবং হস্তী ধৃত করিবার খরচ বাবত ২০,০০০; মোট ৪৫,০০০ টাকা বাদে ৪৭,৯৯৩ টাকা আদায়ী রাজস্ব নির্ণীত হয়। রাজা জগৎমাণিক্যকে রক্ষা করিবার জন্য কুমিল্লা নগরে একদল মোগল সৈন্য স্থাপিত হইয়াছিল। আকাসাদেক তৎকালে ত্রিপুরার 'ফৌজদার' পদে নিযুক্ত হন।"

ধর্ম্মমাণিক্য যখন বনান্তরালে গা ঢাকা দেন তখন তাঁহার সঙ্গে চল্লিশ হাজার টাকা ছিল। এ অবস্থায় আর কতদিন অবস্থান করিবেন? পরামর্শ ক্রমে মুর্শিদাবাদের নবাব সুজাউদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির হইল। মহারাজ মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিলেন। নবাবের দরবারে খ্যাতিমান পুরুষ জগৎশেঠের সহিত আলাপক্রমে নবাবের নিকট মহারাজের বক্তব্য জানান হইল। নবাব মহারাজকে যাচাই করিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। জগৎ-শেঠকে বলিলেন—"ত্রিপুরার মহারাজের রাজোচিত চক্ষু কিরূপ আছে আমি দেখিতে চাই। ভাল তলোয়ার মন্দ খাপে আর মন্দ তলোয়ার ভাল খাপে রাখ, বহুমূল্য রত্নাঙ্গুরীয়ে মন্দ রঙ্ দিয়া মলিন করিয়া দাও, আর অল্প মূল্যের রত্নাঙ্গুরীয়ে

উজ্জ্বল রঙ ফলাও, তারপর মহারাজকে পৃথক পৃথক দর জিজ্ঞাসা কর।" নবাবের অভিপ্রায় অনুযায়ী জিনিষগুলি সাজান হইল, মহারাজ আসিয়া ইহাদের উপর চোখ বুলাইয়া ব্যাপার বুঝিলেন। তখন একটু হুঁস রাখিয়া মহারাজ দাম বলিয়া যাইতে লাগিলেন, যাহা বলিলেন সকলই যথার্থ হইল। নবাব অত্যন্ত প্রীত হইয়া ধর্ম্মমাণিক্যকে খিলাত প্রদান করিলেন। জগৎমাণিক্যের শাসন রহিত হইল এবং কুমিল্লা হইতে মোগল ফৌজ উঠিয়া গেল।

"নবাব কেবল চাকলে রোশনাবাদের বার্ষিক পঞ্চ সহস্র মুদ্রা রাজস্ব অবধারণপূর্ব্বক, জমিদারী স্বরূপ তাহা ধর্ম্মমাণিক্যকে অর্পণ করিবার জন্য ঢাকার শাসনকর্ত্তার প্রতি আদেশ প্রচার করেন, তদনুসারে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য চাকলে রোশনাবাদের জন্য বাঙ্গালার নবাবের অধীনস্থ জমিদার শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হন। ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাস লেখকগণ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, স্মরণাতীত কাল হইতে যে ত্রিপুরা স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করিয়া আসিতেছিলেন, অদ্য তাহা মোগলের পদানত হইল।* কিন্তু আমাদের হর্ষ বিষাদের কারণ এই যে তৎকালে পার্ব্বত্য প্রদেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নাই। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও পার্ব্বত্য

* The province of Tippera, which from time immemorial had been an independent kingdom became annexed to the Mugal Empire. Stewart's History of Bengal, P. 267.

ত্রিপুরাকে 'স্বাধীন ত্রিপুরা' বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।"* ধর্ম্মমাণিক্য সসম্মানে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার শেষকাল নানাবিধ সংকীর্ত্তিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। তিনি মেহেরকুল, ছত্রগ্রাম, কসবা ও ধর্ম্মপুর নামক স্থানে নিজ নামে সাগর খনন করান এবং তিল, ধেনু ও তুলাপুরুষাদি নানাবিধ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন করেন। তিনি অষ্টাদশ পুরাণ পাঠ শ্রবণে প্রীতি লাভ করেন। আঠার বৎসর রাজত্ব করিয়া কণ্ঠে দুর্গা নাম জপিতে জপিতে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ পরলোক গমন করেন। ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যের সমতল অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া জমিদারীরূপে পরিগণিত হয়।

(১৪)

মুকুন্দমাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্য

ভ্রাতার মৃত্যুর পর সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ চন্দ্রমণি ঠাকুর মুকুন্দমাণিক্য নামে ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট রাজপ্রতিনিধিরূপে বাস করিতেন, এতদ্ব্যতীত রাণী প্রভাবতীর গর্ভে কৃষ্ণমণি ও আরও এক পুত্র জন্মিয়াছিল।

* কৈলাস সিংহ প্রণীত রাজমালা, পৃঃ ১০৬।

অন্য রাণী রুক্মিণীর গর্ভে জয়মণি, হরিমণি, ভদ্রমণি নামে তিন পুত্র জন্মে।

মুকুন্দমাণিক্য নিত্যানন্দবংশীয় বৃন্দাবনচন্দ্র গোসাই হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ইষ্ট দেবতা বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির উদয়পুরে নির্ম্মাণ করেন।

মুকুন্দমাণিক্যের রাজত্বকাল বড়ই দুঃখময়। ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুরা রাজ্যের সমতল অংশ জমিদারীরূপে পরিণত হওয়ায় নবাবের ফৌজ তথায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করিল, ইহাতে ত্রিপুরা রাজ্য অনেকটা কোণঠাসা হইয়া পড়িতে লাগিল। সে সময়ে ফৌজদার ছিলেন মহস্তন। হস্তিকর বাকী পড়ায় নবাবের দরবার হইতে লেখাপড়া চলিতে লাগিল, যুবরাজ পাঁচকড়িও এ সম্বন্ধে পিতাকে জানাইলেন কিন্তু তত সহসা হাতী ধরা গেল না। তাই ফৌজদার মহস্তনকে তাগিদ দিবার জন্য উদয়পুরে পাঠান হইল। মুকুন্দমাণিক্য সুবা রুদ্রমণি (জগন্নাথের প্রপৌত্র) ঠাকুরকে হাতী ধরিবার জন্য গভীর জঙ্গলে পাঠাইলেন কিন্তু ভাল হাতী ধরা পড়িল না। পার্ব্বত্য প্রজারা যখন বুঝিতে পারিল নবাবের দ্বারা মহারাজ শাসিত হইতেছেন তখন ইহাদের মধ্যে অসন্তোষের ভাব দেখা গেল। নবাবের শক্তি কত ইহার পরিমাণ না জানিয়া ফৌজদারসহ মোগল ফৌজটিকে মারিলেই দেশ অব্যাহতি পায় এইরূপ চিন্তা প্রবল হইল। তাহার ফলে রুদ্রমণিসুবা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন এবং ফৌজ ধ্বংসের প্রস্তাব মহারাজের কর্ণে তুলিলেন। কিন্তু

মহারাজ ইহাতে কোনমতেই সম্মত হইলেন না। বিশেষতঃ পাঁচকড়ি মুর্শিদাবাদে রহিয়াছেন।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কথা ফৌজদার মহস্তন জানিতে পারিয়া ঝটিতি মুকুন্দমাণিক্য ও রাজপুত্র কৃষ্ণমণি প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। ত্রিপুর সৈন্য ক্ষেপিয়া গিয়া মোগল সৈন্যের সহিত সংগ্রাম বাঁধাইয়া দিল। মহারাজ মুকুন্দমাণিক্য এই দুঃসহ অপমানে বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন। রাণী প্রভাবতী স্থানান্তরে ছিলেন, তাঁহার আসিতে সাত দিন বিলম্ব হইল, এই সময় রাজদেহ তৈলে ডুবাইয়া রাখা হইল। রাণী আসিতেই রুদ্রমণিসুবাকে রাজাসনে বসিবার আদেশ প্রার্থনা করা হইলে রাণী নিতান্ত অসার বলিয়া এ সকল উড়াইয়া দিয়া সহমরণ গমন করিলেন। কিন্তু রাজ্যলোভ বড় লোভ—রুদ্রমণিসুবা "জয়মাণিক্য" নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে বসিলেন।

মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন-অভিলাষী হইয়া পাঁচকড়ি নবাবের অনুমতিগ্রহণক্রমে সে সময় দেশে ফিরিতেছিলেন, পদ্মা তীর অবধি পৌঁছিয়া অনুজ কৃষ্ণমণি ঠাকুরের পত্রে পিতার মৃত্যু ও রুদ্রমণিসুবার সিংহাসন অধিকার বৃত্তান্ত শুনিয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া গেলেন। নবাবের নিকট স্বীয় দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা করিলে নবাব পাঁচকড়িকে সৈন্য সাহায্য দিতে সম্মত হইলেন। পাঁচকড়ি সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে নবাব হইতে সনন্দ গ্রহণ করিলেন, এই সনন্দ গ্রহণ দ্বারা ত্রিপুরার

পার্ব্বত্য অংশে স্মরণাতীতকাল হইতে যে স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছিল তাহার বিলোপ ঘটিতে বসিল। নবাব সৈন্যের সহিত পাঁচকড়ি আসায় জয়মাণিক্যের পরাজয়ে বিলম্ব ঘটিল না।

জয়মাণিক্য স্বীয় পাত্র মিত্র মন্ত্রী লইয়া উদয়পুরের দক্ষিণে সরিয়া গেলেন এবং মতাই নামক স্থানে রাজপাট স্থাপন করিলেন; তথা হইতে পার্ব্বত্য দক্ষিণাংশ শাসন করিতে লাগিলেন। এদিকে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে (১১৪৯ ত্রিপুরাব্দে) পাঁচকড়ি ইন্দ্রমাণিক্য নামে ঘোষিত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। অনুজ কৃষ্ণমণি যুবরাজ এবং গঙ্গাধর বড় ঠাকুর হইলেন। উদয়পুরের বিরোধী জয়মাণিক্যের শাসনে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িল, ফলে উভয়ের মধ্যে প্রবল রেষারেষির সৃষ্টি হইল। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইল, মেহেরকুলের জমিদার হরিনারারণ চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন জয়মাণিক্যের পক্ষভুক্ত হইলেন কিন্তু নূরনগরের তালুকদারগণ ইন্দ্রমাণিক্যের পক্ষাবলম্বন করিলেন।

তৎকালীন ঘটনা ষড়যন্ত্র হেতু জটিল, কাযেই সুখপাঠ্য নহে। ইন্দ্রমাণিক্যের পরাভব ঘটিল, যুবরাজ কৃষ্ণমণি প্রথমে কৈলাসহর পরে হেড়ম্বরাজ্যে চলিয়া যান। ইন্দ্রমাণিক্য প্রথম বয়স নবাব দরবারে কাটাইয়াছিলেন পুনঃ নবাব সান্নিধ্যে এ সময়ে মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিলেন। ভাগ্যবিপর্য্যয়ের লাঞ্ছনার মধ্যে তথায় গঙ্গাস্নান করিয়া পরম তৃপ্তি পাইতেন। ঢাকার নায়েব নাজিমের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া জয়মাণিক্য যখন

সমগ্র ত্রিপুরা অধিকারে প্রয়াসী ছিলেন তখন ধর্ম্মমাণিক্য-তনয় গঙ্গাধর নায়েব নাজিমকে বশীভূত করিয়া একদল সৈন্যসহ কুমিল্লা নগরে উপস্থিত হইয়া নিজকে “উদয়মাণিক্য” রূপে ঘোষণা করেন। এইরূপে মুসলমানদের সহায়তায় ত্রিপুরা সিংহাসনের দাবীদার বাড়িয়া চলিল। জয়মাণিক্য পুনঃ ঢাকার নায়েব নাজিমকে বশীভূত করিবার জন্য ঢাকার জগৎমাণিক্যকে প্রলোভন দিয়া জানাইলেন যদি তিনি নায়েবকে বশে আনিতে পারেন তবে তাহার ভ্রাতা নরহরিকে যৌবরাজ্য দিবেন। ষড়যন্ত্র সিদ্ধ হইল, নায়েবের সাহায্যে জয়মাণিক্য উদয়মাণিক্যকে বিতাড়িত করিলেন এবং কথামত নরহরি যুবরাজ হইলেন। এইরূপে ত্রিপুরার সিংহাসন ঘেরিয়া রাজ্যলোভের অপূর্ব্ব লীলা চলিতে লাগিল। মুসলমানদের সহায়তায় আর একবার ইন্দ্রমাণিক্য সিংহাসনে বসিয়াছিলেন এবং জয়মাণিক্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে আবার ইন্দ্রমাণিক্য জয়মাণিক্যের চেষ্টায় সিংহাসন হারাইয়াছিলেন। ইন্দ্রমাণিক্য মুর্শিদাবাদে চলিয়া যান এবং সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ দিকে জয়মাণিক্যও কালপ্রাপ্ত হন। উভয়ের বিবাদ বিসম্বাদের উপর মৃত্যু যবনিকা টানিয়া দিল, স্বাধীনতার জ্যোতিও যেন ঘন মেঘে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

(১৫)

সমসের গাজি

ত্রিপুরার সিংহাসন শূন্য হইয়া পড়িলে জয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিধন ঠাকুর নবাব হইতে সনন্দ গ্রহণ পূর্ব্বক বিজয়-মাণিক্য নামে ভূষিত হইয়া রাজদণ্ড ধারণ করেন। হস্তি সংগ্রহ করাই ছিল নবাব ও রাজার মধ্যে এক মাত্র সম্বন্ধ। বিজয়মাণিক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কৃষ্ণমণি যুবরাজ। যতদিন বিজয়মাণিক্য যথারীতি হস্তিকর পৌঁছাইতে পারিবেন ততদিন সিংহাসন নিষ্কণ্টক, সুতরাং মহারাজ হাতীর খেদায় অত্যন্ত মনোযোগ দিলেন। কালের কি কুটিল গতি, যাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতাপে বাঙ্গালার নবাব সন্ত্রস্ত থাকিত আজ তাঁহার কার্য্য হইতেছে কিরূপে চুক্তি অনুযায়ী হাতী ধরা যায়। বন তন্ন তন্ন করিয়া বহু চেষ্টা হইল কিন্তু হাতী মিলিল না, এখন উপায় ?

তখন বঙ্গের অধিপতি আলিবর্দ্দিখাঁর অধীনে ঢাকার নায়েব নাজিম ছিলেন নিবাইস মহম্মদ, হোসেন কুলি খাঁ ছিলেন তাহারই সহকারী। হোসেন কুলি খাঁর সহিত ত্রিপুরেশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল। হোসেনের সহায়তায় বিজয়মাণিক্য

সিংহাসন লাভ করেন, এখন হোসেন হইতে হাতীর জন্য ক্রমাগত তাগিদ আসিতে লাগিল, বিজয়মাণিক্য দশদিক অন্ধকার দেখিলেন।

এই সময়ে ত্রিপুরার ইতিহাসে এক ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে। ত্রিপুরার বাহুবল শক্তিহীন হইয়া পড়ায়, চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা প্রবল হইয়া পড়িল, ক্ষমতার লোভে সাধারণ ব্যক্তিও মাথা তুলিতে লাগিল এবং দিগন্তব্যাপী অসন্তোষ দেখা দিল। সুযোগ পাইয়া দক্ষিণ শিক নিবাসী এক মুসলমান প্রজা ক্রমেই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিতেছিল, ইহার নাম সমসের গাজি। সমসের গাজির অভ্যুদয় উপন্যাসের ন্যায় চমকপ্রদ।

জগৎমাণিক্য যখন মীর হবিবের সাহায্যে চাকলে রোশনাবাদের অধিপতি হন, তখন দক্ষিণ শিক নিবাসী এক দরিদ্র মুসলমান চাষ করিবার সময় বহুমূল্য বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং রাজা জগৎমাণিক্যকে উহা অর্পণ করায় তিনি ঐ প্রজাকে দক্ষিণ শিকের জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। ঐ প্রজার নাম সদা গাজি। সদাগাজির ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল, তিনি জমিদার হইয়া গেলেন। সদাগাজির পুত্র নাছির মহম্মদ যখন পিতার মৃত্যুর পর দক্ষিণ শিকের জমিদার তখন তাঁহার শিশুপুত্রদের পাঠাভ্যাসকালে এক দরিদ্র মুসলমান বালক সেখানে পড়াশুনা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। ইঁহার নাম সমসের গাজি। এক সামান্যা রমণীর গর্ভে ও জনৈক ফকিরের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়, তাঁহার জীবনী লেখক তাঁহাকে “পীরের নন্দন” বলিয়া

বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠাভ্যাসে ও শক্তি চর্চ্চায় সমসের জমিদার নন্দন ছাহুল্লা ও বাহুল্লাকে শীঘ্রই অতিক্রম করিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া নাছির মহম্মদ সমসেরকে বাঁশপাড়া কাছারীর তহশীলদার নিযুক্ত করিলেন।

সমসের তহশীলদারী করিতেছেন এমন সময় এক বিখ্যাত



ফকির বলিল—'সমসের তুমি নিজকে চিনিতে পার নাই।'

ফকিরের (গদা হোসেন খন্দকার) সহিত তাঁহার নিভৃতে

সাক্ষাৎ হয়। ফকির বলিলেন, "সমসের তুমি নিজকে চিনিতে পার নাই, বিধাতা তোমাকে তহশীলদার করিয়া পাঠান নাই— এই চাক্‌লে রোশ্‌নাবাদ একদিন তোমারই হইবে। তোমাকে আমি দৈবশক্তিসম্পন্ন একটি ঘোড়া ও একটি তরবারী দিব, ইহাদের শক্তি বলে তুমি যুদ্ধে অজেয় হইবে। দক্ষিণ শিকের জমিদার নাছির তোমাকে প্রতিরোধ করিতে যাইয়া সবংশে নিহত হইবেন তারপর তোমার সহিত ত্রিপুরেশ্বরের ঘোর সংগ্রাম বাধিবে কিন্তু তোমার জয় অনিবার্য্য। তোমার শক্তির বিষয় তুমি এখনও টের পাও নাই কিন্তু দিন আসিতেছে যখন মর্ম্মে মর্ম্মে যে কথা বলিলাম তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিবে।" এই বলিয়া সেই ফকির সমসেরকে দৈব অশ্ব ও তরবারী প্রদান করিলেন।*

ফকির চলিয়া গেলেন, যতদূর দেখা যায় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সমসের ফকিরকে দেখিতে লাগিলেন। সমসের বুঝিতে পারিলেন তাঁহার হৃদয়ে উচ্চাঁভিলাষের অনল জ্বালাইয়া ফকির বিদায় লইলেন। দৈব অশ্ব ও তরবারী তাঁহার

* নাছির যাইব মারা, পাইবা জমিদারী
কিন্তু রাজার সঙ্গে তোমার হৈব মহারণ।
আল্লা এ করিলে হৈবা রাজ্যের ভাজন॥
এহি স্বর্ণ অশ্ব তোমা দিল তে কারণ।
মুল্লুক বিজয়ে হৈব জানিয়া আপন॥

—গাজীনামা।

হাতে রহিয়াছে, দুনিয়াতে কাহাকে ভয়? সমসেরের ইচ্ছা হইল এখন শক্তির পরীক্ষা হউক, তাই জমিদার নাছিরের নিকট তাঁহার কন্যা দৈয়া বিবির পাণিগ্রহণের প্রস্তাব পাঠাইলেন। জমিদার ত অবাক! এ বলে কি? সামান্য তহশীলদার হইয়া এত বড় কথা! সমসেরকে শিক্ষা দিবার জন্য নাছির বিবাহের প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর স্বরূপ একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন।

সমসের অতটা প্রস্তুত ছিলেন না, তাই সহসা সৈন্যের আগমনে বেগতিক দেখিয়া দৈব অশ্বে চড়িয়া বেদরাবাদ পরগণায় কিছুকাল গা ঢাকা দিয়া রহিলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমিত বলশালী ছাদু গাজিও ফিরিতে লাগিলেন। সেখানে সমসের কতকগুলি লোককে হাত করিয়া তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষা দিয়া সহসা দক্ষিণ শিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, জমিদার নাছিরের সৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। সমসের অতুল বিক্রমে বিপক্ষ সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া জমিদার ও তাঁহার পুত্রগণের বিনাশসাধন করিলেন; দক্ষিণ শিক সমসেরের হস্তে চলিয়া আসিল। তখন জমিদার নন্দিনীর পাণিগ্রহণে বাধা দিবার কেহ রহিল না। এক চক্ষের পলকে সমসের তহশীলদার হইতে দক্ষিণ শিকের জমিদার হইয়া গেলেন। ফকিরের কথা আশ্চর্য্যরূপে ফলিয়া গেল, এখন বাকী রহিল ত্রিপুরেশ্বরের সহিত শক্তি পরীক্ষা।

সমসের গাজির দক্ষিণশিক অধিকার করার কথা ত্রিপুরার মহারাজের কানে উঠিতেই তিনি বুঝিলেন ব্যাপার ভাল নয়, সত্বর ইহার দমন আবশ্যক। সমসেরকে ধরিবার জন্য লুচিদর্পনারায়ণের অধীনে ত্রিপুরার ফৌজ ছুটিল, নিরুপায় দেখিয়া সমসের মহারাজকে কয়েক সহস্র মুদ্রা নজর স্বরূপ পাঠাইলেন। প্রীত হইয়া মহারাজ তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করিলেন। এইভাবে সমসের প্রথম চোট সামলাইয়া লইলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে শক্তি পরীক্ষার জন্য বিশেষ তোড়জোড় করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার তিন বৎসর পর সমসের মেহেরকুল পরগণা ইজারা লইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে হোসেন কুলিখাঁ হইতে বিজয়-মাণিক্যের নিকট ক্রমাগত হাতীর জন্য তাগিদ আসিতেছিল এবং মহারাজ হাতী ধরিতে না পারিয়া বড়ই ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া সমসের এক্ষণে মহারাজের সহিত গোপনে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলেন। তিনি হোসেন কুলিখাঁর নিকট জানাইলেন বাঙ্গালার নবাবকে হাতী ধরিয়া দিতে তিনি সম্মত আছেন এজন্য বাঙ্গালা সরকার বিজয়-মাণিক্যকে যে বৎসরে ১২ হাজার মাসহারা দিয়া থাকেন তাহা তিনি চাহেন না তবে ঐ কার্য্যের বিনিময়ে তিনি চাকলে রোশনাবাদের জমিদারী পাইতে চাহেন। হোসেন কুলিখাঁ দেখিলেন প্রস্তাব মন্দ নয়, বিজয়মাণিক্যের সহিত আলাপক্রমে ইহার পাকাপাকি ব্যবস্থা করিবার জন্য মহারাজকে ঢাকা

লইয়া গেলেন। বিজয়মাণিক্য আর ঢাকা হইতে ফিরিলেন না, সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

বিজয়মাণিক্য প্রবাসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমসেরের উন্নতশির আকাশে উঠিতে লাগিল। রাজার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি রাজকর বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া নিজকে চাকলে রোশনাবাদের অধিপতিরূপে ঘোষিত করিলেন। এতদিনে ফকিরের কথা সম্পূর্ণ সত্য হইতে চলিল। ত্রিপুর সিংহাসনের দিকে ক্রমেই তাঁহার লুব্ধ দৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুতে ত্রিপুর সিংহাসন শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইন্দ্রমাণিক্যের অনুজ যুবরাজ কৃষ্ণমণির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তিনি হেড়ম্ব রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই সুযোগে তিনি ত্রিপুর প্রজার আহ্বানে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সিংহাসনে বসিবার পক্ষে রাজ্যের ভিতরে কোন অন্তরায়ই ছিল না কিন্তু বাহিরে প্রবল বৈরী সিংহনাদ করিতেছিলেন। সমসের যখন শুনিলেন যুবরাজ কৃষ্ণমণি রিয়াঙ্গ অঞ্চলে সৈন্যসহ অগ্রসর হইয়াছেন তখন বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার গতিরোধ করিতে সমসের কাল বিলম্ব করিলেন না। সমসেরের দৈব তরবারীরই জয় হইল, কৃষ্ণমণি পরাভূত হইয়া অরণ্যমধ্যে গা ঢাকা দিলেন। রাজধানী উদয়পুর সমসেরের হস্তগত হইল, সমসের এখন ত্রিপুরার অধিপতি।

সমসের বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি দেখিলেন যুদ্ধে যদিচ তাঁহার জয় হইয়াছে কিন্তু ত্রিপুরার হৃদয় জয় করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কেবল তরবারীর শক্তিতে নিজকে ত্রিপুরেশ্বররূপে চালান যাইবে না, সুতরাং ধর্ম্মমাণিক্যের পৌত্র বনমালীকে লক্ষ্মণমাণিক্য নামে ঘোষিত করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন, নিজে আড়ালে রহিলেন। ইতিহাসের কি আশ্চর্য্য যুগধর্ম্ম, বঙ্গের সিংহাসনে সেই একই দৃশ্য চলিতেছিল। তখন পলাশীর অভিনয় শেষ হইয়াছে, নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার জীবনান্ত ঘটিয়াছে, বঙ্গের তকৃততাউসে মির্জ্জাফর ক্রীড়নকরূপে বিরাজমান। সমসের বুঝিয়াছিলেন যদি হাতী কর বন্ধ হইয়া যায় তবে বাঙ্গালার সরকার হইতে তাঁহার উপর চাপ আসিবে। তাই লক্ষ্মণমাণিক্য দ্বারা মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট জানাইয়া দিলেন, হাতীর খেদা প্রস্তুত হইতেছে শীঘ্রই নবাবের কর পাঠান হইবে। এইভাবে লক্ষ্মণমাণিক্য দ্বারা দুইদিক সামলাইয়া লইলেন।

ফকিরের বাক্য অব্যর্থ প্রমাণিত হইল। সমসের গাজি ত্রিপুরারাজ্যে সর্ব্বময় প্রভু হইলেন। চট্টগ্রাম নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় দূরে দূরে কিল্লা প্রস্তুত করিয়া সমসের আপন অধিকার সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। কালের প্রবাহে যদিচ ইহারা বিলুপ্তপ্রায় তথাপি সোণামুড়ার গড়খাই 'গাজির কোঠ' ও ফেণী নদীর তীরবর্ত্তী সমসেরের কিল্লাস্থান কিল্লাঘাট নামে আজিও সুপরিচিত। এই বিস্তৃত অঞ্চলে সমসের একাধিপত্য

বিস্তার করিলেন। কিন্তু সমসেরের অর্থস্পৃহা দিন দিন বাড়িয়া চলিল; রাজকোষের মালিক হইয়াও সমসেরের অর্থশোষ মিটিল না। তাই অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দস্যুবেশে ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের জমিদারদিগের গৃহে গভীর রাত্রিতে হানা দিতেন। সমসের গাজির প্রিয়ভক্ত তদীয় জীবন চরিত লেখক সেখ মনোহরও এ বিষয়ে নীরব থাকিতে পারেন নাই। "সেখ মনোহর বলেন যে সমসের একজন কৃপণ জমিদারের গৃহ হইতে একলক্ষ টাকা ডাকাতি করিয়া আনিয়াছিলেন।" যখন এই ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িল তখন সমসেরের নামে চারিদিকে আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার হইল। ইহা দ্বারা সমসেরের যেরূপ অপযশ হইয়াছিল তেমনি সর্ব্বহারা হইবার কারণেরও সূত্রপাত ঘটিল। আজ পর্য্যন্ত সমসেরের দস্যুবৃত্তির নানা কাহিনী এ অঞ্চলে কথিত হইয়া থাকে।

কিছুকাল পূর্ব্বে সীতাকুণ্ড সন্নিহিত বাড়বকুণ্ড দর্শনান্তে জ্বালামুখী কালীবাড়ীতে বিশ্রাম করিবার কালে পুরোহিতের মুখে এসম্বন্ধে এক গল্প শুনিতে পাই। কালীবাড়ীর সিন্দুকে টাকা ভরিয়া উঠায় সেখানকার সেই সময়ের প্রধান পুরোহিত টাকাগুলি বাহিরে আনিয়া গণিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা লোক মুখে কথায় কথায় অনেক দূর চলিয়া আসে। পুরোহিতকে কেহ কেহ সমসের গাজির নামে ভয় দেখাইলে তিনি নাকি নির্ভয়ে বলিয়াছিলেন—"প্রহরীর দরকার নাই, মার অর্থ কেহ

লইতে পারিবে না। মা যদি ইচ্ছা করেন তবে মা-ই এ অর্থ রক্ষা করিতে পারিবেন।" পুরোহিতের বাক্য সত্য হইল। গভীর





কাতারে কাতারে সিপাহী বাহির হইয়া মার মন্দির পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

রাত্রিতে অশ্বখুরের শব্দে সমসেরের আগমন জানা গেল, কিন্তু সমসেরকে কে রোধ করিতে যাইবে? সকলেই ঘরের ভিতরে

ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সমসের যখনই নিজ সঙ্গীদের নিয়া কাছে ভিড়িতেছেন আর অমনি কাতারে কাতারে সিপাহী বাহির হইয়া মার মন্দির পরিক্রমণ করিতে লাগিল। সমসের ত অবাক, দেবালয়ে এত সিপাহী! তাই অপ্রস্তুত হইয়া দূরে সরিয়া গেলেন। সেই রাত্রিতে তিনি বারবার মন্দিরে আসিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু বার বার সঙ্গীনধারী সৈন্য টহল ফিরিতেছে দেখিতে পাইলেন, এই ভাবে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, নিরাশ হইয়া সমসের ফিরিয়া গেলেন!

এইভাবে দস্যুপণায় সমসেরের দুর্নাম রটিয়া গেল। রাজা হইয়া যদি প্রজার অর্থ হরণে মতি হয় তবে প্রজার রাজভক্তি কোথা হইতে আসিবে? রাজ্যশুদ্ধ প্রজা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ইহাতে সমসেরের প্রতিপক্ষ যুবরাজ কৃষ্ণমণির বিশেষ সুবিধা ঘটিল। সমসেরের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য তাঁহাকে অনেকেই মনে মনে বরণ করিতে লাগিলেন। সমসেরের হস্তে পরাজিত হইয়া কৃষ্ণমণি উদয়পুর ত্যাগ করিয়া পুরাতন আগরতলা স্থাপন পূর্ব্বক সেইখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে অনেকেই তাঁহার দলভুক্ত হইতে লাগিলেন। সমসেরের সহিত শক্তি পরীক্ষার জন্য কৃষ্ণমণি হেড়ম্ব ও মণিপুর রাজ্যে সৈন্য সংগ্রহের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু বাহুবলে সমসেরকে পরাভূত করা সম্ভবপর হইল না।

সমসের বাহুবলে অজেয় থাকিলেও প্রজার চিত্ত হইতে

তিনি ক্রমেই সরিয়া পড়িতেছিলেন। যদিচ হস্তিকর দিয়া সমসের বাঙ্গালার নবাবকে চুপ রাখিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অত্যাচার কাহিনী নবাবের কানে উঠিতে বিলম্ব হইল না। যুবরাজ কৃষ্ণমণি নবাবকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ বিষয় জানাইবার জন্য মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। তখন বঙ্গের সিংহাসনে ন্যায়পরায়ণ মীরকাশিম অধিষ্ঠিত। তিনি কাগজপত্র দেখিয়া কৃষ্ণমণিই যে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকেই ত্রিপুরাপতিরূপে ঘোষিত করিলেন। সমসেরকে ধরিবার জন্য নবাবের ফৌজ চলিয়া আসিল, সমসের তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলেন না কাযেই বন্দী হইয়া গেলেন। সমসের গাজির সৌভাগ্য রবি অস্তমিত হইয়া আসিয়াছিল। ফকিরের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল—ত্রিপুরেশ্বর তাঁহার নিকট পরাজিত রহিয়া গেলেন কিন্তু নবাবের সৈন্যের নিকট তাঁহার হার হইল!

মুর্শিদাবাদে সমসেরকে আনিয়া শৃঙ্খলিত করিয়া বন্দীশালায় রাখা হইল, নবাবের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তখন বদ্ধাবস্থায় সমসেরকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়। বিচিত্র শক্তির পরিচয় দিয়া এইভাবে একটি বিস্ময়কর জীবনের অবসান ঘটিল!*

* রাজমালায় সমসের গাজির বিস্তৃত বিবরণ নাই। কৈলাস সিংহ মহাশয় সমসের গাজিনামা পুস্তক ও অন্যান্য তথ্য হইতে এসম্বন্ধে সুন্দর বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এ আখ্যান তদুপরি রচিত। রাজমালা আফিসে গাজিনামা পুস্তক আছে উহার উপর কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাও আলোচিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১)

কৃষ্ণমাণিক্য

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে (১১৭০ ত্রিপুরাব্দে) ১লা পৌষ মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন। ইন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যু ও কৃষ্ণমাণিক্যের শাসন আরম্ভ এই দুইয়ের ব্যবধান কাল প্রায় বিশ বৎসর। বিজয়মাণিক্য ও সমসের গাজির হস্তে ত্রিপুরা রাজ্য এই সময়ে ন্যস্ত ছিল। সমসের গাজির পতনে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বাবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসিল, প্রজাবৃন্দের গৃহে গৃহে আনন্দধ্বনি জাগিল, যুবরাজ কৃষ্ণমণির দুঃখের রজনী প্রভাত হইল। কি দারুণ মনঃক্ষোভের মধ্যে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে, শৈল হইতে শৈলান্তরে রাজ্যহারা কৃষ্ণমণি ব্যস্ত ত্রস্ত হরিণের ন্যায় ফিরিয়াছেন, সিংহাসন হারাইয়া মণিহারা ফণীর ন্যায় মনের দুঃখে রুষিয়া ফুসিয়া উঠিয়াছেন, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশকে বিপন্ন দেখিয়া নিবিড়ে কত অশ্রুপাত করিয়াছেন! স্বদেশের উদ্ধারের জন্য কখনো মণিপুর কখনো হেড়ম্ব-রাজের দরবারে ম্লানমুখে অবনত-শিরে কত না অপমান সহ্য করিয়াছেন! অবশেষে বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। নবাবের সহায়তায় তাঁহার জয় হইল, পবিত্র রাজবংশের নষ্ট গৌরব ফিরিয়া আসিল।

কৃষ্ণমাণিক্য নিজ বাহুবলে যে সিংহাসনের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন নাই সেই সিংহাসনকে সুদৃঢ় করিবার জন্য সামরিক শক্তি নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিলেন কিন্তু এ



মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য

চেষ্টা কাহার নিকট? সময়ের পরিবর্ত্তনে ভারতের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। পলাশীর পর হইতে নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় ইংরেজ শক্তি ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হইতে হইতে ক্রমে আসমুদ্র হিমাচল আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। সেই বিপুল প্রতাপ ইংরেজের বল সে সময়ে সকলের চক্ষে হয়ত স্পষ্ট হইয়া ঠেকে নাই কারণ ইংরেজ, ক্লাইবের দ্বৈত শাসন মূলে আড়ালে রহিয়াছিলেন।

সিংহাসনে বসিবার অল্পকাল মধ্যেই মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের সহিত চাকলে রোশনাবাদের রাজস্ব লইয়া ফৌজদারের বিরোধ উপস্থিত হয়। ফৌজদার মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট এবিষয় জানাইয়া মহারাজকে শিক্ষা দিবার জন্য সৈন্য প্রার্থনা করেন। ইংরেজের হস্তে নবাব তখন ক্রীড়নক মাত্র, কাযেই এ বিষয় ইংরেজ গভর্ণর ভান্সিটার্টের নিকট প্রেরিত হয়। ভান্সিটার্ট (Vansittart) বিষয়টিকে পরম উৎসাহে গ্রহণ করিলেন। ত্রিপুরা জয়ের উত্তম সুযোগ মনে করিয়া চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তাকে কাল বিলম্ব না করিয়া মহারাজের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইতে লিখিয়া দিলেন। চট্টগ্রামে তৎকালে মোগল শক্তি বিধ্বস্ত করিয়া ইংরেজ শাসনের বনিয়াদ রচনা হইয়াছিল, হারিভার লেষ্ট চিফ্ অফিসার পদে নিযুক্ত হন এবং Thomas Rambold, Randolph Marriot ও Walter Wilkins-কে লইয়া মন্ত্রণা সভা গঠিত হয়।

চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে লেফটেনেণ্ট মথি

সাহেবকে যুদ্ধোপকরণ দিয়া কৃষ্ণমাণিক্যের বিরুদ্ধে সত্বর পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে হৃতবল ত্রিপুরার সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতে কৃষ্ণমাণিক্য প্রাচীন কৈলাগড় দুর্গে সাত হাজার সৈন্য ও কতকগুলি তোপসহ প্রস্তুত হইলেন। ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০৬। এমতাবস্থায় যুদ্ধে মহারাজের সুবিধা হইবারই কথা ছিল কিন্তু পলাশীর রণাঙ্গনে যেমন বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয় পাওয়া যায় এখানেও সেই দৃশ্য ঘটিয়াছিল। ত্রিপুর সৈন্যের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিয়া এইরূপ বলা হইল, আর রক্ষা নাই—পর্ব্বতে পলায়নই একমাত্র কার্য্য। রণক্ষেত্র হইতে সহসা ত্রিপুর সৈন্য হঠিয়া গেল, কে যে কোথা হইতে যুদ্ধের অবস্থা এইভাবে শোচনীয় করিয়া তুলিল মহারাজ ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিলেন তখন ইংরেজসৈন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালার নবাবের ন্যায় ত্রিপুরার মহারাজ ইংরেজ শক্তির কবলে আসিয়া পড়িলেন, রেসিডেণ্টরূপে লিকসাহেব নিযুক্ত হইলেন, ইনিই ত্রিপুরার সর্ব্বপ্রথম রেসিডেণ্ট।

ইহার কিছুকাল পরে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ জগৎমাণিক্যের পুত্র বলরামমাণিক্যকে চাকলে রোশনাবাদের অধিপতি করিয়া দেন। ইহাতে কৃষ্ণমাণিক্যের হৃতশক্তি আরও খর্ব্ব হইয়া পড়িল কিন্তু এ ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। বলরামমাণিক্যকে দূর করিয়া কৃষ্ণমাণিক্য পুনঃ চাকলে রোশনাবাদের অধিকার প্রাপ্ত

হইলেন। এ জন্য মহারাজকে কলিকাতা ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইয়াছিল। সেইখানে কালিঘাটে মার অর্চ্চনা করিয়া মহারাজ হারিভার লিষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন, হারিভার সদাশয় লোক ছিলেন। তখনও প্রকাশ্যে নবাব শাসন চলিতেছিল তাই চাকলে রোশনাবাদের ভার মহারাজকে পুনঃ অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমতঃ মহারাজকে মুর্শিদাবাদ প্রেরণ পরে নিজেও তথায় গমন করেন। সাহেবের সাহায্যে মহারাজ সফলকাম হইলেন। ইহার কিছুকাল মধ্যেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন এবং লিক সাহেব (Mr. Ralph Leeke) ত্রিপুরার রেসিডেন্ট পদে স্থায়ী হন। লিক সাহেব চাকলে রোশনাবাদ শাসন উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার শাসন মহারাজের হস্তে পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল, এই ভাবে সেই সময় হইতে স্বাধীন ত্রিপুরাও জমিদারী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শাসিত হইতে লাগিল। মোগল শাসনের পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়া গেল।

কৃষ্ণমাণিক্যের যৌবরাজ্য কালে তিনি আগরতলায় (পুরাতন আগরতলা) বসতি নির্ম্মাণ করেন এ কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। শৈলমালার বেষ্টনে স্থানটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলিয়া প্রতিভাত হওয়ায় তিনি সেখানে নদীর ধারে বসতি নির্ম্মাণ করিয়া সমসের গাজি হইতে আত্মরক্ষা করেন। ১১৭০ ত্রিপুরাব্দে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি পুরাতন আগরতলার

প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করেন এবং উহাকে রাজধানীরূপে গড়িয়া তুলিতে ঐ সময় হইতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কৃষ্ণমালা গ্রন্থে এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

এগারশ সত্তর সন হইল যখন
আগরতলা রাজধানী করিল রাজন্ ॥

বঙ্গে ইংরেজ যুগ প্রবর্ত্তিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উদয়পুর হইতে রাজধানী পুরাতন আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়। উদয়পুর হইতে রাজপাট লইয়া আসিবার সমকালেই বৃন্দাবনচন্দ্রের বিগ্রহ ও চতুর্দ্দশ দেবতা আনয়ন পূর্ব্বক তথায় স্থাপন করা হয়। ক্রমে ক্রমে রাজানুচরগণের আবাস নির্ম্মিত হইলে মহারাজ সকলকে লইয়া আগরতলা চলিয়া আসিলেন, উদয়পুর শূন্য হইয়া পড়িল। সুদূর অতীত হইতে যে উদয়পুর রাজশ্রীসমুজ্জ্বল হইয়া আসিতেছিল তাহার গৌরব স্তিমিত হইয়া পড়িল।

কৃষ্ণমাণিক্যের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি কুমিল্লার সতর রত্ন মন্দির।* এ সম্বন্ধে কৃষ্ণমালা গ্রন্থে এইরূপ লেখা হইয়াছে :—

এক মঠে সপ্তদশ মঠের গঠন
সপ্তদশ রত্ন নাম হৈল সে কারণ ॥

—৯ম খণ্ড ২৬৭ পৃঃ।

* কৃষ্ণমাণিক্যের অন্যতম কীর্ত্তি আখাউড়া ষ্টেশন সন্নিহিত রাধামাধব মন্দির। শিলালিপির কিয়দংশ এইরূপ :—বিষ্ণবে কৃষ্ণপ্রীত্যা প্রাদাদ্ রম্যেষ্টকাভির্বিরচিতমমলং মন্দিরং পঞ্চরত্নং। ১৬৯৭ শক।

কৈলাস সিংহ মহাশয়ের মতে রত্নমাণিক্যের সময় ইহার নির্ম্মাণ সুরু হয় এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু রাজমালায় বর্ণিত হইয়াছে যে ইহা কৃষ্ণমাণিক্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, তিনিই মন্দির মধ্যে জগন্নাথ মহাপ্রভু স্থাপন করেন।

বলভদ্র জগন্নাথ সুভদ্রা সহিত
সপ্তদশ রত্নে রাজা করিল স্থাপিত।

—পৃঃ ২৬৭।

রাজধানী যখন উদয়পুর হইতে আগরতলা স্থানান্তরিত হইল তখন উদয়পুর হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ কেন কুমিল্লায় স্থাপিত হইলেন ইহা বুঝা গেল না। স্থানীয় জগন্নাথ বাড়ীর পাণ্ডা ঠাকুরের (অচ্যুতানন্দ) মুখে শুনিয়াছি তাঁহাদের নিকট যে সনন্দ রহিয়াছে উহা মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য প্রদত্ত।*

* শ্রীযুক্ত মোহিনী ত্রিপাঠী উড়িষ্যা হইতে মূল সনন্দ আনিয়া দেখার সুযোগ দেওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সনন্দ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমাণিক্য কর্ত্তৃক রঘুনাথ দাসকে প্রথম প্রদত্ত হয়। তাঁহার বংশক্রম এইরূপ :—

রঘুনাথ
|
রামচন্দ্র
|
মুকুন্দ
|
নরসিংহ

প্রহ্লাদ মুক্তেশ্বর আদিনাথ সদানন্দ

কৃষ্ণমাণিক্য বহু সদ্‌গুণান্বিত ছিলেন, তাঁহার বৈরী সমসের গাজি প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ও অন্য নিষ্কর দান রহিত না করিয়া নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর কাল রাজত্ব ভোগ করিয়া মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।*

(২)

দ্বিতীয় রাজধর মাণিক্য

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে (১১৯৩ ত্রিপুরাব্দে) মহারাণী জাহ্নবী দেবী পতিবিয়োগে স্বয়ং রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিলেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য নিঃসন্তান থাকায় রাণী রাজদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমাণিক্য অনুজ হরিমণিকে যুবরাজ পদে বসাইয়াই ছিলেন। হরিমণি তাঁহার রাজত্বকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। হরিমণির পুত্র রাজধরকেই ভাবী রাজারূপে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ও জাহ্নবী দেবী লালন পালন করিয়া

* মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকাল অবলম্বনে কৃষ্ণমালা রচিত হইয়াছে। রাজমালায় কৃষ্ণমাণিক্য কাহিনী এত সংক্ষেপ করা হইয়াছে যে বুঝিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। কৃষ্ণমালা পাঠ করিলে এই সংক্ষিপ্ত স্থলগুলি সহজেই বুঝা যায়।

আসিতেছিলেন। মহারাজের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া লিক সাহেব আগরতলা আসিলেন। প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া মহারাণী সাহেবের সহিত এ বিষয় আলোচনা করেন। মহারাণী সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ও তিনি এতকাল যাবৎ রাজধরকেই রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য করিয়া আসিতে-ছিলেন, রাজধরই রাজপদের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া রহিয়াছে ইহাতে আর দ্বিরুক্তি নাই। সাহেব মহারাণীর অভিপ্রায় জানিবার পূর্ব্বেই তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন।

পত্রখানি মহারাজের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্রই লিখিত হইয়াছিল।* লিক সাহেবের পত্রের মর্ম্ম ও মহারাণীর অভিপ্রায় ঐক্য হওয়ায় রাজধরের নির্ব্বাচনে বিশেষ জোর হইয়াছিল। সাহেব মহারাণীকে গভর্ণর জেনারেলের নিকট এ বিষয় জানাইতে বলিয়া বিদায় লইলেন।

মহারাণীর প্রার্থনা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট পৌঁছিল কিন্তু আদেশ হইতে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। জাহ্নবী মহাদেবীই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমাণিক্য বীরমণিকে

* To the Hon'ble Warren Hastings, Governor General,
Fort William

Honourable Sir,

I Judge it my duty to inform you that I have this day received infomration of the death of the Rajah of

বড় ঠাকুর করিয়াছিলেন, বীরমণির মৃত্যুতে সে পদ শূন্য হইয়া পড়িল। রাজধরও সিংহাসন পাইলেন না। এদিকে লক্ষ্মণমাণিক্য তনয় (যাঁহাকে সমসের গাজি রাজারূপে প্রচার করিয়াছিলেন) দুর্গামণি রাজপদের অভিলাষী হইতে লাগিলেন, এসব দেখিয়া শুনিয়া রাজ্ঞী দুর্গামণিকে যৌবরাজ্য দিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

১১৯৫ ত্রিপুরাব্দে (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে) রাজধর কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনে রাজধর মাণিক্য রূপে ঘোষিত হইয়া সিংহাসন আরোহণ করেন। তখন দুর্গামণিকে যৌবরাজ্য দেওয়া হয়। রাজ্ঞী জাহ্নবী মহাদেবী দুই বৎসরের অধিক কাল রাজ্য শাসন করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। পরমায়ু ফুরাইয়া আসিতেছে

Tipperah, who died on the 11th instant .....He has not left any children, but a nephew and other relations, the succession is claimed by the former as nearest in blood to the deceased. I have no doubt as it was to my knowledge, the earnest desire of the Raja and Rany that the nephew should succeed,......I shall in consequence of this intelligence immediately proceed to Tipperah and shall not acknowledge any Rajah there until I have authority for it.

I am,

Islamabad Sd. R. Leeke

July 15, 1783 Resident.

বুঝিয়া মহারাণী তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন এবং গঙ্গাস্নানে তৃপ্তি লাভ করেন। কুমিল্লার প্রসিদ্ধ 'রাণীর দীঘি' তাঁহারই কীর্ত্তি বলিয়া কৈলাস সিংহ মহাশয়ের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। ১২১০ ত্রিপুরাব্দে পুণ্যবতী জাহ্নবী মহাদেবীর মৃত্যু হয়। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়।

রাজক্ষমতা লাভ করিয়া রাজধর ক্রমেই শান্ত সুস্থির হইলেন, তাঁহার বাল চপলতা দূর হইল। বিজয়মাণিক্য-তনয় রামচন্দ্র যে সময়ে ত্রিপুরা রাজ্য ত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার চিত্তে দুরভিসন্ধি হওয়ায় তিনি রিয়াং প্রজাগণকে মহারাজ রাজধর মাণিক্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন। এ সংবাদ চাপা রহিল না, শীঘ্রই রাজধর মাণিক্য তাঁহাকে দমন করিতে সৈন্য পাঠাইলেন। পর্ব্বতে পর্ব্বতে উভয় পক্ষে লড়াই চলিতে লাগিল, তিন বৎসর সংগ্রামের পর বিপক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল।

রাজরাণীর মৃত্যুতে মহারাজ রাজধর মাণিক্য ১২০৮ সনে মণিপুররাজ জয়সিংহের কন্যা চন্দ্ররেখার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহান্তে মহারাজ জয়সিংহ গঙ্গাস্নানে বাহির হন, প্রেমতলা পদ্মাতীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার এক বৎসর পর নিজপুত্র বড় ঠাকুর রামগঙ্গার চন্দ্রতারার সহিত পরিণয় সম্পন্ন হয়।

সুদৃঢ় ব্রিটিশ শক্তির বেষ্টনে ত্রিপুরা রাজ্য রাজধরমাণিক্য হইতে চলিয়া আসিতেছে, মুসলমান যুগে যেরূপ গৃহবিবাদ এবং স্ব স্ব শক্তিতে নিজ রাজ্যসীমার পরিবর্দ্ধন চলিত ব্রিটিশ

যুগে তাহার একান্ত অভাব ঘটায়, রাজত্ব ঘটনা বিরল হইয়া পড়িয়াছে। আসমুদ্র হিমাচল ব্রিটিশ শক্তির অখণ্ড প্রতাপে রণবিরহিত এক শান্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সেই একই অবস্থা!

রাজধর মাণিক্যের কোষ্ঠীতে ইচ্ছামৃত্যু যোগ দৃষ্ট হয়। ১২১৪ ত্রিপুরাব্দে মহারাজ দেহত্যাগে ইচ্ছুক হইয়া আশ্বিনের পুর্ণিমায় যোগাসনে বসিয়াছিলেন, ইহাতে জয়দেব উজীর মহারাজকে অতি বিনীত বচনে জানান মহারাজ যেন উত্তরায়ণে দেহরক্ষা করেন। রাজধর মাণিক্য উজীরের বাক্য শুনিয়া যোগ ত্যাগ করেন এবং মাঘমাস পর্য্যন্ত মৌনী রহিলেন। ১লা মাঘ শুক্লা প্রতিপদে পুনরায় তিনি যোগাসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং যোগশক্তিতে তনুত্যাগ করিলেন।

(৩)

দুর্গামাণিক্য

রাজধর মাণিক্যের মৃত্যুর পর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে (১২১৪ ত্রিপুরাব্দে) যুবরাজ দুর্গামণির অভিষেক হওয়ার কথা ছিল কিন্তু মহারাজকুমার বড়ঠাকুর রামগঙ্গা সিংহাসন অধিকার করেন। ইহাতে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। প্রবল পরাক্রম ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট থাকিতে উভয়ের দাবী লইয়া যুদ্ধের সৃষ্টি না হইয়া

মোকদ্দমার সৃষ্টি হইল। কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহ এপক্ষ কেহ ওপক্ষ লইল। দুর্গামণির পক্ষে প্রধান সহায় ছিলেন রামরতন দেওয়ান। যুবরাজ দুর্গামণি ইহার ভগিণী সুমিত্রার পাণিগ্রহণ করেন। যুবরাজ দুর্গামণি কুকি সরদারগণের সাহায্যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে জানাইয়া দেন তিনি যেন অস্ত্রত্যাগ করিয়া আইন অবলম্বনে দেওয়ানী আদালতে নিজ স্বত্ব প্রমাণিত করেন। দুর্গামণি তদনুযায়ী অস্ত্রত্যাগ করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কৈলাস সিংহ মহাশয় এ সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "ইহা নিতান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে মহারাজ রামগঙ্গা ও তাঁহার অমাত্যবর্গ কেবল রাজপরিবারের উত্তরাধিকার লইয়া সেই মোকদ্দমায় বহুবিধ তর্ক ও আপত্তি উপস্থিত করিলেন কিন্তু ব্রিটিশ আদালতে এবম্প্রকার মোকদ্দমা চলিতে পারে কি না এই তর্ক উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহাদের মস্তিষ্ক সঞ্চালিত হইল না। এই ঘটনার ৬০ বৎসর পর কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মনট্রি সাহেবের মস্তিষ্কে প্রথমে ইহা উদিত হইয়াছিল।"

আইনের অধিকার অনধিকার যাহাই থাকুক আদালতে এ বিচার কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। "১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এই মোকদ্দমা ঢাকা প্রভিন্সিয়েল কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ বার্ড ও দ্বিতীয় বিচারপতি মিঃ মেলভিল দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়াছিল।" দুর্গামণিই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্ণীত হইলেন এবং জমিদারীর

ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যানেজার হইলেন। মহারাজ রামগঙ্গা ইহার বিরুদ্ধে আপিল করিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে (১২১৯ ত্রিপুরাব্দে) যুবরাজ দুর্গামণি চাকলে রোশনাবাদের অধিকার প্রাপ্ত হন। তৎপর তিনি ত্রিপুরার সিংহাসনে দুর্গামাণিক্য নামে অভিষিক্ত হন।

সিংহাসনচ্যুত রামগঙ্গামাণিক্যের জীবন বড়ই দুঃখময় হইয়া উঠিল। তিনি নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে বিশগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ভ্রাতা কাশীচন্দ্র এ দুঃসময়ে তাঁহার সহচর হইয়াছিলেন।

দুই বৎসর রাজত্ব করিবার পর দুর্গামাণিক্য তীর্থ দর্শনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। হয়ত সংসারের অনিত্যতায় এবং অচিরে নিজ মৃত্যুর বিষয় ভাবিয়া তীর্থের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাসে যাত্রার দিন ধার্য্য হইল। রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে রামগঙ্গামাণিক্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রবাসে তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। রামগঙ্গামাণিক্য সংবাদ পাইয়া দুর্গামাণিক্যের সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে সত্বর চলিয়া আসিলেন, উভয়ের মনোমালিন্য যেন কোন্ মন্ত্রবলে দূর হইয়া গেল!

গোমতীর মোহনায় উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। দুর্গামাণিক্য রামগঙ্গামাণিক্যকে অতি সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং অত্যন্ত বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন "তীর্থযাত্রা করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি, এ রাজ্যে আর ফিরিব কিনা কে জানে?

কারণ—

জীবন মরণ লোকের আত্ম-ইচ্ছা নহে
নিমিত্তের ফলাফল কর্ম্ম হয় তাহে ॥”



এ রাজ্যে আর ফিরিব কিনা কে জানে?

দুর্গামাণিক্য হয়ত মৃত্যুর পূর্ব্বাভাষ পাইয়াছিলেন তাই জীবন সম্বন্ধে এরূপ নিরাশবাণী কহিলেন। তারপর রামগঙ্গামাণিক্যকে এইভাবে সম্বোধন করিলেন—

রাজ ধর্ম্মমতে প্রজা করিবে পালন
স্বধর্ম্মে থাকিয়া রাজ্য করিবে রক্ষণ ।
ভবিতব্য থাকে যদি পুনঃ আসিবার
তোমা সঙ্গে আর দেখা হইবে পুনর্ব্বার ।

এই কথা বলিতে বলিতে দুর্গামাণিক্য বিষণ্ন হইলেন—

এ সব কহিয়া রাজা থাকে বিমর্ষিয়া
রামগঙ্গামাণিক্য কহে নৃপ আশ্বাসিয়া ॥
শরীর হইয়াছে জীর্ণ বলিতে সংশয়
পিতৃকার্য্যে চলিয়াছেন নিষেধ না হয় ॥

মহারাজ দুর্গামাণিক্য, রামগঙ্গামাণিক্য ও কাশীচন্দ্র একসঙ্গে সে সময় বসিয়াছিলেন ঃ—

এই মতে আলাপ করিছে তিন ভাই
পরস্পর রোদনের কিছু ক্ষেমা নাই ॥

এইরূপে নৌকাযোগে মহারাজ, রাণী ও পরিজনসহ তীর্থ দর্শনে বাহির হইয়া গেলেন। সর্ব্বপ্রথমে কাশী আসিলেন তথা হইতে মাঘ মাসে প্রয়াগ গমন করেন, সেখান হইতে পুনরায় কাশী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শিবমন্দির স্থাপন করেন। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শনে চিত্তের শান্তি হয় ষোড়শোপচারে দানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গয়া

যাইবার জন্য নৌকাযোগে যাত্রা করেন। পাটনার নিকটে পৌঁছিয়া পূর্ব্বকূলে গঙ্গার তীরে নৌকা বাঁধা হয়, মহারাজের শরীর ক্রমেই যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল, মহারাজ বুঝিতে পারিলেন অন্তিম সময় উপস্থিত। তখন ১২২২ সন, ২৫শে চৈত্র কালী-পূজার অনুষ্ঠান করা হয়। মার পূজা হইতেছে আর মহারাজ ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন, পূজা সমাধা হইল কি? পূজা সমাধা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ অন্তর্জলি করিলেন, অর্দ্ধ-অঙ্গ গঙ্গাজলে অর্দ্ধ-অঙ্গ স্থলে রহিল।

অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে অর্দ্ধ অঙ্গ রহিবে স্থলে,
কেহবা লিখিবে ভালে কালী নামাবলী।

দুর্গামাণিক্যের সাধকের অভীষ্ট মৃত্যু হইল, কালী নাম করিতে করিতে দেহ কালবশ হইয়া গেল—

গঙ্গামধ্যে প্রাণত্যাগ গেল স্বর্গপুরে

মৃত্যুকালে মহারাজের মাত্র ৩৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া একমাস মধ্যে গয়ায় বিষ্ণুপাদে পিণ্ড দেওয়া হয়।

(৪)

রামগঙ্গামাণিক্য

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে (১২২৩ ত্রিপুরাব্দে) দুর্গামাণিক্যের মৃত্যু সংবাদ দেশে প্রচারিত হইলে রামগঙ্গামাণিক্য স্বীয় দাবী কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট রামগঙ্গা-মাণিক্যকে সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিলেন কিন্তু আরও অনেক দাবীদার জুটিয়া গেল। দ্বিতীয় বিজয়-মাণিক্য-তনয় রামচন্দ্র ঠাকুর, তাঁহার পুত্র শম্ভুচন্দ্র, রাজধর-মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র অর্জ্জুনমণি এবং সুমিত্রা দেবী, ইহারা সকলেই সিংহাসনে স্ব স্ব দাবী জানাইলেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের অঙ্গুলি সঙ্কেতে সকল দাবীদারই নিরস্ত হইয়া গেলেন—রামগঙ্গামাণিক্য পুনঃ রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের ন্যায় তাঁহার রাজযোগে ভঙ্গযোগ লক্ষিত হয়, তাই বহু কষ্ট সহিয়া পুনঃ. সিংহাসন লাভ করেন। ১২২৩ ত্রিপুরাব্দে রাজদণ্ড ধারণ করিলেও তাঁহার অভিষেক-কার্য্য প্রতিপক্ষদের জন্য কিছুকাল স্থগিত থাকে।

আইন বলে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শম্ভুচন্দ্র রামগঙ্গা মাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন—কুকিদের উত্তেজিত করিয়া মহারাজের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত করেন।

মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন,

উদয়পুরে সৈন্য সজ্জা হইতে লাগিল। মহারাজ আগরতলা ছিলেন বলিয়া শম্ভুচন্দ্র হালাম সৈন্য দিয়া রাজধানী অবরোধ করিতে প্রয়াস পাইলেন কিন্তু মহারাজের চতুর ব্যবস্থায় শম্ভুচন্দ্রের হার হইল। শম্ভুচন্দ্র চট্টগ্রাম যাইয়া আশ্রয় লইলেন এবং মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য মোগড়া গ্রামের সান্নিধ্যে এক বিপুল আকারের দীঘি খনন কার্য্য আরম্ভ করেন, উহাতে সহস্র মাটিয়াল নিযুক্ত হয় এবং ৩৭ হাজার টাকা ব্যয়ে উক্ত দীঘি খনন কার্য্য সমাধা হয়। ট্রেনে যাইতে ইহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ইহার নাম গঙ্গাসাগর। বর্ত্তমানে এ দীঘির পারে তহসিল আফিস রহিয়াছে। বাস করিবার অভিপ্রায়ে সেখানে মহারাজ এক সুরম্য ভবন প্রস্তুত আরম্ভ করেন এবং তদুদ্দেশ্যে বাস্তু পূজার অনুষ্ঠান করা হয়।

১২৩১ সনে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় তাহাতে শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতির দাবী সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হয়। তখন রাজধানীতে অভিষেকের জন্য বিপুল আয়োজন চলিতে থাকে। বেদবিধি অনুসারে মহারাজ শুভদিনে অভিষিক্ত হইলেন। রামগঙ্গা-মাণিক্যের পুনরভিষেক কার্য্য গোবিন্দমাণিক্যের পুনরভিষেক কথা স্বতঃই স্মরণ করাইয়া দেয়। কামান গর্জ্জনে অভিষেক সমাপ্তি দিকে দিকে ঘোষিত হইল। অভিষেক ক্রিয়ান্তে অনুজ কাশীচন্দ্রকে যৌবরাজ্য ও স্বীয় তনয় কৃষ্ণকিশোরকে বড়ঠাকুর

পদ দেওয়া হয়। ব্রিটিশ প্রতিনিধি সাক্ষাতে অভিষেক সম্পন্ন হইলে তিনি তিন দিন আগরতলা থাকিয়া বিদায় লইলেন। নৃত্যগীতে রাজ্য মুখরিত হইয়াছিল ইহা বলাই বাহুল্য।

রামগঙ্গামাণিক্যের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মযুদ্ধ ঘটে এবং তাহাতে তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে থাকিয়া সৈন্য সাহায্য করিয়াছিলেন। মণিপুররাজ জয়সিংহের কন্যা চন্দ্ররেখার সহিত রাজধরমাণিক্যের বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা উভয় রাজত্ব মধ্যে কুটম্বিতা বন্ধন সুদৃঢ় হয়। কিন্তু জয়সিংহের মৃত্যুর পর মণিপুর সিংহাসনের উপর নানা বিপর্যায়ের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। জয়সিংহ-তনয় লাবণ্যচন্দ্র সিংহাসন আরোহণ করার পরই ষড়যন্ত্রের ফলে নিহত হন। তখন মধুচন্দ্র রাজা হন, তিনি শীঘ্রই চৌরজিৎ হস্তে প্রাণ হারান। চৌরজিতের অভিলাষ পূর্ণ হইল না, তাঁহার ভ্রাতা মারজিৎ তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়া সিংহাসন দখল করেন। বিতাড়িত চৌরজিৎ নিরুপায় দেখিয়া আগরতলা আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজ তাঁহাকে নিঃস্ব দেখিয়া কিছু অর্থ প্রদান করেন। অতঃপর চৌরজিৎ হেড়ম্বরাজের অনুগ্রহ ভাজন হইয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন। মারজিৎও অতি সত্বর গম্ভীরসিংহ কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। যখন গম্ভীরসিংহ সিংহাসনে সমাসীন তখন ব্রহ্মসৈন্য আসিয়া মণিপুরে হানা দিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া গম্ভীরসিংহও হেড়ম্ব রাজ্যে যাইয়া আশ্রয় খুঁজিলেন। অদৃষ্টের তাড়নায়

এখন চৌরজিৎ, মারজিৎ ও গম্ভীরসিংহ তিন ভাই-ই হেড়ম্ব-রাজ্যে প্রজাভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

হেড়ম্বরাজ গোবিন্দচন্দ্র ইহাদের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক আতিথ্য প্রদান করেন। কিন্তু ইহারা ষড়যন্ত্র করিয়া সহসা রাজ ক্ষমতা অধিকার করিয়া মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রকে তাড়াইয়া দেন। এইবার ব্রহ্মসৈন্য হেড়ম্বরাজ্য ঘিরিয়া ফেলিল, তখন চৌরজিৎ, মারজিৎ ও গম্ভীরসিংহ শ্রীহট্টে আসিয়া কোম্পানীর শাসনে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ব্রহ্মসৈন্যদের সহিত ইংরেজশক্তির সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল, এই যুদ্ধে রামগঙ্গামাণিক্য ইংরেজদিগকে যথাশক্তি সাহায্য করেন।

মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন এবং নিতান্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে ত্রিপুরা মহারাজের অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তি হইতেছে গোপীনাথ মন্দির। গোপীনাথের নাটমন্দির ভগ্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, মহারাণীর প্রযত্নে উহার সংস্কার সাধন হয়। শুনিয়াছি ঐ নাটমন্দির পুনঃ ভগ্নদশায় আসিয়াছে এবং অচিরে সংস্কার আবশ্যক। গোপীনাথের সেবার জন্য উড়িষ্যা দেশে দেবোত্তর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া পাণ্ডার অধিকারে রাখা হইয়াছে। গোপীনাথের মন্দির ত্রিপুরারাজ্যের শির বঙ্গের বাহিরে উন্নত করিয়া রাখিয়াছে।

শেষ জীবনে রাজধর মাণিক্যের রাণী চন্দ্ররেখা বৃন্দাবনে বাস করিতে থাকেন এবং কালক্রমে ধাম প্রাপ্ত হন।

মহারাজের চিত্তে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মূর্ত্তি দিবারাত্র বিরাজ করিত তাই সেই লীলাভূমিতে ভগবানের বিগ্রহ স্থাপন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি খণ্ডল দেশের কাশীবাসী গৌরীচন্দ্র চৌধুরীকে বৃন্দাবনে মন্দির স্থাপন করিবার জন্য পাঠান। গৌরীচন্দ্র বৃন্দাবনে পৌঁছিলে মহারাজ পঁচিশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দেন। গৌরীচন্দ্র স্থান নির্ব্বাচন করিয়া কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিলেন—শুভদিনে কুঞ্জ মধ্যে রাসবিহারী প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অদ্যাপি 'ত্রিপুরা মহারাজ কুঞ্জ' নামে এই স্থান বৃন্দাবনে সুপরিচিত। মহারাজ রামগঙ্গা দীর্ঘকাল স্বর্গীয় হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি লোক চক্ষে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

মহারাজ অত্যন্ত গুরুভক্ত ছিলেন। স্বীয় গুরু ভুবনমোহনের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার নিকট হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করিতেন। মৃত্যুকালে গুরু-পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে (১২৩৬ সনে) মহারাজ রামগঙ্গার মৃত্যু হয়।

(৫)

কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে (১২৩৬ সনে) রামগঙ্গামাণিক্যের অনুজ কাশীচন্দ্র রাজক্ষমতা পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর ফাল্গুন মাসে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে খিলাত প্রদান করেন। ইহার পর তাঁহার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই রামগঙ্গামাণিক্য-তনয় কৃষ্ণকিশোর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। তখন কাশীচন্দ্রের পুত্র কুমার কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স মাত্র ৩ বৎসর। সেই শিশু অবস্থায়ই তাঁহাকে বড়ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুতে মহারাজ কাশীচন্দ্র হৃদয়ে অতীব ব্যথা পাইলেন। পুত্রের মৃত্যুতে শান্তি না পাইয়া তিনি উদয়পুরে চলিয়া আসেন এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে (১২৩৯ সনে) মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে মহারাজের মাত্র ৪১ বৎসর হইয়াছিল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে (১২৩৯ সনে) যুবরাজ কৃষ্ণকিশোর রাজদণ্ড গ্রহণ করেন, এবং কিছুকাল পরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহারই রাজত্বকালে রাজমালার শেষভাগ রচিত হয়। ইহাতে কাশীচন্দ্র মাণিক্য অবধি রাজ্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের রাজত্ব কালের প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ত্তমান আগরতলার স্থান নির্ব্বাচন এবং নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেখানে রাজপাট স্থাপন।

মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশানচন্দ্র আড়াই বৎসর বয়ঃক্রম কালে যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হন। মহারাণী সুদক্ষিণার গর্ভে যুবরাজ ঈশানচন্দ্র, উপেন্দ্রচন্দ্র ও বীরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত নীলকৃষ্ণ, চক্রধ্বজ (কালা রাজা), মাধবচন্দ্র, যাদবচন্দ্র, সুরেশকৃষ্ণ ও শিবচন্দ্র নামে মহারাজের আরও ছয় পুত্র হয়। দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্রকে তিনি বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে (১২৫৯ সন) মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়।

মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি আখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। জ্যোৎস্না রাত্রিতে মহারাজ প্রাসাদে উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময় দ্বারদেশে কাহাদের ছায়া দেখা গেল। মহারাজ ভাবনিমগ্ন ছিলেন, সহসা চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন, একি! তাঁহার আসন সম্মুখে দীর্ঘকায় তিন জন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, মহারাজ শিহরিয়া উঠিলেন! সন্ন্যাসীত্রয় যুগপৎ কহিয়া উঠিলেন—“মহারাজ, আমাদের চিনিতে পারেন কি?” মহারাজ ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন, মুখ হইতে কথা সরিতেছিল না; তাই ত, ইঁহারা কে! একজন অমনি বলিলেন—“মহারাজ, রাজভোগে একেবারে চুর হইয়া আছেন

আমাদের কথা একেবারেই স্মরণে আসিতেছে না ? ওঃ, কি সর্ব্বনাশা এই রাজ্য নেশা !" অপ্রস্তুত হইয়া মহারাজ আসন ত্যাগ করিয়া





মহারাজ সহসা চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে তিনজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী।

ইহাদিগকে সসম্মানে বসাইলেন তারপর নিজে বসিলেন। তখন অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি আপনাদের কখনো দেখিয়াছি মনে হয় না।" এই বলিয়া মহারাজ অধোবদনে রহিলেন। মহারাজের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীত্রয় যুগপৎ হাসিয়া উঠিলেন—"হাঃ হাঃ, এ সব ভুলিয়াছে, সব ভুলিয়াছে ! মায়া মোহে একেবারে মজিয়াছে।"

অতঃপর ব্রজমোহন ঠাকুর বলরামের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্য ও জমিদারী পরিচালন করিতে লাগিলেন। ১২৬১ ত্রিপুরাব্দে যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র পরলোক গমন করেন। মহারাজ ঈশানচন্দ্রের বড় মহারাণী রাজলক্ষ্মী দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। মধ্যম মহারাণী মুক্তাবলীর গর্ভে কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, চতুর্থ মহারাণী জাতীশ্বরী দেবীর গর্ভে কুমার নবদ্বীপচন্দ্র জাত হন।

ব্রজমোহন ঠাকুর মহা ফাঁপরে পড়িলেন। ঋণভার কমাইবার কোন উপায় খুজিয়া না পাইয়া অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন এদিকে ঋণের দায়ে চাকলে রোশনাবাদ বিক্রয় হইবার মত হইয়া উঠিল। মহারাজ ঈশানচন্দ্র ব্রজমোহনের অবস্থা বুঝিয়া যোগ্যতম লোকের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে (যিনি পরে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন) উক্ত পদে মনোনীত করিবার জন্য মহারাজের সান্নিধ্যে আহ্বান করিয়া আনা হয়। এমন সময় রাজগুরু প্রভু বিপিনবিহারী গোস্বামী উক্ত নির্ব্বাচনে বাধা দেন। মহারাজের গুরুভক্তি অপরিসীম ছিল, তাই তিনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিয়োগ পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেন এবং সেই ভার স্বীয় গুরুর চরণে সমর্পণ করেন। তেজস্বী বিপিনবিহারী উহা গ্রহণ করেন।

তখন হইতে বিপিনবিহারী রাজকার্য্যে মহারাজের কর্ণধার হইলেন। তিনি যে মহারাজের অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী ছিলেন

ইহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাতে রাজত্ব সুপরিচালিত হয় ইহাতে বিন্দু পরিমাণেও তাঁহার যত্নের ত্রুটি ছিল না। চাণক্যের ন্যায় কঠোর শাসনে অচিরে রাজ্যমধ্যে জড়তা দূর হইল এবং আয় বাড়িয়া চলিল। যেমন রাজত্বের আয় বাড়িল তেমনি ব্যয় কমাইয়া দিলেন, ইহাতে রাজভাণ্ডারে বেশ সঞ্চয় হইতে লাগিল এবং সঞ্চিত অর্থে ঋণ শোধ হওয়ায় চাপ কমিয়া আসিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের তুমুল বিপ্লব ঝটিকার ন্যায় দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরা রাজ্যের অভিমুখে আসিতেছে জানিয়া মহারাজ ঈশান-চন্দ্র তৎক্ষণাৎ ইহাদের গতিরোধ করিবার জন্য স্ব-সৈন্য পাঠাইয়া দেন। সিপাহীরা মহারাজের নিকট হইতে আশ্রয় পাওয়ার পরিবর্ত্তে বাঁধাপ্রাপ্ত হইয়া কাছাড় অভিমুখে প্রস্থান করে। যাহারা ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদিগকে তিনি ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। এইভাবে এক ভীষণ বিপদের মধ্য হইতে ত্রিপুরা রাজ্যকে স্বীয় প্রতিভাবলে রক্ষা করেন। মহারাজের শত্রুস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁহার ও রাজত্বের ঘোর অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যে সিপাহীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু ব্রিটিশ বিচারের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সে সকল দুরভিসন্ধি প্রকাশ পাইয়া যায় এবং ত্রিপুরেশ্বরের গুণে ত্রিপুরা রাজ্য অক্ষতভাবে সে অগ্নিপরীক্ষায় টিকিয়া উঠে।

এই সময়ে কুকিগণের প্রভাব লক্ষিত হওয়ায় গ্রেহাম সাহেব আগরতলা আসেন। যুবরাজ ও বড় ঠাকুর পদে তখন পর্য্যন্ত কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় নাই--ইহাও গ্রেহাম সাহেবের আলোচ্য বিষয় ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের নিকট তিনি এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট করেন, ইহাতে মহারাজের ভাব বুঝিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন যে নীলকৃষ্ণ ও বীরচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় পুত্রদ্বয়কে উক্ত পদে নির্ব্বাচন করেন ইহাই মহারাজের মনোগত অভিপ্রায়। শেষ পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, 'মহারাজের ইচ্ছার উপরই ইহা নির্ভর করে' এরূপ জানাইয়া মহারাজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

এ দিকে গুরু বিপিনবিহারী মহারাজের আয় বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করিয়া চাকলে রোশনাবাদের অন্তর্গত নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। যেখানে দানপত্র দুর্ব্বল সেখানে আইনের সাহায্যে উহাকে অসিদ্ধ প্রমাণ করিতে লাগিলেন। মহারাজের নিকট ইহা নিতান্ত অপ্রীতিকর ঠেকিয়াছিল তাই তিনি প্রভুর পদযুগল ধরিয়া এ বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু প্রভু দমিলেন না, তিনি মহারাজকে বলিলেন—"বাবা, তোমার সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিলাম। লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া আমি তোমার আয় প্রায় লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করিব।"

এইরূপে বিপিনবিহারী মহারাজের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও "একজন রাজপুরোহিতের ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহার

কর ধার্য্য করিলেন, তাহার বন্দোবস্তী পাট্টাতে মহারাজের মোহর অঙ্কিত করিবার জন্য গুরু সেই পাট্টা লইয়া রাজসমক্ষে উপস্থিত হইলে মহারাজ পুনর্ব্বার গুরুকে বলিলেন, "প্রভো! এই কার্য্য হইতে বিরত হউন!"

"গুরুভক্তি পরায়ণ নৃপতি গুরুর আজ্ঞা পালন করিবার জন্য "শ্রীগুরু আজ্ঞা" মোহর তাহাতে অঙ্কিত করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মভয়ে ধর্ম্মভীরু নৃপতির হৃদয় ও হস্ত কম্পিত হইল। ইহার কয়েক মুহুর্ত্ত পরে মহারাজ একখণ্ড চিঠি লিখিতে ইচ্ছা করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন কিন্তু লেখনী সঞ্চালন করিতে পারিলেন না, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রমে (১২৭১ ত্রিপুরাব্দে) মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য জীবনান্তকর বাতব্যাধি রোগে আক্রান্ত হইলেন।"

"মহারাজ ঈশানচন্দ্র রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে সপরিবারে বাস করিবার জন্য একটি নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। সেই অট্টালিকা প্রস্তুত হইলে ১২৭২ ত্রিপুরাব্দের ১৬ই শ্রাবণ মহারাজ নূতন গৃহে প্রবেশের দিন অবধারণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট ১৬ই শ্রাবণ পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে মহারাজ ঈশানচন্দ্র নূতন নিকেতনে প্রবেশ করিলেন। তৎপর দিবস (প্রায় ১০ ঘটিকার সময়) অসাধারণ গুরুভক্তি-পরায়ণ প্রজারঞ্জক মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য ৩৪ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক গমন করেন।"*

* কৈলাসসিংহ প্রণীত রাজমালা—পৃঃ ১৭৪-৭৬।

সন্ন্যাসীগণের হাসি থামিল। তাঁহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ, সুদূর হিমালয় হইতে আমরা আপনার নিকট একটি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। বলুন, আমরা যাহা চাহিব তাহাই দিবেন।" মহারাজ প্রমাদ গণিলেন—"আপনারা কি চাহেন, না জানিয়া কেমন করিয়া কথা দিব?" তখন সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন বলিলেন "আপনি কথা দিন, তারপর আমরা আমাদের কথা বলিব।" পাছে ইহারা রুষ্ট হন এই ভাবিয়া মহারাজ প্রতিশ্রুতি দিলেন। অমনি একজন সন্ন্যাসী প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—"আমরা মহারাজের প্রসাদ পাইতে আসিয়াছি।" মহারাজ ইহা শুনিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন, তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। "আপনারা তবে কি আমার মৃত্যু কামনা করিয়া এখানে আসিয়াছেন?" ইহাতে সন্ন্যাসীরা কিছুই বলিলেন না, শুধু মহারাজকে এই কথাটি বলিলেন—"আগামী বৎসর ঠিক এই দিনে আমরা আসিব, ইহার মধ্যে দেখুন আমাদের স্মরণ হয় কিনা।" এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ লক্ষ্য করিলেন সন্ন্যাসীদের আকৃতি অস্পষ্ট হইতে লাগিল। সভয়ে মহারাজ দেখিতে লাগিলেন সন্ন্যাসীরা ক্রমে মিলাইয়া গেলেন।

বৎসর কাটিয়া গেল,—আবার সেই দিন উপস্থিত। চাঁদের আলোতে রাজপ্রাসাদ ঝল্‌মল্ করিতেছে, তোরণদ্বারে সিপাহীর কড়া পাহারা, যেন কেহ প্রাসাদ অভিমুখে বিনা সংবাদে না আসিতে পারে। মহারাজ একাকী সেই কক্ষে বসিয়া আছেন,

প্রদীপ জ্বলিতেছে। এই বৎসর কাল যাবৎ মহারাজ ভোগ বিলাস ত্যাগ করিয়া কঠোর সংযমে কাটাইয়াছেন কারণ তাঁহার স্পষ্ট ধারণা হইয়াছিল যে তাঁহার কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। একটু শব্দ হইল, মহারাজ চমকিত হইয়া দেখিলেন সেই সন্ন্যাসীত্রয়ের মূর্ত্তি ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহারা ইসারায় মহারাজকে অভিবাদন করিয়া আসনে বসিয়া পড়িলেন।

মহারাজ বলিলেন—"আপনাদের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি এখন কি করিতে হইবে আদেশ করুন।" সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন!" মহারাজ তখন আসন হইতে উঠিয়া সুস্বাদু ফল পূর্ণ একটি সোণার থালা তাঁহাদের কাছে ধরিলেন। একজন সন্ন্যাসী কহিলেন—"আপনি স্বয়ং গ্রহণ করুন, তারপর আমাদিগকে দিন।" মহারাজ তাহাই করিলেন। সোণার থালা হইতে গুটিকয় ফল সরাইয়া লইলেন। তখন সন্ন্যাসীরা সেই ফল গ্রহণ করিলেন।

মহারাজ অত্যন্ত বিষণ্ণ অন্তরে আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন—"আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলাম কিন্তু আপনাদের পরিচয় ত পাইলাম না।" তখন জটাজুট এলাইয়া একজন সন্ন্যাসী কহিলেন—"মহারাজ, বহুকাল পূর্ব্বে আমরা চার সন্ন্যাসীতে তপস্যায় বসিয়া ছিলাম। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে আপনি বলিয়াছিলেন, ভোগ লালসা আপনার মন হইতে সরিয়া যায় নাই, তাই ভোগের মধ্যে আপনাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। জন্মগ্রহণ করিলে আমরা নিশ্চয় টের পাইব

তখন যেন আপনাকে এ বিষয় স্মরণ করাই এইরূপ প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন। অদ্য আমরা সেই প্রতিশ্রুতিমতে আপনাকে পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করাইতে আসিয়াছি। আপনি আর এক বৎসর ইহলোকে থাকিবেন, পুনরায় তপস্বী জীবনের জন্য প্রস্তুত হউন।” এই বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই সন্ন্যাসীত্রয় অদৃশ্য হইলেন।

ইহার এক বৎসর পর অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে মহারাজের মৃত্যু হয়। মহারাজের মৃত্যু সম্পর্কিত এই আখ্যান দ্বারা গীতায় শ্রীভগবানের বাক্য স্মরণ হয়—

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥

পূর্ব্বোক্ত আখ্যান ভগবদ্বাক্যের মহিমাই কীর্ত্তন করিতেছে।*

(৬)

ঈশানচন্দ্রমাণিক্য

পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ ঈশানচন্দ্র ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে (১২৫৯ ত্রিপুরাব্দে) সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু নবীন মহারাজের

* কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের মহারাণী সুলক্ষণা ১৭৬৬ শকাব্দে কুমিল্লায় শ্রীশ্রীজগন্নাথের জন্য নূতন মন্দির প্রস্তুত করেন। কুমিল্লায় শিলালিপির কিয়দংশ এইরূপ—“সুলক্ষণা······গুণৈকালয়া প্রাসাদঃ পরিনির্ম্মিতঃ খলু তয়া শ্রীকৃষ্ণসন্তুষ্টয়ে।”

স্কন্ধে ১১ লক্ষ টাকার ঋণভার রাজমুকুট ধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যস্ত হইল। ইহাতে রাজত্বের প্রকৃত সুখ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। রাজপরিবারের সম্পর্কিত বলরাম হাজারির হস্তে রাজ্য ও জমিদারীর ভার অর্পিত হইল। হাজারি নিতান্ত কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার কঠোর শাসনে আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং ঋণ দেওয়া সহজ হইবে এরূপ ভাবিয়া মহারাজ শান্তি পাইয়াছিলেন কিন্তু ঘটনা দাঁড়াইল অন্যরূপ। বলরাম ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীদামের কঠোর হস্তচালনায় চতুর্দ্দিকে অসন্তোষের বহ্নি চাপা ভাবে জ্বলিতে লাগিল, পরিশেষে একদিন আত্মপ্রকাশ করিল। পরীক্ষিৎ ও কীর্ত্তি নামে দুইজন পার্ব্বত্য সরদার কুকি সৈন্য লইয়া গভীর রজনীতে বলরাম ভবন ঘেরাও করিল। বলরাম পলায়ন করে কিন্তু শ্রীদাম কীর্ত্তির হস্তে হত হন। মহারাজ ঈশানচন্দ্র বলরামের শত্রুগণকে বন্দীশালায় আটক করিলেন।

কিন্তু বলরামের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইল না। বলরাম ঈশানচন্দ্রমাণিক্যকে বধ করিবার জন্যও ষড়যন্ত্র চালাইতে লাগিলেন। সর্দ্দার খাঁ, ছোবান খাঁ প্রভৃতির সহিত পরামর্শ চলিতে লাগিল। বলরামের অভিপ্রায় ছিল যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রকে সিংহাসন প্রদান করা। কিন্তু ষড়যন্ত্র বাহির হইয়া পড়িল এবং ঈশানচন্দ্র বিপক্ষ নেতৃগণকে ধৃত করিয়া রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন। এইরূপ গুরুতর ষড়যন্ত্রের ফলে কাহারও গুরুদণ্ড না হওয়া মহারাজের মহত্ত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।



মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর

২৩৩ পৃঃ

কাশীচন্দ্র মা[illegible]

রুষরাষ্ট্রে পিটার যেমন নূতন আকার দান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, বীরচন্দ্রমাণিক্যও তেমনি ত্রিপুরা রাজ্যকে এক নূতন রূপ দান করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যের এই নূতন কাঠাম প্রস্তুত করিয়াছেন বাবু নীলমণি দাস। মহারাজের আবেদন অনুযায়ী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নীলমণি বাবুকে সিভিল সার্ভিস হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট ত্রিপুরার সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেওয়ানরূপে নিয়োগ করেন।

"নীলমণি দাস কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ অনুকরণে আবকারী বিভাগ, ষ্ট্যাম্প সৃষ্টি, দলিল ও রেজেষ্টারির নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত আইন সংশোধন এবং তমাদি আইন প্রণয়ন করেন। ত্রিপুরার দক্ষিণাংশকে উত্তর বিভাগের ন্যায় উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে উদয়পুর বিভাগ সৃষ্টি করিয়া বাবু উদয়চন্দ্র সেনকে তাহার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উদয়পুর বর্ষাকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এজন্য সোণামুড়া নামক স্থানে সদর ষ্টেশন স্থাপন করা হইল।

"বাবু নীলমণি দাস সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া আয় বৃদ্ধি ও ঋণ পরিশোধের পন্থা পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

এই সময় নীলমণি বাবুর যত্নে ত্রিপুরা রাজ্যে উকিলদিগের পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।"*

* কৈলাস সিংহ প্রণীত রাজমালা।

নীলমণি দাসের কার্য্যকালের পর খ্যাতনামা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহকারী মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। তখন দীনবন্ধু ঠাকুর মন্ত্রী ছিলেন। তৎকালে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞ রাধারমণ ঘোষ কুমারগণের শিক্ষকরূপে কার্য্যে প্রবেশ করেন, পরে অসামান্য প্রতিভা বলে মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে উন্নীত হন। এই সময়ে মহারাজ, সমরেন্দ্রচন্দ্রকে বড়ঠাকুর পদ প্রদান করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর মন্ত্রী নিযুক্ত হন, তৎপূর্ব্বে ধনঞ্জয় ঠাকুর ও রায় মোহিনীমোহন বর্দ্ধন বাহাদুর মন্ত্রী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহারা প্রত্যেকেই স্বনামধন্য পুরুষ এবং স্ব স্ব শক্তি অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজত্বকালে উমাকান্ত বাবুর উদ্যোগে ও যুবরাজ বাহাদুরের উৎসাহে স্থানীয় ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় হাইস্কুলে পরিণত হয়। রাধাকিশোরমাণিক্যের শাসনকালে উত্তম সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ বিদ্যালয়টিকে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং উমাকান্ত বাবুর নামে ইহার 'উমাকান্ত একাডেমী' নামকরণ হয়। এই সৌধ সহরের সৌন্দর্য্যস্থল হইয়া মন্ত্রীবরের বিদ্যোৎসাহিতার ও মহারাজের ঔদার্য্যের কীর্ত্তি যুগপৎ ঘোষণা করিতেছে।

(৮)

প্রতিভাবান্ বীরচন্দ্র

বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকাল তাঁহার গুণ গরিমায় উদ্ভাসিত হইয়া আছে। তিনি একাধারে কবি, গায়ক, সুনিপুণ বাদক ও চিত্রকর ছিলেন। সঙ্গীত প্রতিভায় ভারতবর্ষে তৎকালে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হয় না। আজ পর্য্যন্ত সঙ্গীতরসজ্ঞমহলে বীরচন্দ্র অম্লানজ্যোতিতে বিরাজ করিতেছেন। সুদূর কাশ্মীরে যখন গায়ক চূড়ামণি বিষ্ণুপুর নিবাসী যদুভট্ট রাজভবনে গান গাহিয়া চমক লাগাইতেছিলেন তখন কাশ্মীররাজ যদুভট্টকে বলেন, "আপনার দেশে একজন বাঙ্গালী রাজা সঙ্গীতে অসামান্য খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, আপনি কি তাঁহাকে স্বরচিত সঙ্গীত শুনান নাই?" গায়কপ্রবর যদুভট্ট লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তিনি তৎপর কলিকাতা নিবাসী রাজা দিগম্বর মিত্রের পরিচয়পত্র লইয়া বীরচন্দ্রের দরবারে উপস্থিত হইলে মহারাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

"এবার বিধাতা ত্রিপুর দরবারে মণিকাঞ্চন যোগ করিয়া দিলেন। সে মণিকাঞ্চন যোগে তৎকালে বীরচন্দ্রের দরবারে যে সঙ্গীত উৎসব দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা স্মরণে আসিলে

মরমে আজিও ব্যথা পাই। এখন পর্য্যন্ত কলিকাতা, কাশী প্রভৃতি স্থানে ভট্ট মহাশয়ের স্বরচিত সঙ্গীত এবং তাহাতে ত্রিপুরার বীরচন্দ্র নাম সংযুক্ত থাকা শুনা যায়।

"বীরচন্দ্রের দরবারে শ্রীযুক্ত মদনমোহন মিত্র ছিলেন রাজ-কবি। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন প্রসিদ্ধ তানসেনের বংশধর বীণ-বাদ্যকর কাশীমালী খাঁ। তিনি লক্ষ্ণৌ নিবাসী ছিলেন। কাশ্মীর হইতে আসিয়া জুটিলেন কুলন্দর বক্স নাট্যাচার্য্য। ইনি সঙ্গীতের হাবভাব দেখাইয়া সুন্দর নাচিতে পারিতেন, তাঁহার উপাধি ছিল কথক। গোয়ালিয়র রাজ্য হইতে আসিলেন প্রসিদ্ধ হায়দর খাঁ, ইনি ছিলেন সুরশিঙ্গা এবং এসরাজ বাদ্যকর। কলিকাতা নিবাসী পঞ্চানন্দ মিত্র সঙ্গীতশাস্ত্ররসে ডুবিয়া যখন সর্ব্বস্বহারা হইয়াছিলেন, তখন তিনি বীরচন্দ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সঙ্গীত বিদ্যা-বিশারদ বীরচন্দ্রের দরবারে তিনি পাখোয়াজ ঢোল উত্তম বাজাইতে পারিতেন এবং তাঁহার চেহারাখানা ছিল শিবতুল্য। পঞ্চানন্দ মিত্র আর একজন ভদ্র সন্তানকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয় স্যর রমেশ মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশব মিত্র। তিনি শিক্ষিত এবং সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন।

"মহারাজ বীরচন্দ্র ছিলেন বাংলার বিক্রমাদিত্য। তিনি একাধারে বৈষ্ণবকাব্যরসিক কবি এবং সঙ্গীত ও ললিত-কলাবিদ্ ছিলেন। প্রিয়তমা প্রধানা মহিষীর অকাল মৃত্যুতে

(৭)

রাজ্যশাসনে বীরচন্দ্র

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে (১২৭২ ত্রিপুরাব্দে) মহারাজ ঈশানচন্দ্রের লোকান্তর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন লাভের জন্য এক অভূতপূর্ব্ব কলহের সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বকালে মুক্ত কৃপাণের সম্মুখে যে বিবাদের মীমাংসা হইয়া যাইত বর্ত্তমানে আইনের কবলে পড়িয়া উহা দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া একেবারে বিলাত যাইয়া তবে নিষ্পত্তি লাভ করিল।

ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের রোবকারীর বলে বীরচন্দ্র রাজক্ষমতা লাভ করেন এবং স্বীয় পুত্রদ্বয় ব্রজেন্দ্র ও নবদ্বীপচন্দ্র যথাক্রমে যুবরাজ ও বড়ঠাকুর নিযুক্ত হন। ঐ রোবকারী কোর্টে দাখিল করা হয়। তারিখ দৃষ্টে বুঝা যায় উহা মহারাজের মৃত্যুর পূর্ব্বদিন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বীরচন্দ্রের বিবদমান ভ্রাতৃদ্বয় চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণ 'এই রোবকারী অসত্য' বলিয়া আদালতে দাবিদাররূপে আবেদন উপস্থিত করেন। ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেট চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট এ সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন। কমিশনার সাহেব গভর্ণমেণ্টকে বীরচন্দ্রের অনুকূলে মন্তব্য দিয়া লিখিলেন, 'রোবকারী মতে বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা চলিতে থাকুক, যাহারা ঐ রোবকারী মানেন না তাঁহারা বরং আদালত যোগে স্ব-স্ব দাবী প্রমাণ

করুক।' লেফটেনেণ্ট গভর্ণর উক্ত মন্তব্য অনুমোদন পূর্ব্বক বীরচন্দ্রকে *defacto* রাজা রূপে স্বীকার করেন এবং অন্য দাবিদারগণকে বিচারালয়ে নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া লইতে পরামর্শ দেন।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজকার্য্য অবাধে চলিতে লাগিল। প্রভু বিপিনবিহারীর শাসন ক্ষমতা তখনও অব্যাহত ছিল, তাঁহার কঠোর শাসনে রাজার আশ্রিত ব্যক্তিরাও রেহাই পাইত না। তাই তৎপ্রতি রুষ্ট হইলেও মুখ ফুটিয়া কেহই কিছু বলিতে পারিত না। ঈশানচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানে তাহারা মাথা তুলিতে লাগিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বীরচন্দ্র এইসব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে গুরুর কড়া শাসনে ঠাকুর লোকগণের বৃত্তি হ্রাস ও ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। বিচার সম্পর্কে সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন এইবার সুযোগ মিলিয়াছে। তখন কৌশলে বীরচন্দ্রকে তাঁহারা বুঝাইয়া দিলেন "হয় আমাদিগকে বিদায় দিন, নচেৎ গুরুকে অবসর করুন।"

বীরচন্দ্র বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিলেন। তাঁহার ভয় হইল, ইহাদের বিরক্তিতে শত্রু-পক্ষের শক্তি-বৃদ্ধি হইবে। যদি ইহাদিগকে খুসী করিবার জন্য প্রভুকে কর্ম্মচ্যুত করেন তবে প্রভু চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে পারেন। এইভাবে বীরচন্দ্র দেখিলেন প্রভুকে অবরুদ্ধ করা ছাড়া আর উপায় নাই। অদৃষ্টের চক্র পরিবর্ত্তনে কাহার কোন্ অবস্থা হয় কিছুই বলা যায় না। যে বিপিনবিহারীর প্রতাপে সকলে কাঁপিত আজ

তিনি সকল দৃষ্টির অগোচরে অবরুদ্ধ। ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দিক দিয়া প্রভু বিপিনবিহারীর সহিত Cardinal Wolsey-র অনেকটা ঐক্য দৃষ্ট হয়। অবরুদ্ধ অবস্থায়ই প্রভুর মৃত্যু ঘটে।

প্রভু বিপিনবিহারীর হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা পুনরায় ব্রজমোহন ঠাকুরের স্কন্ধে অর্পিত হইল। ইহাতে ঠাকুরগণ অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই পূর্ব্ববৎ স্ব-স্ব প্রাধান্য খ্যাপনে তৎপর হইলেন। বীরচন্দ্র এই পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিলেন কিন্তু বিচারালয়ের আইনের যুদ্ধে, তখন ঘন ঘটা হইয়াছিল তাই চুপ করিয়া সহিয়া গেলেন। ঠাকুরগণের স্ব-স্ব প্রধানভাব কুমিল্লা ম্যাজিষ্ট্রেটেরও চক্ষু এড়ায় নাই, তাই তিনি চট্টগ্রামের কমিশনারের নিকট এক মন্তব্য প্রেরণ করেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছিল বীরচন্দ্র, ঠাকুরগণের প্রাধান্যে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, গুরু বিপিনবিহারীর শাসনে রাজ্যে টুঁ শব্দ ছিল না। ইহাতে বিপিনবিহারীর কার্য্যদক্ষতার প্রশংসাই পাওয়া যাইতেছে।

কুমিল্লার আদালতে বীরচন্দ্রের পক্ষে প্রায় অধিকাংশ ঠাকুর রোবকারী সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য দেন। ঈশানচন্দ্রের রাণী মহোদয়ারা ঐ রোবকারী সমর্থন করিয়া কোর্টে বীরচন্দ্রের অনুকূলে আবেদন করেন। কতিপয় ঠাকুর, নীলকৃষ্ণ ও চক্রধ্বজের পক্ষে উহা অসত্য এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দেন। কিন্তু স্থানীয় বিচারে বীরচন্দ্রের হার হইল। তখন তিনি হাইকোর্টে আপীল

করিলেন। সেখানে বীরচন্দ্রেরই জয় হইল। অতঃপর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই মামলা প্রিভিকৌন্সিলেও গিয়াছিল কিন্তু হাইকোর্টের ডিক্রিই অক্ষুণ্ণ রহিল।

তখন বীরচন্দ্র অভিষেক ক্রিয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাকে খিলাত ও সনন্দ প্রদান করা হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে (১২৭৯ ত্রিপুরাব্দে, ২৭শে ফাল্গুন) মহা সমারোহে বীরচন্দ্রের অভিষেক সম্পন্ন হয়। তৎপরবর্ত্তী বর্ষে (১২৮০ ত্রিপুরাব্দে) ১৬ই ভাদ্র বীরচন্দ্রমাণিক্য স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার রাধাকিশোরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। মহারাজ রামমাণিক্য হইতে বড়ঠাকুর পদ সৃষ্ট হয়, সেই হইতে বড়ঠাকুর পদের জন্য নানা বিড়ম্বনার সূত্রপাত ঘটিয়াছে, রাজার উত্তরাধিকার নির্ব্বাচনে ইহা দ্বারা জটিলতা এত বাড়িবে জানিলে রামমাণিক্য হয়ত ইহার প্রবর্ত্তন করিতেন না। রাধাকিশোর যৌবরাজ্য লাভ করায় নবদ্বীপচন্দ্র মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া তদীয় মাতা সহ কুমিল্লা চলিয়া আসেন, ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে ঈশানচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ তনয় ব্রজেন্দ্রচন্দ্র পরলোক গমন করেন। অতঃপর নবদ্বীপচন্দ্রের জন্য মাসিক ৫২৫৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের শাসন কালে ত্রিপুরা রাজ্য প্রাচীন যুগের শাসন পদ্ধতির ছাপমুক্ত হইয়া বর্ত্তমান ব্রিটিশ তন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। তাঁহারই সময় সতীদাহ নিবারিত হয়।

বীরচন্দ্রের হৃদয় অসহনীয় প্রিয়-বিরহে শোকাকুল হইয়া পড়ে। তখন তিনি বিরহীর মর্ম্মবেদনা কবিতার লহরে লহরে গাঁথিতে ছিলেন।

"দেবি! তুমি ত স্বরগপুরে, জানিনাকো কতদূরে
কোন্ অন্তরালদেশে করিতেছ বাস।
পশিতে কি পারে তথা মানবের আশালতা
বিরহের অশ্রুজল প্রাণ ভরা ভালবাসা?
হেথা আমি আছি পড়ে হৃদয়ের ভাঙ্গা ঘরে
গণিতেছি সারাদিন জীবনের বেলা
যেন রে উপলদেশে সাথী হীন একা বসে
জানিনা ফুরাবে কবে এ মরতের খেলা।"

"এমনি সময় কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া "ভগ্নহৃদয়" নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবি বীরচন্দ্রের তখনকার মানসিক ভাবের সহিত "ভগ্নহৃদয়ের" কবিতাগুলি সায় দিয়াছিল। গুণগ্রাহী বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের তখনকার এই কাঁচা লেখার মধ্যেও তাঁহার অদ্যকার বিশ্ববিমোহন কাব্যপ্রতিভার প্রথম সূচনা দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী রাধারমণ ঘোষকে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট "ভগ্নহৃদয়" কাব্যগ্রন্থ মহারাজকে প্রীত করিয়াছে, তজ্জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে প্রেরণ করেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার

জীবন স্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

'মনে আছে এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভাল লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এইটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।'*

"মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের আকৃতি নাতিদীর্ঘ নাতি খর্ব্ব, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মুখশ্রী অনেকটা বাঙ্গালীর ন্যায়, চক্ষু সুন্দর, নাসিকা উন্নত।

"মহারাজ বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তিনি একজন সুকবি। তৎপ্রণীত দুইখানা কবিতাপুস্তক আমরা দর্শন করিয়াছি। উভয়গ্রন্থই গীতিকাব্য। তাঁহার গীতির অনেকগুলি 'বর্জ্জি' বুলিতে রচিত, সেগুলি বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের অনুকরণে লিখিত; অনুকরণ হইলেও তাহাদের ভাব সরল, মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার সমস্ত গীতি কবিতাই প্রেমের কাকলিপূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক ভাবের ছায়াপাতে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে এই সকল সুন্দর কবিতাকুসুমের সৌরভ আগরতলার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কদাচিৎ কাহাকেও আকুলিত করিয়া থাকে। সেগুলি প্রকাশ করিতে মহারাজ অনিচ্ছুক। কিন্তু প্রকাশিত

* কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর প্রণীত—দেশীয় রাজ্য।

হইলে তিনি বঙ্গীয় কবি সমাজে উচ্চ আসন পাইতেন সন্দেহ নাই।

"মহারাজ উর্দ্দূ ভাষায় মাতৃভাষার ন্যায় আলাপ করিতে পারেন এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি পানাদি দোষবর্জ্জিত, বুদ্ধিমান ও অত্যন্ত বাকপটু। তাঁহার বাক্যন্যাসশক্তি এইরূপ প্রবল যে তৎপ্রতি ভীষণ বিদ্বেষভাবাপন্ন কোন ব্যক্তি ক্ষণকাল তাঁহার সহিত আলাপ করিলে, সেই ভাব পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন না।"*

শাস্ত্র ও সৎসাহিত্য প্রচারে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া বাঙ্গালা দেশের বহু উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের একখানি রাজসিক সংস্করণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকে রাজধানীতে আনাইয়া ছিলেন কিন্তু গঙ্গাস্নান করিতে না পারিয়া এখানে থাকিতে অসম্মত হওয়ায় বিদ্যারত্ন দ্বারা বহরমপুরে থাকিয়াই উক্ত পুস্তক সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন এবং তজ্জন্য প্রেস ক্রয় করা হইয়াছিল এরূপ শুনিয়াছি। ঐ পুস্তক মুদ্রণে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ ব্যয় হইয়া থাকিবে। ভাগবতের এইরূপ বহু টীকাযুক্ত শোভন সংস্করণ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ প্রেসে বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস মুদ্রিত হয়। ব্রহ্ম সূত্রের গোবিন্দভাষ্য সম্বলিত একখানি সংস্করণ প্রচারের সাহায্য

* কৈলাস সিংহ প্রণীত রাজমালা।

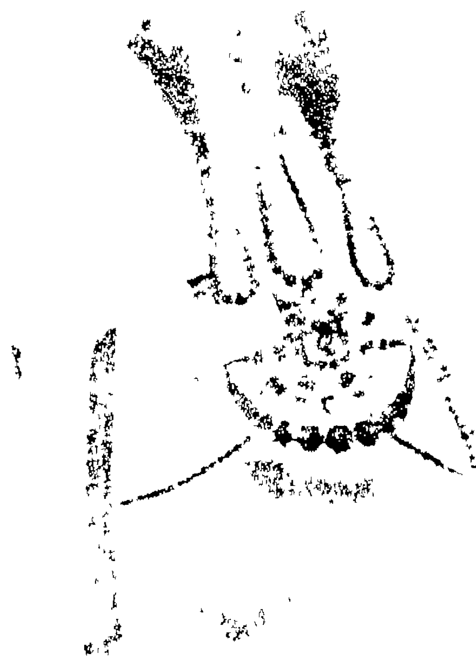
দ্বারা তিনি বঙ্গদেশে দার্শনিক সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' মহারাজের সাহায্যেই প্রকাশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের একটি অভাব পূর্ণ করিতে পারিয়াছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে (১৩০৬ ত্রিপুরাব্দে) কলিকাতা মহানগরীতে মহারাজ পরলোকগমন করেন।

(৯)

রাজর্ষি রাধাকিশোর

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে (১৩০৭ ত্রিপুরাব্দে) মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি রাজক্ষমতা প্রাপ্ত হন। আগরতলার বর্ত্তমান রূপ অনেকটা তাঁহারি হাতে গড়া। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ দ্বারা যথার্থ রাজপুরীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে নিঃসন্দেহে বলা যায় ; ইহা বহুকালের অভাব দূর করিয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, উমাকান্ত একাডেমী প্রভৃতি সুশোভন ইমারতে রাজধানী শোভিত করিয়াছেন। মাত্র বার বৎসর রাজত্বের পরমায়ু লইয়া তিনি যে বিচিত্র গঠন কার্য্যের পরিচয় নিয়াছেন, তাহা দেখিলে স্বতঃই মনে হয় তাঁহার অকাল মৃত্যু রাজত্বের কত বড় দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। জাতির বহু পুণ্য ফলে এরূপ রাজার আবির্ভাব ঘটে। একটি দেশীয় রাজ্যের বাতায়নে বসিয়া তাঁহার মন

ালা





মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর

২৩৩ পৃ৽

ত্রিপুরার শৈলমালার বেষ্টনে আবদ্ধ থাকিতে পারিত এবং বহির্জগৎ তাঁহাকে জানিতে পারিত না কিন্তু স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে স্বদেশের কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে সমগ্র বঙ্গের কল্যাণ চিন্তাও একসূত্রে গাঁথিতে পারিয়াছিলেন দেখিয়া চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না !

তাঁহার দরবারে একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর। তদীয় 'দেশীয় রাজ্য' পুস্তকে রাধাকিশোরমাণিক্য সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে অংশতঃ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাধাকিশোরমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমারও জীবনের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন হইল। বৃদ্ধ মহারাজের বাৎসল্য রসের চালে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়াছিল। হঠাৎ আমাকে শুয়া পোকা হইতে পূর্ণ প্রজাপতির রূপ ধারণ করিতে হইল। নূতন নূতন জটিল সমস্যা ও কার্য্যভার আমার স্কন্ধদেশে চাপিয়া বসিল!

"রবিবাবুর সঙ্গে রাধাকিশোরমাণিক্যের যুবরাজ-জীবনে কলিকাতায় পিতার দরবারে একবার মাত্র ক্ষণকালের জন্য দেখা হইয়াছিল। বিশিষ্ট ইংরেজ কর্ম্মচারীর হঠাৎ আবির্ভাবে আলাপ বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সেই মুহূর্ত্তকাল দর্শনেই একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, গুণীব্যক্তি গুণীকে আকর্ষণ করে।

"রাধাকিশোর যখন ত্রিপুরার 'মাণিক' হইলেন, তখন বহু

দিনের সঞ্চিত অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিতে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। যুবরাজী আমলে নানা কারণ বশতঃ নিজ রাজধানীর বাহিরের কাহাকেও ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনিবার সুযোগ পান নাই। বন্ধুবল বলিতে তাঁহার কিছুই ছিলনা। তিনি বলিতেন, অর্থবল কিম্বা যে কোন প্রকারের বলই বলনা, বন্ধুবল সকলের অপেক্ষা মূল্যবান্। তিনি প্রথমে রবিবাবুকে কাছে টানিয়া লইলেন। রবিবাবু সেইবার প্রথম আগরতলা রাজধানীতে আসিলেন, তখন বসন্তকাল, রাজধানীর উত্তর ভাগে পাহাড়ের উপর কুঞ্জবনে বসন্তোৎসবে কবি-সম্মেলনের ঘটা, কবি রবীন্দ্রনাথের যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিল। মহারাজ রাধাকিশোরের চরিত্রের মহানুভবতা দেখিয়া কবি পরমানন্দ লাভ করিলেন।

"ক্রমে ক্রমে রবিবাবুর যোগে স্যার আশুতোষ চৌধুরী, স্যার জগদীশ বসু, মহারাজ স্যার যতীন্দ্রনাথ, নাটোরের মহারাজ, জগদীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গের খ্যাতনামা মহাপুরুষেরা রাধাকিশোরের বন্ধুতার জালে আসিয়া ধরা দিলেন। একে অন্যের সহযোগে দেখিতে দেখিতে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন (Lord Sinha) স্যার রাজেন্দ্রলাল, স্যার টি. এন. পালিত, স্যার রাস বিহারী ঘোষ, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহারাজের গুণাকৃষ্ট হইয়া বন্ধুবল বৃদ্ধি করিলেন। এ বন্ধুবলের দ্বারা যেমন রাজনৈতিক অনেক সমস্যার সমাধান করিলেন, অপরদিকে ত্রিপুরার রাজা বঙ্গ-হৃদয় জয় করিলেন।

"সে সময়ে কলিকাতা সঙ্গীত সমাজে মহারাজের অভ্যর্থনার যে আয়োজন হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তাঁহাকে দেখাইবার নিমিত্ত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহারই রচিত "বিসর্জ্জন" নাটকে "রঘুপতির" ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর নাটোরের মহারাজ, রবীন্দ্রনাথ-রচিত গীত

'রাজ অধিরাজ তব ভালে জয় মালা
ত্রিপুর-পুরলক্ষ্মী বহে তব বরণ ডালা।
ক্ষীণ-জন-ভয়-তারণ অভয় তব বাণী
দীনজন দুঃখহরণ নিপুণ তব পাণি।
অরুণ তব মুখচন্দ্র করুণ রস ঢালা।
গুণী রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে
গুণ-অরুণ-কিরণে তব সব ভুবন আলা।'

গাহিয়া মালা-চন্দনে মহারাজ রাধাকিশোরের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি এবং বিসর্জ্জনে ত্রিপুরার নাম অমর এবং জগদ্বিখ্যাত হইল, একি ত্রিপুরার কম গৌরবের কথা!

"ত্রৈপুরী ১৩১৫ সালে ১৭ই আষাঢ় আগরতলার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রশস্ত গৃহে সাহিত্য-সভা স্থাপনোপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিতে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। সে বিরাট সভার মঞ্চোপরি একটি আসন মহারাজ রাধাকিশোরের

জন্য, অপরটি সভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সভারম্ভে রবিবাবুকে সভাপতি পদে বরণ করিয়া মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য সর্ব্বসাধারণের সমসূত্রে আসন গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ সসঙ্কোচে মহারাজকে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতে অনুরোধ করিলে, মহারাজ বলেন—'সাহিত্য ক্ষেত্রে আপনার স্থান সর্ব্বোপরি, আপনি সাহিত্যের রাজা, আমি আপনার ভক্ত বন্ধুমাত্র, এ উচ্চ মঞ্চ আমার স্থান নহে।' ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের গভীর আকর্ষণের কারণ তিনি সেদিনকার অভিভাষণে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়া ছিলেন। তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

'এই ত্রিপুর রাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে সংস্কৃত বাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি "কিল বিদুর্বীরতাং সারমেকম্" বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেণ্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীর্য্যই সার। এই বীর্য্য দেশ কাল পাত্র ভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয়। কেহ বা শাস্ত্রে বীর, কেহ বা ত্যাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্ম্মে বীর, কেহ বা কর্ম্মে বীর।'

"একবার কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, রবিবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে স্বীয় গবেষণার ফলাফল দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তখনও রাধাকিশোরের সহিত জগদীশবাবুর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ আমাকে জানাইয়াছিলেন 'আচার্য্য জগদীশ

চন্দ্র বসুর নূতন তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সি কলেজে অদ্য রাত্রে Experiment হইবে। যদি তুমি পার উপস্থিত হইও।"

"এই টোকাখানা লইয়া আমি মহারাজ সকাশে উপস্থিত হইলাম এবং বিদায় চাহিলাম। তিনি অভিমানভরে বলিলেন 'তুমি যাইবে আর আমি যাইতে পারিব না? আমিও অদ্য রাত্রে যাইব।' মহারাজ বিনা নিমন্ত্রণে উক্ত কলেজের বিজ্ঞানাগারে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। রবিবাবু মহারাজকে দেখিয়া পুলকিত হইলেন এবং আচার্য্য জগদীশবাবুর সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। মহারাজ বলিলেন বাঙ্গালাতে আপনার আবিষ্কার সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা আমি পড়িয়াছি এবং বিজ্ঞান আলোচনায় আমি বিশেষ আনন্দ পাই, আমিও আপনার একজন ছাত্র।"

"তখন সমবেত জনমণ্ডলীর সঙ্গে মহারাজ বসিয়া গেলেন এবং Experiment দেখিতে লাগিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল লাগিয়াছিল। Experiment শেষ হইয়া গেলে ডাক্তার বসু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি ইংরাজীতে বলিয়াছি, আপনি কিছু বুঝিয়াছেন কি? তখন মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'আমি ইংরাজী জানিনা। তবে যদি আপনি আমাকে আপনার যন্ত্র দেখিতে দেন তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারিব—বুঝিতে পারিয়াছি কিনা।' জগদীশ বাবুর যন্ত্রে হস্তক্ষেপ করা তিনি সাবধানতার সহিত নিষেধ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি ঐ যন্ত্রের নিকট মহারাজকে নিয়া গেলেন

এবং পরীক্ষার নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। তখন মহারাজ একখানি পুঁথি লইয়া যন্ত্রের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন এবং ডাক্তার বসুকে অনুরোধ করিলেন, 'আপনি এক্ষণে shock দিয়া দেখুন কিন্তু respond করিতেছে না।' তৎপর মহারাজ বইখানি উল্টাইয়া দিলেন এবং shock দিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ঠিক যন্ত্রে respond করিয়া গেল। জগদীশ বাবু পুলকিত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম। Lord Elgin-কে আমি বুঝাইতে পারি নাই, আমার এম. এ. ক্লাসের ছাত্রবর্গও বুঝিতে পারে না। আপনি আমাকে অবাক্ করিয়া দিলেন।

"তারপর একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশ বাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট্ কার্য্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। রবিবাবু ইহাতে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন। বিশেষতঃ বুঝিলেন, জগদীশ বাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নূতন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০,০০০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। ১০,০০০ হাজার টাকা রবিবাবু নিজে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন, বাকি টাকার জন্য ত্রিপুর-রাজ-দরবারে তিনি স্বয়ং ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন।

"মহারাজ রাধাকিশোর তখন কলিকাতায় উপস্থিত

ছিলেন। কবিকে ভিক্ষুক বেশে আসিতে দেখিয়া বলিলেন 'এ বেশ আপনাকে সাজেনা, আপনার বাঁশী বাজানই কায, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন কবিব। প্রজাবৃন্দের প্রদত্ত অর্থই আমাদের রাজভোগ যোগায়। আমাদের অপেক্ষা জগতে কে আর বড় ভিক্ষুক আছে? এ ভিক্ষার ঝুলি আমাকেই শোভা পায়, আমাকে ইহা পূর্ণ করিতে হইবে।' তখন যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের বিবাহ উপস্থিত। মহারাজ বলিলেন—'বর্ত্তমানে আমার ভাবী বধমাতার দু এক পদ অলঙ্কার না-ই বা হইল, তৎপরিবর্ত্তে জগদীশ বাবু সাগর পার হইতে যে অলঙ্কারে ভারত মাতাকে ভূষিত করিবেন, তাহার তুলনা কোথায়?'

'জগদীশ বাবুর বিজ্ঞানাগারের ব্যবস্থা হইল। তৎপর জগদীশবাবু বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীয় গবেষণা প্রচারের বাসনায় বিলাত যাত্রা করেন। তথায় নানা কারণে তাঁহার আবিষ্কারেব প্রতিষ্ঠা স্থাপনে বিলম্ব হইতে লাগিল। অথচ ছুটি ফুরাইয়া আসায় ভগ্নমনোরথ হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইত এমনি অবস্থায় রাধাকিশোরের ঐকান্তিক উৎসাহ বাণী এবং ২০,০০০ হাজার টাকার অর্থ সাহায্য লাভে, বিলাতের বৈজ্ঞানিক সমাজের জয়মাল্য লইয়া দেশে ফিরিলেন। সে কাহিনী স্বয়ং আচার্য্য জগদীশ বাবু বিজ্ঞান মন্দিরের অভিভাষণে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। নীরব দাতা রাধাকিশোরের বিশেষ অনুরোধে একথা আমরা ছাড়া কেহই জানিত না—অদ্য

তিনি অমর লোকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার এ সুযোগ জগদীশ বাবু ত্যাগ করিতে পারিলেন না—

"It was the special request of the Late Maharaja that he wished to remain unknown in this connection. He has now passed away and it is permissible to speak now of one who stood by him at a time when such friendship was most needed." The Englishman—12th March, 1918.

"রাধাকিশোরমাণিক্যের বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি সাহিত্যিকদিগের সঙ্গ পাইতে ইচ্ছা করিতেন এবং প্রয়োজন বোধে তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। কিন্তু এসব কথা যাহাতে গোপন থাকে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিতেন। সঞ্জীবনী পাঠে কবি হেমচন্দ্র যখন অন্ধ এবং অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন জানিতে পারিলেন তখন নিজ তহবিল হইতে মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি তাঁহার সাহিত্য সাধনার প্রতিদান স্বরূপ দিবার প্রস্তাব রবিবাবুর মারফত কবিবরের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং এ সংবাদ গোপন রাখিবার ভার গ্রহণ করিতে রবিবাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। এ সম্বন্ধে রবিবাবু আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

'হেমবাবুর সাহায্যার্থ মহারাজ যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতে এখানে চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়াছে। একথা গোপন রাখা আমার সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে হেমবাবুও

অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা বোধ করিতেছেন। মাঝ হইতে মহারাজের কল্যাণে যশের কিয়দংশ আমার কপালেও পড়িয়াছে।'

"তারপর হেমবাবু সম্বন্ধে এরূপ বন্দোবস্ত হইবার দরুণ তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়াছিলেন এবং কতকটা আরামে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যখন আমি সে সংবাদ মহারাজের নিকট পেশ করি তখন মহারাজ কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়াছিলেন—

আমি বাঙ্গালার ক্ষুদ্র রাজা হইলেও, আমি বর্ত্তমানে তাঁহাকে যদি কবি মাইকেল মধুসূদনের মত দাতব্য চিকিৎসালয়ে পড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয়, তবে দেশের পরম দুর্ভাগ্য। তোমরা আমার পারিষদেরা নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে, আর আমাকে যে কত দূর যাইতে হইবে তাহা জানিনা। তোমাদের চক্ষু কর্ণ যেন এইরূপ ব্যাপারে বন্ধ না থাকে এবং মুখ যেন সদা সর্ব্বদা খোলা থাকে।"*

রাজাদিগের অনুচরেরা রাজার চক্ষু স্বরূপ হওয়ায় তাঁহারা 'চারচক্ষু' আখ্যা লাভ করেন। কর্ণেল মহিমচন্দ্র যে মহারাজ রাধাকিশোরের চক্ষুষ্মান্ অনুচর ছিলেন ইহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল যে তাঁহার দেখিবার মত চক্ষু ছিল তাহা নহে লিখিবার মত মনও ছিল। তাই মহারাজের সহিত বিশ্ববিখ্যাত পুরুষদ্বয়ের পরিচয় প্রসঙ্গ এরূপ নিখুঁত ভাবে পরবর্ত্তী যুগের জন্য রাখিয়া যাইতে

* কর্ণেল মহিম ঠাকুর প্রণীত—'দেশীয় রাজ্য'।

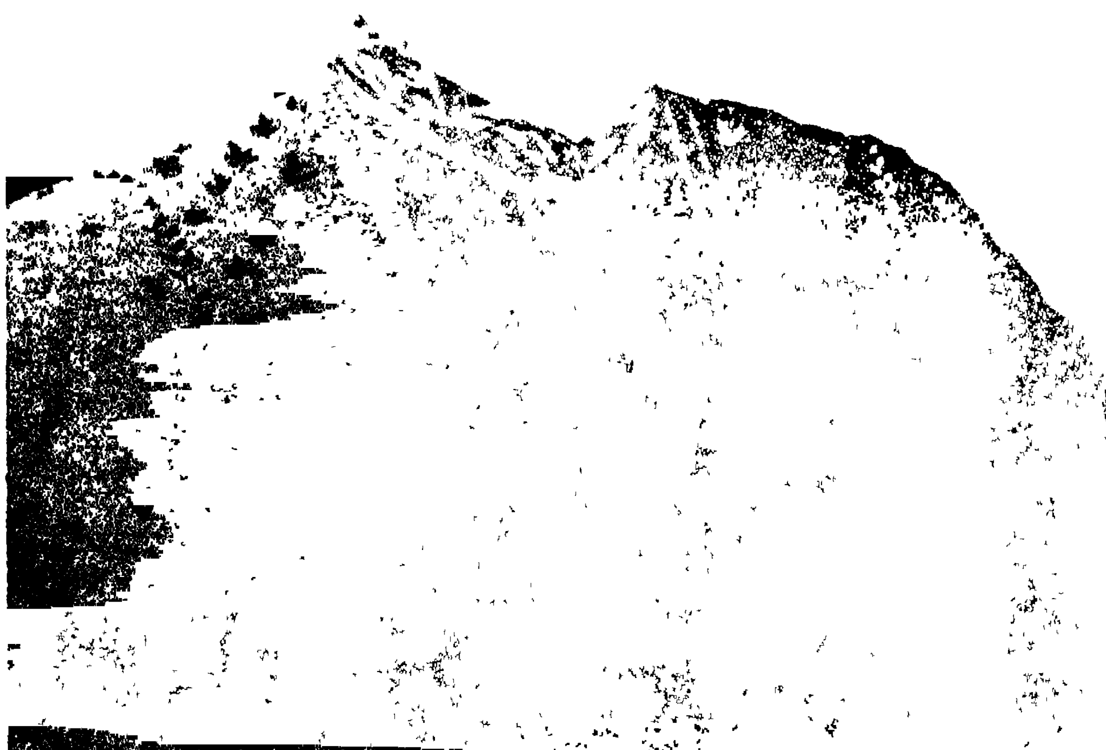
পারিয়াছেন। রাজসভা নবরত্নে ভূষিত হইলেই বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয় কিন্তু নবরত্ন না মিলিলেও রাজ-সন্নিধিতে এরূপ একটি রত্নের অস্তিত্ব থাকিলেও পরবর্ত্তী যুগের ঐতিহাসিকের রচনাকার্য্য অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করে।

১৯০৯ সালে পুণ্যস্থান সারনাথ যাত্রাকালে মোটর দুর্ঘটনায় তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

(১০)

বীরেন্দ্রকিশোর

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর সিংহাসন আরোহণ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও নানা সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। পিতার অনারব্ধ কার্য্য সমাপ্তির জন্য তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি ছিলেন একজন অতি উচ্চশ্রেণীর চিত্রকর, তাঁহার চিত্রপ্রতিভা যে কেবল রং তুলিতেই নিবদ্ধ ছিল এমন নহে পরন্তু উহা ইট পাথরেও শিল্পনৈপুণ্য ফুটাইয়াছিল। তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সকল ইমারৎ গড়া হইয়াছিল সেগুলির প্রত্যেকটি আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হইয়া আছে। দুর্গামন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, প্রশস্ত সরোবরের গায়ে দুইটি শ্বেত পদ্মের আকারে ফুটিয়া রহিয়াছে। রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন 'লালমহল' আর একটি স্থপতি বিদ্যার উত্তম নিদর্শন।

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর

২৫৪ পৃঃ

বীরেন্দ্রকিশোরের চিত্র প্রতিভার সর্ব্বোত্তম দান হইতেছে 'কুঞ্জবন' নির্ম্মাণ। যাঁহারা আকবরের 'ফতেপুর শিক্রী' দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন স্থান নির্ব্বাচনের তুলনায় 'ফতেপুর শিক্রী' হইতে 'কুঞ্জবন' কোনও অংশে ন্যূন নহে। ফতেপুর শিক্রীর উচ্চতা অধিক নহে, কুঞ্জবনও তদনুরূপ, শিক্রীর চতুষ্পার্শ্বে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে নূতনত্ব কিছুই নাই, শিক্রী নিজের সৌন্দর্য্যেই নিজে উদ্ভাসিত কিন্তু কুঞ্জবন তাহা নহে। কুঞ্জবনের মধ্যে এমন একটি লুক্কায়িত মহিমা আছে যাহা শিল্পী বীরেন্দ্রকিশোরের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি সেই মহিমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কুঞ্জবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই মহিমাটি কি ?

আগরতলা সম্বন্ধে বাহিরের লোকের ধারণা আছে যে ইহা পার্ব্বত্যস্থান কিন্তু সহরে প্রবেশ অবধি ভিতরে আসিয়াও পর্ব্বতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। মনে হয় কি ভুল ধারণা ! এখানে ত মোটেই পাহাড় নাই, একেবারে গ্রামদেশেরই মত বেশ সমতল। কুঞ্জবনের পথে অগ্রসর হইতে হইতেও এ ভুল ভাঙ্গে না। যখন পথিক কুঞ্জবন প্রাসাদ শিখরে উঠিয়া সহরের দিকে মুখ করিয়া তাকায় তখন অবাক্ হইয়া দেখিতে পায় দক্ষিণের পর্ব্বতমালা উত্তরের শৈলশ্রেণীর সহিত মিশিয়া গিয়া এক হইয়া গিয়াছে এবং কয়েক মূহুর্ত্ত পূর্ব্বেও যে সহরকে সমতল মনে করা গিয়াছিল তাহা যেন কোন্ যাতুমন্ত্রে বনের মধ্যে অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের চূড়া

ও অন্যান্য হর্ম্ম্যের উচ্চভাগগুলি কেবল যেন সহরের সাক্ষীস্বরূপ গভীর অরণ্যের মধ্যে আত্মগোপন করিতে পারিতেছে না। এইটিই কুঞ্জবনের লুক্কায়িত মহিমা, ফতেপুর শিক্রীতে ইহার নাম গন্ধও নাই, প্রকৃতির এইরূপ পটপরিবর্ত্তনে কুঞ্জবনের জোড়া আছে কিনা জানি না!

নিপুণ চিত্রকর বীরেন্দ্রকিশোর সেই লুক্কায়িত মহিমার কুঞ্জবনে একটি অপূর্ব্ব প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। উদয়পুরের জলপ্রাসাদের যেরূপ ঐতিহাসিক খ্যাতি, কুঞ্জবনের শৈলপ্রাসাদেরও সেইরূপ একটি অপূর্ব্ব নৈপুন্য রহিয়াছে যাহা কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। এই প্রাসাদের পরিকল্পনায় শিল্পী একটি চমকপ্রদ কৌশল ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রাসাদটি দেখা মাত্রই মনে হয় ইহা দ্বিতল অথচ আসলে তাহা নহে। সূর্য্যের উদয়াচল অভিমুখী বড় প্রকোষ্ঠটি স্পষ্ট দ্বিতল অথচ ভিতরের কোঠা একতালা। এইরূপ একটি বিস্ময়ের বেষ্টনে যেন এই শোভন হর্ম্ম্য আবৃত হইয়া রহিয়াছে, ছাদ-প্রকোষ্ঠে বিশালমুকুরে দূরের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের চিত্র প্রতিফলিত করিয়া ইহা যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপনে যত্নশীল।

বনপ্রাসাদের অনতিদূরে একটি সুগোল শৈলশিখরে শ্বেত বাঙ্গলো প্রস্তুত হইয়াছিল, শিক্রীর প্রাসাদের নীচে নীচে যেমন আবুল ফজল ও ফৈজীর বাসগৃহ দৃষ্ট হয় বনপ্রাসাদের অনতিদূরে এই মর্ম্মরকল্পভবনেও মহারাজের বিশিষ্ট অতিথি কখনো কখনো বাস করিতেন। সেই শৈলশিখরে উঠিলেই পৃথিবী যে গোল

ইহা এক পলকে চোখে ঠেকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ একবার সেই শৈলভবনে ছিলেন, ইহার উদয়াচল ও অস্তাচল পর্ব্বত-দ্বয়ের মনোরম শোভায় তিনি মুগ্ধ হন। শুনিয়াছি তিনি নাকি শান্তিনিকেতনে তাঁহার পৃথিবীব্যাপী প্রকৃতির লীলা-নিকেতন দর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—পৃথিবীতে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র অনেক দেখিয়াছি কিন্তু ঐ ত্রিপুরার কুঞ্জবনের শৈল শ্বেতভবন আমার স্মৃতি হইতে মলিন হইতে পারিতেছে না।

মহারাজ যখন রাজকার্য্যে ক্লান্ত হইতেন আকবরের শিক্রী-বাসের ন্যায় তিনি কখনো কখনো বন-বাস করিতে এখানে চলিয়া আসিতেন। প্রকৃতির মধুময় নিবিড় বেষ্টনে থাকিয়া সংসারের তাপ ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহার অঙ্কিত ছবিগুলি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ আলো করিয়া রহিয়াছে, যে কোন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীর রচনার পার্শ্বে ইহারা আপন আসন করিয়া লইতে পারে। চিত্র সাধনার সহিত চলিত সঙ্গীতচর্চ্চা—বাদ্যযন্ত্রে তাঁহার অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটিয়াছিল। বীরচন্দ্রের হাত তাঁহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যাইত। তাঁহার মন্দ্রিত বাঁশী রেকর্ডে উঠিয়াছিল শুনিয়াছি কিন্তু ইহার প্রচার নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

এই সকল বিধিদত্ত গুণে ভূষিত হইয়া তিনি যে প্রকৃতির ললাট সৌন্দর্য্য একা পান করিতেন এমন নহে কিন্তু বসন্ত উৎসবচ্ছলে কুঞ্জবনে মহা সমারোহের ঘটা পড়িয়া যাইত। প্রকৃতিপুঞ্জকে মিষ্টিমুখ করাইবার জন্য সন্দেশ রসগোল্লার রসাল

পর্ব্বত সজ্জিত হইত এবং নিজে বসিয়া থাকিয়া রাজার হৃদয় লইয়া এই ভোজন উৎসবের তৃপ্তি আস্বাদন করিতেন।

তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিভাগে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিক্ষা বিস্তারের প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। পূর্ব্বে রাজধানীস্থ উমাকান্ত একা-ডেমীতে দূর প্রান্ত হইতে ছাত্রেরা পাঠের জন্য সমবেত হইত কিন্তু এই সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহাদের ঘরের কোণে শিক্ষার আলয় পাইয়া ইহাদের মধ্যে যে শিক্ষা বিস্তারের প্রবল সাড়া জাগিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

এতকাল যাবৎ ত্রিপুরা রাজ্য বিদেশী ব্যবসায়ীর নিকট একরূপ *terra incognito* ছিল। পি. কে. দাসগুপ্তের মন্ত্রিত্বকালে মহারাজ বহুকালের সে আবরণ ঘুচাইয়া দিয়া বিদেশী ব্যবসায়ীর অর্থ আকর্ষণের পথ করিয়া দিলেন। ডাঃ ভট্টাচার্য্যের পরীক্ষার ফলে ত্রিপুরার মৃত্তিকা চা বাগানের পক্ষে উপযোগী বিবেচিত হওয়ায়, এগার বৎসরের মধ্যে চল্লিশটি বাগানের সৃষ্টি হইয়া প্রায় কোটি টাকার মত অর্থ রাজত্ব মধ্যে টানিয়া আনিল। ইহার দ্বারা রাজস্বের আয় যেমন বাড়িয়াছে অপর দিকে বহু শ্রমিকের অন্ন সংস্থানেরও উপায় হইয়াছে।

To quote from "Tea Cultivation in Tripura" by Mr. Girija Mohan Sanyal, the Managing Director of Harishnagar Tea Co., Ltd.—

"In the meantime an enthusiastic young chemist of Tripura, my friend Dr. A. C. Bhattacharjee, Ph. D.

published his first report on the soils of Tripura State strongly recommending the soils as suitable for tea cultivation, as he found the soils to be as good as that of Surma Valley. The gardens in the Tripura State were then opened one after another. During the brief period of eleven years as many as 40 gardens have been started. Up-to-date well-equipped factories have been erected in some of the gardens and most of the gardens are progressing fairly well."—'Progressive Tripura' by Apurba Chandra Bhattacharjee, Editor, Chunta Prakash. P. 60.

লর্ড কারমাইকেল ও লর্ড রোনাল্ডসে বাঙ্গালার এই গভর্ণরদ্বয় বীরেন্দ্রকিশোরের রাজত্বকালে রাজধানীতে শুভাগমন করেন। লর্ড কারমাইকেলের স্বহস্তে চিহ্নিত হইয়া হাওড়া নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হওয়ায় দক্ষিণের পর্ব্বতমালা রাজধানীর সহিত সংযোজিত হইয়া পড়ে। এই সেতুর "কারমাইকেল ব্রিজ" নামকরণে সেই স্মৃতি অদ্যাপি রক্ষিত হইতেছে। সেই সেতুর সংলগ্ন রাস্তা 'রোনাল্ডসে রোড' রূপে ঘোষিত হইয়া নদীর উত্তর পার হইতে সেতুযোগে দক্ষিণের বন মধ্য দিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই ভাবে বিশালগড় ও প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর বর্ত্তমান রাজধানীর সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং মোটর চলার উপযোগী হইয়াছে।

একটি উল্কাশিখার ন্যায় বীরেন্দ্রকিশোর ত্রিপুরার রাষ্ট্রগগনে ক্ষণিক জ্বলিয়া মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করেন। যৌবনের প্রগল্ভ চাঞ্চল্য যখন প্রৌঢ় বয়সের সীমারেখায়

পৌঁছিয়া স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে সুসম্বৃত হয় সেই বয়সের কোলে পদার্পণ করিতে না করিতেই মহারাজের হৃদয়বীণার তার সমস্ত রাজ্যে এক অশ্রুময় ঝঙ্কার তুলিয়া সহসা থামিয়া গেল। দিনের পর দিন যেমন চলিয়া যায় মহারাজ তেমনি অনায়াসে আজিকার দিনেও হয়ত বার্দ্ধক্যের একটি মাত্র রেখাও মুখের উপর না ফুটাইয়া সেই চির প্রফুল্ল আননে বিরাজ করিতে পারিতেন। কিন্তু কালের নখরাঘাতে ফুটিতে না ফুটিতেই সেই কমল বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া গিয়াছে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজের মৃত্যু হয়।

(১১)

বীরবিক্রমকিশোর

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যুবরাজ বীরবিক্রমকিশোর ১৬ বৎসর বয়সে পিতৃসিংহাসনের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ইহা দরবারযোগে ঘোষিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে মহারাজ শিক্ষা সমাপন না হওয়ায় বিদেশ বাস করিতে থাকেন। এদিকে রাজ্য Council of Administration যোগে পরিচালিত হইতে থাকে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারী মহারাজের অভিষেক কার্য্য মহাসমারোহে শাস্ত্রানুযায়ী সুসম্পন্ন হয়।



মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর
কে, সি, এস, আই।

মহারাজ সদ্‌গুণরাশিতে ভূষিত এবং প্রতিভাবলে বলীয়ান্। তিনি যুগানুযায়ী নূতনের উপাসক, তাই বলিয়া অতীতের বৈরী নহেন, ইতিহাসের মর্য্যাদা বোধে তাঁহার অন্তর উদ্দীপ্ত।

রাধাকিশোরমাণিক্যের ন্যায় তিনি যেমন একদিকে বিরাট স্থপতির স্বপ্নে ভরপূর অপরদিকে সাহিত্যানুরাগে তেমনি বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্ণ হওয়ায় জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তখন মহারাজ বয়সে নবীন হইলেও সেই মহতী সভার হোতার কার্য্যে বৃত হন। কলিকাতা মহানগরীর টাউন হলের দ্বিতলে এই বিরাট সম্মিলন চলিতেছিল। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মহারথিগণের মধ্যে মহারাজ দণ্ডায়মান্ হইয়া নিঃসঙ্কোচে কবিসম্রাটকে যে ভাবে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সাহিত্য রচনায় কোথায় অভিনবত্ব রহিয়াছে মহারাজের চক্ষু এড়াইবার উপায় নাই, এইরূপ চিত্র শিল্পেও তাঁহার দৃষ্টি অসাধারণ। চিত্রকরের উত্তম তুলির টানে যেখানেই নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, মহারাজের দৃষ্টি সেইখানে অনায়াসে যাইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গীত জগতেও সেই একই কথা। যান্ত্রিক অথবা কণ্ঠ সঙ্গীতে তাঁহার নিকট শিল্পীর সাধনা বিনা বাঁধায় ধরা দিয়া থাকে। ভাবিলে অবাক হইতে হয় এই স্বল্প সময়ের মধ্যে মহারাজ এমন তুর্ল্লভ শক্তি অর্জ্জন করিলেন কোথা হইতে? বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা দ্বারা যে শক্তি ডিগ্রীধারী

যুবকদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, সেই চক্ষুদান মহারাজ য়ুনিভার্সিটির প্রাচীরের বাহিরে থাকিয়া কেমন করিয়া স্বচ্ছন্দে লাভ করিলেন? ইহার উত্তর সহজভাবে মিলান অসম্ভব। গীতার 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে' এই উক্তির মধ্যেই যথার্থ উত্তর নিহিত রহিয়াছে। মহারাজের বয়সের সহিত তাঁহার অমিল কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিলে অবাক হইয়া কেবলি পূর্ব্বজন্মের কথা ভাবিতে হয়।

মহারাজ স্বরাষ্ট্রে ক্ষত্রিয়মণ্ডলী গঠন দ্বারা জাতীয় সংগঠনের বনিয়াদ তৈরী করিয়াছেন, বিবিধ শাসন সংস্কার দ্বারা রাষ্ট্রের শক্তি উপচিত হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা ভারতব্যাপী, তিনি স্বীয় ক্ষমতায় Chamber of Princes-এর মেম্বর এবং উক্ত চেম্বারের Standing Committee-র মেম্বর। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের ভিত্তিস্থাপন তাঁহার হাতে হয় এবং ঐ বিশাল সৌধের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্যও তিনি সম্পন্ন করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন কার্য্য তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি Eastern States Agency-র Council of Rulers-এর সর্ব্ববাদী সম্মত নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট। কলিকাতা ত্রিপুরাহিতসাধিনী সভা ভবনের ভিত্তি স্থাপন মহারাজের হস্তে সম্পন্ন হয়।

মহারাজের সবেমাত্র এই জীবনপ্রভাত, ইহারই মধ্যে পৃথিবী ভ্রমণ দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা তাঁহার অন্তরের একান্ত কাম্য হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি য়ুরোপ ভ্রমণ

দ্বারা সে জ্ঞান পিপাসা মিটাইয়াছেন। সাধারণ ভ্রমণকারীর ন্যায় তিনি যে সকল দর্শনীয় স্থান ও আশ্চর্য্যজনক বস্তু নিজে দেখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এমন নহে পরন্তু যাঁহাদের অঙ্গুলি সঙ্কেতে পটপরিবর্ত্তনের ন্যায় য়ুরোপের এই রূপান্তর ঘটিতেছে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে মূলের সহিত পরিচিত হইয়া তবে ফিরিয়াছেন।

দুর্দ্ধর্ষ মুসোলিনীর সহিত আবিসিনীয় সমরের অনেক পূর্ব্বে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মহারাজের সাক্ষাৎ হয়। মুসোলিনী তাঁহার সহিত ইংরাজিতে আলাপ করেন। ইতালীয় বিমান সম্ভার যাহাতে মহারাজের দেখিবার সুযোগ ঘটে তজ্জন্য মুসোলিনী তদীয় জেনারেল বেল্‌বোকে (Balbo) বিমান ক্রীড়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দেন। ইহাতে মহারাজের পরিদর্শনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এতদুদ্দেশ্যে মুসোলিনী তাঁহার স্বীয় বিমান মহারাজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। রোমের শিক্ষাকেন্দ্র প্রদর্শনের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। মহারাজ যখন রোম দর্শনান্তে মিলান সহরে ভ্রমণরত তখন মুসোলিনীর ভ্রাতা অল্ডার মুসোলিনী (Popolo de Italia কাগজের সম্পাদক) মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফ্যাসিষ্ট নেতার আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি মহারাজকে উপহার প্রদান করেন। ইহাতে মহারাজের কথা যেমন দৈনিক কাগজে বাহির হইতে লাগিল, ফোটো প্রার্থী দলও তেমনি বাড়িয়া গেল। সেই সময়ই মহারাজ ফন হিণ্ডেনবার্গের সহিত পরিচিত

হন, জার্ম্মাণ প্রেসিডেণ্ট মহারাজকে তাঁহার অটোগ্রাফ্ সহ চিত্র উপহার দেন। অলিম্পিক ক্রীড়া দর্শনকালে পরবর্ত্তী সময়ে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হের হিটলারের সহিত অর্দ্ধঘণ্টার ঊর্দ্ধকাল আলাপের সৌভাগ্য লাভ করেন, ফুরারেরও চিত্র অটোগ্রাফ্ সহ জার্ম্মান কন্সাল কর্ত্তৃক মহারাজের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরিত হয়। মহারাজের সহিত আলাপকালে ফুরার ভারতীয় খেলোয়াড়ের সাফল্য কামনা করেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সমর ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই মহারাজ দেশে ফিরিবার পথে আমেরিকা হইতে বিলাত আসিয়াছিলেন। যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সম্ভাবনায় তিনি পুনঃ আমেরিকা হইয়া পৃথিবী ঘুরিয়া এই ভীষণ যুদ্ধের বিভীষিকা মধ্যে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার জন্য রাজ্য-শুদ্ধ কি এক আশঙ্কার কালমেঘ ঘনীভূত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রফুল্ল বদনে বিধাতার অপার কৃপায় বিপদরাশি মথিত করিয়া দেশমাতৃকার কোলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমেরিকা থাকাকালে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্ত্তৃক পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হন এবং রাষ্ট্রনায়কের সহিত আলাপে প্রীতিলাভ করেন। 'To my Friend' উল্লেখে autograph যুক্ত স্বীয় চিত্র প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ ত্রিলোচনের রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করার কথা ইতিহাসের প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাপরান্তে কলিযুগে সেই পুণ্যশ্লোক নৃপতির বংশধর

সাগরপারে যুক্তরাষ্ট্রের নায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যুগ উপযোগী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

মহারাজ হৃদয়বান্ পুরুষ। তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় জনহিতৈষণা দ্বারা দেশ দেশান্তরে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ঢাকায় দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে তদঞ্চলের কতিপয় গ্রামে হিন্দুপ্রজা উপদ্রুত হইলে এবং অনন্যোপায় হইয়া মহারাজের রাজ্যে আসিতে চাহিলে তিনি তাহাদিগকে আসিবার অনুমতি দেন। ইহার ফলে দেখিতে দেখিতে প্রায় বার হাজার লোকে রাজধানী ভরিয়া যায়। ১৩৪৭ বাঙ্গালা সনের ২০শে চৈত্র রাত্রি দুপুর হইতে এই নিঃসহায় জনস্রোত সহরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ষ্টেশন হইতে সহর ৫।৬ মাইল দূর, দিবারাত্র ষ্টেট যানবাহন, মহারাজের হুকুমে আর্ত্ত ও পীড়িত লোকদিগকে সহরের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে পৌঁছাইতে থাকে।

তখন সবেমাত্র মহারাজের মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। হবিষ্যান্ন-ক্ষীণ শরীরে মহারাজ ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরিয়া ইহাদের বসবাসের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিতে থাকেন। অন্নসত্র খোলা হইয়া গেল—বার হাজার আর্ত্তের আহারোপযোগী অন্নশালায় যেন অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হইলেন। এই নিরন্নের মুখে অন্ন দিতে একমাসের কম সময়ের মধ্যে মহারাজের বিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। ১৩৪৮ বাঙ্গালার জ্যৈষ্ঠ মাসেও অন্নসত্র খোলা রহিয়াছে, তবে লোক সংখ্যার অনেক হ্রাস ঘটিয়াছে, ইহাদের অনেকেই স্বস্থানে ফিরিয়া

গিয়াছে, যাহারা যাইতে অনিচ্ছুক মহারাজ তাহাদের জন্য নিজব্যয়ে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিতেছেন। মহারাজের এই অভূতপূর্ব্ব জন-হিতকর ব্রতের সুযোগ পাইয়া জনসেবাপরায়ণ রাজধানীস্থ ব্যক্তিবর্গও ধন্য হইয়াছে। দৈনিক সংবাদপত্রের মুখে এ কাহিনী দেশ দেশান্তরে এতটা প্রচারিত হইয়াছে যে এ সম্বন্ধে অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

১৩৪৮ বাঙ্গালার ২৫শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষ পূর্ণ হওয়ায় দেশে জয়ন্তী উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত কবিবরের ঘনিষ্ঠতা অর্দ্ধশতাব্দীর ঊর্দ্ধকাল চলিতেছে, এ সম্পর্কে যথা স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। মহারাজ এ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করিবার জন্য "রবীন্দ্র জয়ন্তী দরবার" আহ্বান করেন এবং ঐ দরবারে কবিকে "ভারত ভাস্কর" আখ্যায় ভূষিত করেন। মহারাজের রোবকারী শান্তিনিকেতনে কবির হস্তে প্রদান করিবার জন্য রাজদূত প্রেরিত হয়।

৩০শে বৈশাখ মঙ্গলবার উত্তরায়ণের প্রাঙ্গনে সভার অধিবেশন হয়—চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের মধ্যে রোবকারী পাঠান্তে কবির হস্তে উহা মহারাজের নামাঙ্কিত মোহর সহ অর্পিত হয়। কবি সাগ্রহে উহা গ্রহণ করেন এবং মহারাজকে তাঁহার সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বলিয়া কবির প্রত্যুত্তর পুত্র রথীন্দ্রনাথ পাঠ করেন।

"ত্রিপুরা রাজবংশ থেকে একদা আমি যে অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছিলাম আজ তা বিশেষ করে স্মরণ করবার ও স্মরণীয় করবার দিন উপস্থিত হয়েছে। এ রকম অপ্রত্যাশিত সম্মান ইতিহাসে দুর্ল্লভ। যেদিন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এই কথাটি আমাকে জানাবার জন্য তাঁর দূত আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন যে তিনি আমার তৎকালীন রচনার মধ্যেই একটি বৃহৎ ভবিষ্যতের সূচনা দেখেছেন, সেদিন এ কথাটি সম্পূর্ণ আশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

আমার তখন বয়স অল্প, লেখার পরিমাণ কম এবং দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রূপ করতো। বীরচন্দ্র তা জানতেন এবং তাতে তিনি দুঃখ বোধ করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল এই, লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি নূতন ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলঙ্কৃত কবিতার সংস্করণ ছাপানো হবে। তখন তিনি ছিলেন কার্শিয়াং পাহাড়ে, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য। কলকাতায় ফিরে এসে অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমি মনে ভাবলুম এই মৃত্যুতে রাজবংশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তা হয়নি।

কবি-বালকের প্রতি তাঁর পিতার স্নেহ ও শ্রদ্ধার ধারা মহারাজ রাধাকিশোরের মধ্যেও সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেল। অথচ সে সময়ে তিনি ঘোরতর বৈষয়িক দুর্য্যোগের দ্বারা দিবারাত্রি অভিভূত ছিলেন। তিনি

আমাকে একদিনের জন্যও ভোলেন নি। তারপর থেকে নিরন্তর তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছি এবং আমার প্রতি তাঁর স্নেহ কোনদিন কুণ্ঠিত হয় নি যদিচ রাজসান্নিধ্যের পরিবেশ নানা সন্দেহ বিরোধ দ্বারা কণ্টকিত। তিনি সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে ছিলেন পাছে আমাকে কোনো গোপন অসম্মান আঘাত করে। এমন কি তিনি আমাকে নিজে স্পষ্টই বলেছেন, আপনি আমার চারিদিকের পারিষদদের ব্যবহারের বাধা অতিক্রম করেও যেন আমার কাছে সুস্থ মনে আসতে পারেন, এই আমি কামনা করি। এ কারণে যে অল্পকাল তিনি বেঁচেছিলেন কোন বাধাকেই আমি গণ্য করিনি।

যে অপরিণত বয়স্ক কবির খ্যাতির পথ সম্পূর্ণ সংশয় সঙ্কুল ছিল তার সঙ্গে কোনো রাজত্ব গৌরবের অধিকারীর এমন অবারিত ও অহৈতুক সখ্য সম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্ল্লভ। সেই রাজবংশের এই সম্মান মূর্ত্ত পদবী দ্বারা আমার স্বল্পাবশিষ্ট আয়ুর দিগন্তকে আজ দীপ্যমান করেছে। আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে, বর্ত্তমান মহারাজ অত্যাচারপীড়িত বহু সংখ্যক দুর্গতিগ্রস্ত লোককে যে রকম অসামান্য বদান্যতার দ্বারা আশ্রয় দান করেছেন তার বিবরণ পড়ে আমার মন গর্ব্বে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারলুম তাঁর বংশগত রাজ-উপাধি আজ বাংলা দেশের সর্ব্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হোল। এর সঙ্গে বঙ্গলক্ষ্মীর সকরুণ আশীর্ব্বাদ চিরকালের জন্য তাঁর

রাজকুলকে শুভ শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত করে তুলেছে। এ বংশের সকলের চেয়ে বড় গৌরব আজ পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠলো এবং এইদিনে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ্য পেলেম তা সগৌরবে গ্রহণ করি এবং আশীর্ব্বাদ করি এই মহাপুণ্যের ফল মহারাজের জীবনযাত্রার পথকে উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণের দিকে যেন অগ্রসর করতে থাকে। আজ আমার দেহ দুর্ব্বল, আমার ক্ষীণকণ্ঠ সমস্ত দেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর জয়ধ্বনিতে কবি জীবনের অন্তিম শুভ কামনা মিশ্রিত করে দিয়ে মহা নৈঃশব্দের মধ্যে শান্তি লাভ করুক।”

মহারাজ বীর বিক্রমকিশোরের হৃদয় স্পন্দনে সমগ্র প্রাচীন ইতিহাস জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনাস্রোত তাঁহাকে ঘিরিয়া ভারত ইতিহাসের ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে এক অব্যাহত রাজবংশের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

রাজবংশের কুলাচরিত প্রথা অনুযায়ী উত্তরাধিকারী নির্ণয়, মহারাজ বীর বিক্রম করিয়াছিলেন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখে। মহারাজকুমার কিরীট বিক্রমকিশোরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যে দরবারের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে নানা রাজ্যের রাজন্যবর্গ ও প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করিয়া সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে প্রকৃতি-পুঞ্জের দেয় ছয়লক্ষ টাকা পরিমাণ খাজানা এবং মুসলমান প্রজাবৃন্দের বিবাহকালীন দেয় “কাজিয়ানা” মাপ করিয়া মহারাজ অভিষেক আনন্দকে স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

যে অন্তর্দৃষ্টি লইয়া প্রজাসাধারণের দাবীর পূর্ব্বেই এই সমস্ত বিষয় সমাধান করিয়াছেন, তাহাতে বীরবিক্রম-কিশোরের ভারতীয় জন-জাগরণের স্বরূপ সম্বন্ধে তখনই উপলব্ধি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ক্রমশঃ আনয়ন কল্পে যে শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ দায়িত্বশীল না হইলেও, প্রজাসাধারণকে রাজ্যশাসনের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পূর্ণ পথ প্রদর্শক হইয়াছিল।

এই শাসনতন্ত্রের মূলকথা হইয়াছিল—ত্রিপুরেশ্বরের অধিকার ও ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সাহায্যকারী "রাজসভা" বা প্রিভি-কাউন্সিল; এবং রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব "মন্ত্রী-পরিষদ" বা মন্ত্রীসভার প্রতি ন্যস্ত। আইন প্রণয়নের নিমিত্ত সরকারী ও বেসরকারী নির্ব্বাচিত সদস্যগণ গঠিত "ব্যবস্থাপক সভা"। রাজ্যের গ্রামবাসিগণ যাহাতে গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়—তজ্জন্য "গ্রাম্য-মণ্ডলী" আইন প্রবর্ত্তিত হয়।

এই শাসনতন্ত্র ঘোষণায় মহারাজ ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের ১লা বৈশাখ বলিয়াছিলেন—"যে হেতু রাজ্যভার গ্রহণাবধি এপক্ষ শিক্ষা ও গঠনমূলক ব্যবস্থাদি প্রবর্ত্তন দ্বারা পুত্রতুল্য প্রজাবৃন্দের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন, এবং স্বাবলম্বন, সহযোগিতা রাষ্ট্রানুরাগ প্রভৃতি আদর্শ নাগরিকের-ধর্ম্মে নিয়ত তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন;—

আবালবৃদ্ধ নরনারীকে এই সময়ে আশ্রয় এবং আহার প্রদান করিয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন—তাহা প্রজাবৎসল নৃপতিরই লভ্য। অন্তরের কোমল বৃত্তির প্রকাশ মহারাজের দৈনন্দিন ছোট ছোট কার্য্যেও অহরহ সকলে অনুভব করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপখণ্ডে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবতারণা হয়। ইহা শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপক হইয়া পড়ে। মহারাজ বীরবিক্রম আমেরিকা অবস্থান কালেই ত্রিপুরারাজ্য যাহাতে মিত্রপক্ষে যোগদান করে—তদ্বিষয়ে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যখন জাপান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে দেশের পর দেশ জয় করিয়া বর্ম্মা দেশ অধিকার করিল এবং পূর্ব্বভারতে হানা দিল—তখন ত্রিপুরা রাজ্যের এক শঙ্কটময় সময় গিয়াছে। ভারত রণভূমিতে পরিণত হইল। ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থিতিতে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিপর্য্যয়ের মধ্যে পতিত হইবার আশঙ্কা রাজ্যবাসীদের সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

তৎকালে বহুদর্শী সেনানায়কের ন্যায় প্রজাসাধারণের কর্ত্তব্য ও রাজ্যের সংহতি রক্ষা কল্পে সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা ও সাহায্য লাভের নিমিত্ত মহারাজ বীরবিক্রম একটি ঘোষণায় বিবৃত করেন। রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য উপকরণ এবং সৈন্যদের বাসস্থান নির্ম্মাণোপযোগী কাঠ,

বাঁশ, বেত ইত্যাদি বনজবস্তু প্রচুর পরিমাণে রাজ্য হইতে ভারত গভর্ণমেণ্টকে সরবরাহ করা হইয়াছিল।

আভ্যন্তরিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে একদিকে যেমন নানা বিধিনিষেধ জারী করা হইয়াছিল, অপরদিকে "ত্রিপুর রাজ্য-রক্ষী বাহিনী" গঠন করিয়া সীমান্তবর্ত্তী ঘাঁটীগুলি রক্ষাকল্পে বিশেষ তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

"১ম ত্রিপুরা বীরবিক্রম রাইফল্স্", "ত্রিপুরা মহাবীর লিজিয়ন্" প্রভৃতি ত্রিপুর সৈন্যবাহিনী—ভারতীয় সেনাবাহিনার সহিত নানা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবিতাড়নে নিযুক্ত হইয়াছিল। আরাকান যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রিপুর বাহিনীর শৌর্য্য ও দক্ষতা ভারতীয় ও বৃটিশ সেনানায়কগণের অজস্র প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। রাজপরিবারস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রিপুরবাহিনী পরিচালনা করিয়া বহু সামরিক সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইহা সমস্তই মহারাজ বীরবিক্রমের ব্যক্তিগত প্রেরণার ফল। মহারাজ মধ্যে মধ্যে যুদ্ধরত সেনানী পরিদর্শন করিয়া তাহাদের স্বদেশরক্ষার গৌরব বৃদ্ধি করিতেন।

এই সময়ে সারা ভারতময় যুদ্ধোপকরণ ও সমরসম্ভার সরবরাহে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়া দেশের অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় আনয়ন করিতেছিল তাহা ত্রিপুরা রাজ্যকেও আঘাত করিয়াছিল। সৈনিক বিভাগের কাজকর্ম্ম করিয়া রাজ্যের কতিপয় লোক অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অতিরিক্ত মজুরী লাভে দিন মজুরেরাও বহুগুণ বেশী উপার্জ্জন করিতেছিল। অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু ও ও আহার্য্যের দর ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইহাতে বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট আয়ের মধ্যে থাকিয়া দেশের মধ্যবিত্ত পরিবার-বর্গ দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশে দুঃর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। ত্রিপুরারাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে চাউলের মূল্য প্রতি মণ যখন ৫০৲ হিসাবে বিক্রয় হইতেছিল তখন রাজ্যমধ্যে বহিরাগত বুভুক্ষু নরনারীর সমাবেশ দেখা দিল। মহারাজের বিশেষ আদেশে ধান-চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হইল। যাহাতে সকলে নির্দ্ধারিত মূল্যে ধান-চাউল বরাদ্দ অনুযায়ী পাইতে পারে তজ্জন্য রাজ্যমধ্যে সরকারী তত্ত্বাবধানে বিতরণ কেন্দ্র খোলা হইল। যদিও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া রাজ্যমধ্যেও পড়িয়াছিল, কিন্তু সুখের বিষয় রাজ্যবাসী প্রজাদের কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। ধান-চাউল স্বল্পমূল্যে বিতরণ কার্য্যে সরকার বাহাদুরকে কয়েক লক্ষ টাকার উপর ঘাট্তি বহন করিতে হইয়াছিল। সহরে যে সমস্ত বুভুক্ষু নরনারী ও শিশু বাহির হইতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের জন্যও মহারাজের ব্যক্তিগত সাহায্যে এবং জনসাধারণের চেষ্টায় একটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। দুঃস্থ আশ্রিতদের সেবা ও রোগে ঔষধ পথ্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থাও সরকার হইতে করা হইয়াছিল। বীর বিক্রমকিশোরের করুণ

হৃদয়ে দুঃখীর বেদনা যেভাবে আঘাত করিত—উপরোক্ত ব্যবস্থা হইতেই ইহা অনুভূত হয়।

অপরদিকে ভারতে বৃটিশ শাসকবর্গের কূট আলাপ-আলোচনা দিন দিন ভারতীয় রাজনৈতিক গগনে ক্রমশঃ বিপর্য্যয় ঘনাইয়া আসিতেছিল। দেখিতে দেখিতে সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িল যে হিন্দু মুসলমানদের প্রীতির বন্ধন অবিশ্বাসের মূলসূত্রে পরিণত হইল। ইহারই ফলে কলিকাতার দাঙ্গা—নোয়াখালীতে সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ, স্থানীয় অধিবাসীদের আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া, পিতৃ পিতামহের বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্টের যাত্রায় অনেকে বাহির হইয়া পড়িল। সুখের ও গৌরবের বিষয় ত্রিপুরারাজ্যে এই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক বিষ সংক্রামিত হয় নাই। ইহার জন্য একদিকে বীরবিক্রমকিশোরের দৃঢ়তা ও অপরদিকে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রতি সমদৃষ্টি ঘোষণা, সকলের মনেই জাগরূক থাকিবে। বিশেষতঃ ত্রিপুরা রাজ্যে নোয়াখালী ও অপরাপর জিলা হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের ব্যবস্থা ইত্যাদি ভারতীয় চিন্তানায়কগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

ইতিমধ্যে ভারতীয় গণপরিষদ ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়ণ-কল্পে আহূত হইল। দেশীয় রাজ্য এবং রাজন্যবর্গের প্রতিও ইহাতে যোগদানের আহ্বান আসিল। মহারাজ বীরবিক্রম-কিশোর প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিত্বের সহযোগিতায়

ত্রিপুরারাজ্যের পক্ষে তৎকালীন রাজস্ব-সচিবকে গণ-পরিষদে যোগদান করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। অতঃপর ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি নানা কুয়াশাজালে জড়িত হইয়া শেষ পর্যান্ত ভারতীয় ও পাকিস্থান রাষ্ট্রে ভারত বিভাগ হইল। প্রথম হইতেই ত্রিপুরারাজ্য ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছিল। রাজ্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মহারাজ বীরবিক্রমের ত্রিপুরারাজ্যকে ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদানের নির্দ্দেশ কতদূর সুদূর প্রসারী হইয়াছিল, তাহা তাঁহার তিরোধানের অনতিকাল মধ্যেই বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল।

কিছুকাল যাবত মহারাজের স্বাস্থ্য ভাল চলিতেছিল না। ইহা সত্ত্বেও সামরিক ও রাজনৈতিক নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সর্ব্বদা জড়িত থাকিতে মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর কোনও প্রকার শৈথিল্য বোধ করেন নাই। মহারাজের সহিত আলোচনান্তে কোনও বিশিষ্ট রাজনৈতিক মন্তব্য করিয়াছিলেন যে আলোচিত বিষয়ে তিনি এক নূতন ধারা পাইলেন, যাহা পূর্ব্বে কখনও তাঁহার সম্মুখে কেহ উত্থাপন করেন নাই।

মাত্র দশদিন যাবৎ জ্বর ও নিমোনিয়ায় ভুগিয়া ৩৯ বৎসর বয়সে মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দের ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে রাত্রি পৌনে নয়টায় রাজধানী আগরতলায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার অপরিসীম জ্ঞানবত্তা সম্বন্ধে

যাহারা মহারাজ বীরমিক্রমকিশোরের নৈকট্য লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহা অর্জ্জিত জ্ঞান বলিলে ভুল করা হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। ইহা ঐশ্বরিক কৃপাই নির্দ্দেশ করে। এই জ্ঞানের পরিস্ফুরণ শিল্প ও সঙ্গীত কলায় নব নব ভাবে বিকশিত হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। বীরবিক্রমকিশোর রচিত "হোলী" তদীয় রাগরাগিণী ও ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে অসীম ব্যুৎপত্তি ও জ্ঞানের পরিচায়ক।

রাজ্যের ও ভারতের রাজনৈতিক এক অস্বস্তির মধ্যে বিশেষতঃ যুগধর্ম্ম প্রভাবজাত আশা আকাঙ্ক্ষার অভ্যুত্থানের মধ্যে মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরের তিরোধান ত্রিপুরারাজ্যকে অশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।

। ১২ ।

মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোর

পিতার গোলোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর এক ঘোষণার দ্বারা ত্রিপুরারাজ্য ও চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর ভার গ্রহণ করিলেন। বৃটিশ সার্ব্বভৌমত্বের অধীনে অচিরকাল মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা মহাদেবীর সভাপতিত্বে



"রিজেন্ট" মহারাণী শ্রীশ্রীমতী কাঞ্চনপ্রভা দেবী
(জন্ম ১৭ই মে, ১৯১৪ইং)